মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা

মৎস্য পক্ষ '৯৬ সংকলন

মাছের চাষ করবো
সোনার বাংলা গড়বো

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা

মৎস্য পক্ষ '৯৬ সংকলন

১ – ১৫ সেপ্টেম্বর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট
মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা

মৎস্য পক্ষ '৯৬ সংকলন

উপদেষ্টা	ঃ	জনাব মোঃ ইরশাদুল হক, সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর। জনাব মুহাম্মদ মুজাফ্ফর হুসেইন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন।
সম্পাদক	ঃ	ডঃ এম এ মজিদ
সম্পাদনা পরিষদের সদস্য	ঃ	জনাব সমেরন্দ্র নাথ চৌধুরী জনাব মতিয়ুর রহমান সরকার ডঃ মোঃ গোলাম হোসেন
প্রচ্ছদ	ঃ	মোঃ ইনামুল হক
প্রকাশক	ঃ	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট
প্রকাশকাল	ঃ	আগস্ট ১৯৯৬
মুদ্রণে	ঃ	দি পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস লিঃ ২, ডিআইটি এভিনিউ (সম্প্রসারণ) মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০ ।

Mazid, M.A. (ed.). 1996. Technologies and Management for Fisheries Development. Fisheries Research Institute, Mymensingh. 160 pp.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ ভাদ্র ১৪০৩
২১ আগস্ট ১৯৯৬

বাণী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পুষ্টিচাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপলব্ধি থেকেই নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদের সম্ভাবনা পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমন একটি প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে মৎস্য পক্ষ '৯৬ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে দেশে মৎস্যসম্পদের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ করে এ খাতকে কাঙ্খিত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

সময় এসেছে 'মৎস্য পক্ষ' উপলক্ষে মাছের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করার।

আমি মৎস্য পক্ষ '৯৬-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

বাণী

বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। অসংখ্য নদ–নদী, হাওড়–বাওড়, খাল–বিল ও পুকুর জলাশয়ে পূর্ণ এদেশ। অতীতে এসব জলাশয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে যে মৎস্য আহরিত হত তা দ্বারাই মানুষের প্রয়োজন মিটে যেত, কিন্তু সময়ের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে মাছের চাহিদা, কিন্তু সে অনুপাতে মৎস্য উৎপাদন বাড়েনি। আমাদের এসব জলাশয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আমাদের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যসম্পদ আহরণের বিরাট সুযোগ রয়েছে।

আমাদের দেশের প্রায় কোটি লোকের জীবিকা মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্যসম্পদ আহরণের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে মৎস্যচাষ প্রযুক্তিতে ইতোমধ্যে বেশ উন্নয়ন ঘটেছে এবং অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে মৎস্যচাষ, আহরণ ও বাজারজাতকরণে আধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে এবং মৎস্য খাতে নিয়োজিত মানুষদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

মৎস্যসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। মৎস্য রপ্তানি থেকে আয় বৃদ্ধি করতে হলে বিদেশের চাহিদা মোতাবেক আমাদের বিভিন্ন প্রজাতির বিশেষ করে চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং মাছের গুণগত মান রক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে।

এ বৎসর ১–১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্য পক্ষ '৯৬ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে যার মূল উদ্দেশ্য হল মৎস্যচাষ ও মৎস্য উৎপাদন, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যাতে তারা সেসব প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের মৃয়মান অর্থনীতিতে গতিবেগের সঞ্চার হবে।

আসুন আমরা সকলে মিলে মৎস্য পক্ষ '৯৬ কে সফল করি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে গড়ে তুলি সোনার বাংলা।

(সতীশ চন্দ্র রায়)
প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাণী

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই খাত উন্নয়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুদুর অতীত হতে মাছ বাঙ্গালীর প্রধান প্রোটিন উৎস হিসেবে পরিচিত অথচ মাছে–ভাতে বাঙ্গালী কথাটি বর্তমানে বাস্তব অর্থে মানানসই বলে বিবেচিত নয়। আমাদের অভ্যন্তরীণ অথবা সামুদ্রিক উভয় মৎস্য ক্ষেত্র হতে আশানুরূপ মাছের সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য আমাদের মাছ চাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ, মৎস্যচাষের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ, মৎস্য ক্ষেত্রসমূহে জরিপ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের এলাকার নিরূপন, মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অপরিহার্য।

আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে ইতোমধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আধানিবিড় চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা আজ উজ্বল হয়ে উঠেছে। এটি গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ মাছের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির লক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর, মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিট্যুটসহ অন্যান্য সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তা ও এনজিও এগিয়ে আসছেন।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে যে প্রচেষ্টা চলছে তার মূল লক্ষ হল বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে জনগণের মধ্যে এর সম্প্রসারণ। মুক্ত অর্থনীতির আওতায় বেসরকারি খাতে মৎস্য উৎপাদনের উৎসরণ ঘটানো প্রয়োজন। বেসরকারি খাতের মৎস্যজীবিগণ যাতে আরো উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে মৎস্য উৎপাদনের নিয়োজিত হতে পারেন সে পরিবেশ সৃষ্টি করে উদ্যোক্তা তৈরী করা সরকারের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাবে।

বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও মৎস্য পক্ষ দেশের সকল জনগণের মধ্যে মাছের পুষ্টিমান, মাছের উৎপাদনের সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের মাছের চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেবে এই প্রত্যাশা করি। "মাছের চাষ করবো, সোনার বাংলা গড়বোঃ এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে মৎস্য পক্ষ '৯৬ সফল হোক এই কামনা করি।

(মোঃ ইরশাদুল হক)
সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

মৎস্যচাষ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার-নতুন সরকারের এই নতুন প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে বিপুল উৎসাহ ও কর্মমূখর পরিবেশে দেশে চতুর্থবারের মত উদযাপিত হচ্ছে জাতীয় মৎস্য পক্ষ '৯৬। তাই সংগত কারণেই জাতির নিকট এবারের মৎস্য পক্ষ উদযাপন সমূহ গুরুত্ব সহকারে নতুন তাৎপর্য বহন করে। এই তাৎপর্যের উপলব্ধিতে দেশে বিদ্যমান বিশাল জলসম্পদের অপরিসীম সম্ভাবনা, মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নকে তরান্বিত করার মানসিকতা সৃষ্টি এবং সে সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে এই পক্ষ। দেশব্যপী মৎস্যচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ, মৎস্য উন্নয়ন, মৎস্য নীতি ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, আলোচনা সভা, মৎস্য মেলা, পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ ও ব্যাপক প্রচারণা কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই পক্ষ পালনের উদ্দেশ্য সফল হয়ে উঠে।

অতিআহরণ ও পানি দূষণের কারণে বিগত কয়েক বছরে বিশ্বের মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন ২০ লক্ষাধিক টন হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি উন্নত জাতের মাছ, উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলে মাছ চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টন। বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের চিত্রও একইরূপ। অগণিত জলাশয় ও উপযোগী পরিবেশ এদেশকে মৎস্য উৎপাদনের এক আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। অতএব, বাংলাদেশে যদি মাছের প্রাচুর্য না থাকে তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মাছ থাকার সম্ভাবনাই থাকে না।

একমাত্র উন্নত মৎস্য প্রজাতি ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিই মাছের কাংখিত উৎপাদন লাভে অবদান রাখতে পারে। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে নিরলস গবেষণা চালিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, তথ্যায়ন ও প্রকাশনার মাধ্যমে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে বলে আমার বিশ্বাস। ইনষ্টিট্যুটের গবেষণার ফসল এবং মৎস্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অভিজ্ঞতালব্ধ রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক মৎস্য পক্ষ '৯৬ সংকলনখানি সযত্নে প্রকাশিত হলো।

এবারের সংকলনে মৎস্য উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল শ্রেণীর পাঠকের তথ্য-খোরাক মেটানোর সচেতন প্রয়াস আমাদের ছিল। সে লক্ষ্যে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের আধুনিক প্রযুক্তি, মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, ইত্যাকার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ,ব্যক্তি উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণ কর্মীদের রচনা- এতে স্থান পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই সংকলনখানি দেশের নীতি-নির্ধারক, পরিকল্পক, উন্নয়ন প্রশাসক, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রগ্রসর চাষীর কাংখিত উপকার সাধনে যথেষ্ট সহায়ক হবে। সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদির তথ্য চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখে পাশাপশি একটি ইংরেজী অনুবাদের বিষয় আমাদের চিন্তায় থাকলেও মূলতঃ সময়াভাবে তা সম্ভব হয়নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সমূহের ইংরেজী সারসংক্ষেপ একটি বিশেষ অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই মূল্যবান সংকলনটি যাদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। স্থানাভাবে কিছু লেখা আমাদের পক্ষে ছাপানো সম্ভব হয়নি- এজন্য আমরা দুঃখিত। একই কারণে কিছু কিছু লেখা আমাদের সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। এছাড়া বিষয়বস্তু ও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হয়েছে। একাজে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ নিরলস শ্রম দিয়েছেন-যারা বিশেষ প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। তথাপি রচনাশৈলী ও মুদ্রণে অসামঞ্জস্যতা থাকা বিচিত্র নয়। আশা করি পাঠকগণ তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এই সংকলনে সন্নিবেশিত সকল প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত নিতান্তই লেখকদের ব্যক্তিগত। ইহা সরকারের কোন মতামতের প্রতিফলন নয়। এই সংকলনের মানোন্নয়নে বাংলদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সম্পাদনা পরিষদের বাইরেও মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তরের অনেক কর্মকর্তা এই সংকলন প্রকাশে অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদান করেছেন- আমি তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সংকলনটি প্রকাশে মূল্যবান পরামর্শ ও পৃষ্টপোষকতা প্রদানের জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ ইরশাদুল হক, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ লিয়াকত আলী এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ মুজাফ্ফর হুসেইন এর প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বৃটিশ সরকারের ওডিএ (ODA) আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় সংকলনের প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এজন্য ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

মৎস্যসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়নে দক্ষতা ও মমতার সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করব-মৎস্য পক্ষ '৯৬ উদযাপনের এই পবিত্র প্রহরে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

(ডঃ এম. এ. মজিদ)
পরিচালক, মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ও
সভাপতি, সংকলন সম্পাদনা পরিষদ

ঢাকাস্থ 'মৎস্য ভবণ'

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নব নির্মিত মেরিন ফিশারীজ সার্ভেল্যান্স চেক-পোষ্ট পরিদর্শনে মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়

ময়মনসিংহস্থ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

ইনষ্টিট্যুটের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শনে সচিব জনাব মোঃ ইরশাদুল হক

সদ্য উদ্বোধনকৃত মেরিন ফিশারীজ
সার্ভেল্যান্স চেক–পোষ্ট, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে অবস্থিত বিএফডিসির
মনোহরখালী মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

ফিসপাস

সূচি

১.	বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ❑ *মোঃ লিয়াকত আলী ও মোঃ মোকাম্মেল হোসেন*	১১
২.	মুক্ত জলাশয়ে চাষভিত্তিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ❑ *মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ ও মোঃ জহিরুল ইসলাম*	১৭
৩.	প্লাবনভূমিতে মাছের পোনা অবমুক্তি ও উন্নয়ন কলাকৌশল ❑ *ডঃ এম এ মজিদ ও মোঃ শাহাদৎ হোসেন*	১৯
৪.	পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের ওপর কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া *জাকির হোসেন ও ডঃ জি সি হালদার*	২২
৫.	ফিশপাস ❑ *এস এম নাজমুল ইসলাম*	২৭
৬.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ❑ *মোঃ হারুণুর রশিদ ও মোঃ গিয়াস উদ্দিন খান*	৩০
৭.	আমাদের পানিসম্পদ ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায় ❑ *ম. বদরে আলম খান*	৩৩
৮.	মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে সোনালী ব্যাংকের ভূমিকা ❑ *এম এ ছাত্তার*	৩৬
৯.	বাংলাদেশে রুই জাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন ❑ *ডঃ এম ইউসুফ আলী*	৪০
১০.	হ্যাচারি–উৎপাদিত পোনার মান নিয়ন্ত্রণ ❑ *ডঃ এম জি হোসেন ও শ্যামল মাহাতা*	৪২
১১.	ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনায় বংশগতিবিদ্যা ❑ *ডঃ মোঃ সামছুল আলম*	৪৫
১২.	উন্নত জাতের মৎস্য প্রজাতি উদ্ভাবন ❑ *ডঃ এম জি হোসেন ও মোঃ শাহিদুল ইসলাম*	৪৯
১৩.	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য স্বল্পব্যয়ী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ❑ *ডঃ এম এ মজিদ*	৫২
১৪.	পুকুরে মাছ চাষ ❑ *মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও মেজবাহ উদ্দীন আহমদ*	৫৫
১৫.	সমন্বিত মৎস্যচাষ ও এর সম্ভাবনা ❑ *সমেরন্দ নাথ চৌধুরী*	৫৯
১৬.	পেনে মাছ চাষ সম্প্রসারণ। ❑ *জুবাইদা নাসরীন আখতার ও মোঃ রবিউল আউয়াল হোসেন*	৬৪
১৭.	'খাঁচায় মাছ চাষ্ব ঃ গ্রামীণ আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে একটি সম্ভাবনা ❑ *তাপস কুমার রায়, জিয়াউল হক ও নাসিম আহমেদ আলীম*	৬৯

১৮. খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্য ব্যবস্থাপনা ❑ ৭২
মোহাম্মদ জাহের
১৯. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ❑ ৭৭
সৈয়দ জাফর সাদেক
২০. মাছ চাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ ❑ ৮০
মোঃ আমিনুল ইসলাম
২১. চিংড়ি চাষে অগ্রযাত্রা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ❑ ৮২
ডাঃ আফতাবুজ্জামান
২২. বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ❑ ৮৬
মোঃ মাসুদুর রহমান
২৩. পরিবেশ সহনীয় বাগদা চিংড়ি চাষ ❑ ৯১
ডঃ এম এ হোসেন ও নাহিদ সুলতানা
২৪. মাড ক্র্যাব চাষের সম্ভাবনা ❑ ৯৫
সালেহ উদ্দিন আহমেদ, মাধুরী রাণী সাহা ও প্রবীর কুমার রায়
২৫. গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ❑ ৯৯
হাবিবুর রহমান খন্দকার
২৬. ফসলচক্রের ভিত্তিতে উপকূলীয় মৎস্যচাষ ❑ ১০৬
নাহিদ সুলতানা ও ডঃ এম এ হোসেন
২৭. মাছ ও চিংড়ির রোগবালাই ঃ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ❑ ১১০
মোঃ আবুল হোসেন
২৮. মাছ, চিংড়ি ও মৎস্য-পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ❑ ১১৬
মোঃ মিজানুর রহমান ও মোঃ হেলাল উদ্দিন
২৯. মাছের মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ভূমিকা ❑ ১২০
মুহাম্মদ মুজাফ্ফর হুসেইন
৩০. মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ গতিধারা ❑ ১২২
লোকমান আহমেদ
৩১. বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ পরিসংখ্যান ❑ ১২৭
মোঃ ইনামুল হক
৩২. মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা ❑ ১৩২
মোঃ মাহমুদুল হক
৩৩. মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ভূমিকা ❑ ১৩৬
৩৪. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ভূমিকা ❑ ১৪০
৩৫. মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর ❑ ১৪৫
সৈয়দ খায়রুল আলম
৩৬. Abstracts ❑ ১৪৮
৩৭. মৎস্য পক্ষ '৯৬ পুরস্কার ❑ ১৫৪
৩৮. প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ❑ ১৫৫

বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

মোঃ লিয়াকত আলী, মহাপরিচালক ও
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগতভাবে বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে, কর্মসংস্থানে, প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের অবদান বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময়। জাতীয় উৎপাদনের ৪.৭% এবং কৃষি সম্পদ হতে আয়ের প্রায় ১৪% এই খাতের অবদান। রপ্তানি আয়ের ১০% অর্জিত হচ্ছে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। দেশের জনগণের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের ৮০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর প্রায় ১২.৭৬ লক্ষ সার্বক্ষণিক মৎস্যজীবী রয়েছেন। তার মধ্যে ৭.৬০ লক্ষ অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ এবং ৫.১৬ লক্ষ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সাথে জড়িত। তা ছাড়া মৎস্য পরিবহণ, ব্যবসা ইত্যাদি মৎস্য সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ লোক জড়িত।

মৎস্যসম্পদ

মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে মৎস্য সম্পদ তিন শ্রেণীর ঃ (ক) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় (নদীনালা, খালবিল, প্লাবনভুমি, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ) (খ) অভ্যন্তরীণ চাষযোগ্য জলাশয় (দিঘি, পুকুর, বাঁওড় ও উপকূলীয় চিংড়িচাষ এলাকা), (গ) বঙ্গোপসাগরের বিশাল সামুদ্রিক এলাকা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ, ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে। সামুদ্রিক জলসীমায় রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ এবং ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি। এ সমস্ত প্রজাতির উৎপাদন ও বিচরণ ক্ষেত্র ৪৩.০৮ হেক্টর অভ্যন্তরীণ জলাশয়, ২.৬১ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় জলাশয় এবং ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক জলাশয়ে।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মোট আয়তন ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টরের মধ্যে বিভিন্ন নদনদী ১০.৩১ লক্ষ হেক্টর, প্লাবনভূমি ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর, বিল ১.১৪ লক্ষ হেক্টর এবং কাপ্তাই হ্রদ ০.৬৯ লক্ষ হেক্টর। ১৯৯৪-৯৫ সালের তথ্যানুযায়ী দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন ১১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনের মধ্যে উপরোক্ত জলাশয় হতে আহরিত মোট মৎস্য ৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন (৪৯%)। সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদনের সিংহভাগ (৬৫%) আসে উন্মুক্ত জলাশয়ে (প্লাবনভূমি) প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণশীল মাছ আহরণের মাধ্যমে। উন্মুক্ত জলাশয় বিশেষ করে প্লাবনভুমি মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, প্রবৃদ্ধি ও বিচরণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ/পানি নিষ্কাশন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পরিবেশের বিরাট পরিবর্তনের বিষয়টি ইতিঃপূর্বে বিবেচনায় আনা হয়নি। নদীনালার সাথে অভ্যন্তরীণ নিম্নাঞ্চল জলাশয়, বিল, হাওর ইত্যাদিতে পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে একদিকে প্লাবনভুমিতে মৎস্য প্রজনন, বিচরণ ও প্রবৃদ্ধি চক্র বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে প্লাবনভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। বিগত ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৮ লক্ষ হেক্টরের অধিক আয়তনের প্লাবনভূমি তথা মৎস্য বিচরণ ও উৎপাদন ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মতে ১৯৮৫ সালে প্লাবনভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে ১৯,৩৬২ কেজি রুই জাতীয় মাছের রেণু পোনা উৎপাদিত হতো তা ক্রমান্বয়ে কমে ১৯৯৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৫,০৯৬ কেজিতে। প্রাকৃতিকভাবে প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনার মজুদ বর্তমানে প্রায় নগন্য। ফলে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী

প্লাবনভূমি প্রায় অব্যবহৃতই থেকে যায়, কেননা উক্ত জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান জীবের/খাদ্যের ব্যবহার হচ্ছে না বা অপচয় ঘটছে।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন আশংকাজনক ভাবে যে হ্রাস পাচ্ছে তা রোধ করা এবং উৎপাদনের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য বিগত ১৯৮৮ সাল থেকে মৎস্য অধিদপ্তর রাজস্ব খাত হতে দেশের বিভিন্ন মুক্ত জলাশয়ে রুই জাতীয় পোনা মাছ মজুদের কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সাল থেকে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে (২য়, ৩য় মৎস্য ও সমন্বিত মৎস্য প্রকল্প) বিভিন্ন জলাশয়ে এ পর্যন্ত ৪,৬৬৯ টন রুই জাতীয় পোনা মাছ মুজদ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচির সুফল পাওয়া গিয়েছে। মজুদকৃত জলাশয়ে হেক্টর প্রতি ২০০-২৫০ কেজি অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় ১৯৫০ সালের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ আইন। মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ মৎস্য আইন অমান্য করে নির্বিচারে মৎস্য আহরণ। মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় এই আইন ও এই আইনের আওতায় সংস্থানকৃত বিধিবিধানগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগের এবং নয় ইঞ্চির ছোট নলা মাছ ও জাটকা ইলিশ নিধন এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এই আইনের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ১৯৯৫ সালে ৩,৩৪৪টি মামলা দায়ের করেন। এ ছাড়াও ১৯৯৪ সালে নিষ্পত্তি হয়নি এমন মামলার সংখ্যা ছিল ৮,০০৮টি। এর ফলে ৩৪ জনের জেল এবং ৩.০৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় হয়। এ ছাড়াও প্রায় ৪,৮২০টি কারেন্ট জাল আটক করা হয়।

মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করার এবং মৎস্যসম্পদের জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২৩টি এলাকা মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং নতুন এলাকা সম্প্রসারণেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সরাসরি সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮৬ সালে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির উদ্দেশ্য হল রাজস্বভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে জৈবিক পরিচর্যার ভিত্তিতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও জলমহাল ব্যবস্থাপনায় মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে ঋণপ্রাপ্তির সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা এবং মৎস্যজীবী সমিতির সহযোগিতায় মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের যৌথ প্রয়োগে ২৬৪টি জলমহালে লাইসেন্স প্রথা চালু ছিল। কিন্তু বিগত মৎস্য পক্ষ '৯৫ উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রীর দেয় ভাষণে জলমহালে ইজারা প্রথা বাতিলের ফলে বর্তমানে জলমহালে কোনই ব্যবস্থাপনা নীতি নেই, ফলে জলমহালে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। জলমহাল পত্তন দান পদ্ধতিতে গ্রহীতা অধিক মুনাফা লাভের আশায় জলমহালে অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ ও প্রয়োজনে জলাশয় শুকিয়ে মাছ আহরণের ফলে মৎস্যসম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে জলমহালে সুফলভোগীদের অংশীদারিত্ব মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক "অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের সমস্যাবলী

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বেশ কিছু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নিম্নে কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো ঃ

- ❒ কোন ধরনের জাল বা সরঞ্জাম দ্বার কোন্ কোন্ প্রজাতির মাছ কী পরিমাণে আহরিত হচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় এবং পানির গুণাগুণ নির্ণয়, মৎস্য মজুদ, মৎস্য বিচরণের প্রকৃতি সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মাছ আহরণ কৌশল নিরূপণ করা কঠিন বিধায় আজ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ মজুদ ও উৎপাদন ক্ষমতার কোন হিসেব নেই।
- ❒ এতদঞ্চলে মিশ্র প্রজাতির মাছের মজুদ নির্ণয় এবং সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মাছ আহরণের একটি উপযুক্ত মডেলের অভাব এবং স্বাদুপানির মৎস্যসম্পদের দুর্বল উপাত্ত ভিত্তি।
- ❒ দেশের বিভিন্ন সেক্টরের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সৃষ্ট সমস্যাদি; যেমন সেচ কাজের জন্য অত্যধিক পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ, নদীর

তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিকভাবে মাছের মজুদে বাধা সৃষ্টি, প্রজনন ক্ষেত্রে বিনষ্ট এবং মাছের যথেচ্ছ বিচরণে বাধাপ্রাপ্তি প্রভৃতি পরিবেশগত সমস্যা।

- মৎস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সীমিত জনবল ও আইন প্রয়োগের অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাবে প্রচলিত মৎস্য আইনসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আবহমানকাল থেকে জলসম্পদের ওপর জনগণের সহজাত প্রবৃত্তি, ত্রুটিপূর্ণ ইজারা ব্যবস্থা, একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলাশয় নিয়ন্ত্রণ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের বাস্তব প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।
- কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্রব্য ও কলকারখানার কতিপয় নির্গত বর্জ্য পদার্থ শুধুমাত্র মাছেরই মৃত্যু ঘটায় না, বরং যাবতীয় জলজ প্রাণীর আশ্রয়স্থলও ধ্বংস করে থাকে। পৌর এলাকার বর্জ্য পদার্থ পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাসসহ বিষাক্ত ও ভারী পদার্থের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করে।
- জলমহালে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালার অভাব।

উন্নয়ন কলাকৌশল

মুক্ত জলাশয় (নদনদী/খালবিল) মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাধারণত মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন/উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এই আলোকে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের জন্য নিম্নলিখিত কলাকৌশল হাতে নেয়া হয়েছে:

- সুষ্ঠু মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমাণ মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা করা হবে।
- নদনদী, খালবিল, হাওর ইত্যাদি মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কর্মসূচি চলছে এবং ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে।
- মৎস্য আইন জোরদার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করার পদক্ষেপ হিসেবে মৎস্য আইন সংশোধন করা হয়েছে।
- নদী বা যে কোন প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা আহরণ বন্ধ বা সীমিতকরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ/পানি নিষ্কাশন প্রকল্প, সড়ক ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদির পূর্বে মৎস্যসম্পদের ওপর তার প্রভাব পর্যালোচনা করা এবং মৎস্যসম্পদের সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রক্ষার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং আরো জোরদার করা হচ্ছে।
- মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন নদনদীতে বিশেষ উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।
- মাছ ও চিংড়ির প্রজনন ক্ষেত্র ও প্রাথমিক স্তরে এদের বিচরণ ক্ষেত্র সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ দেয়া হবে।

বদ্ধ জলাশয়

বাংলাদেশের বদ্ধ জলাশয়গুলোও মাছ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস। বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর দিঘি-পুকুর (প্রায় ১৩ লক্ষ পুকুর), ৫,৪৮৮ হেক্টর বাঁওড় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় অসংখ্য চাষপোযোগী বদ্ধ জলাশয় রয়েছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ২৮% ৩.৩০ লক্ষ টন আসে বদ্ধ জলাশয় থেকে। বাংলাদেশের পথিপার্শ্বস্থ ডোবানালা এবং সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এলাকার প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর আধা জলাশয়ে মৎস্যচাষ উন্নয়নের সুযোগ আছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে পোনার উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি সরকারি পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলশ্রুতিতে বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন অব্যাহত আছে। দেশের দিঘি-পুকুরগুলোতে মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৭০০ কেজির বিপরীতে বর্তমানে প্রায় ১,৯০০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের প্রদর্শনী খামারগুলোতে হেক্টর প্রতি ৭,০০০ কেজি পর্যন্ত মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। দেশের বাঁওড় ও বিলগুলোতে উপকারভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনায় মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১৩৬ কেজি হতে ১,১০০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে উন্নত পদ্ধতিতে বাঁওড় ব্যবস্থাপনার অধীনে যশোর ও ঝিনাইদহ জেলায় ৬ টি বাঁওড়ে সফল ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে ইফাদ-এর সহায়তায় আরও ৩০টি বাঁওড় উন্নয়নের কার্যক্রম একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে।

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি জলাশয় সংস্কার/উন্নয়ন করছে। উন্নয়নের পর

মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনার বহির্ভূত জলাশয়গুলোতে স্থানীয় প্রান্তিক চাষী ও বেকার যুবকদের সংগঠিত করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। গত বছর ১৪ হাজার মেট্রিক টন গমের বিনিময়ে ২০০ টি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকা জলাশয় মৎস্যচাষের জন্য সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমান বছরে মোট ১১ হাজার মেট্রিক টন গম বরাদ্দ আছে।

১৮ টি সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বরোপিট ও সেচ খালে সমন্বিত মৎস্যচাষ উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অর্ন্তগত ৮.০০ লক্ষ হেক্টর আধাবদ্ধ জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্যচাষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাছ চাষের মধ্যে পোনা মাছ সরবরাহের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ১১১টি মৎস্য খামার ও হ্যাচারিতে রেণু ও পোনা উৎপাদন অব্যাহত আছে। ১৯৯৫ সালে এই সমস্ত খামারে ২,৯২০ কেজি রেণু ও ২.১৮ কোটি পোনা উৎপাদন করে মৎস্যচাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এসব কেন্দ্র থেকে মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষ ও হ্যাচারি স্থাপনে বেসরকারি বিনিয়োগকে শিল্প খাতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বিগত ৪/৫ বছরে গলদা চিংড়ির চাষও একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। ১৯৯১ সালে যেখানে গলদা চিংড়ি খামারের আয়তন ছিল ৮৯০ হেক্টর বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৮৪০ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে।

উন্নয়নের সমস্যাবলী

- ❒ পুকুর দিঘির যৌথ মালিকানা।
- ❒ দেশের উত্তরাঞ্চলে ফারাক্কা বাঁধের ফলে শুষ্ক মৌসুমে পুকুর-দিঘি শুকিয়ে যায় এবং বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হয়।
- ❒ মৎস্য বিভাগসহ মৎস্য সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার না হবার ফলে প্রযুক্তি হস্তান্তর বিঘ্নিত হচ্ছে।
- ❒ উচ্চ সুদের হার, নিরাপত্তা ও বহু মালিকানার অসুবিধার কারণে মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী এবং মৎস্যচাষ উদ্যোক্তগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্তির অপ্রতুলতা।
- ❒ ব্যক্তি মালিকানায় অর্থের অভাব।

উন্নয়ন কলাকৌশল

- ❒ বদ্ধ জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার কলাকৌশল হাতে নেয়া প্রয়োজন। এই আলোকে কয়েকটি কলাকৌশল নিম্নে বর্ণিত হলো।
- ❒ দেশে চাহিদামত মৎস্য বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ যথা বেসরকারি পর্যায়ে এই প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং হ্যাচারি নির্মাণে সরকার ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিশ্চিতকরণ।
- ❒ উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ প্রযুক্তি চাষীদের মাঝে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রসারণ।
- ❒ পুকুর উন্নয়ন আইন বলবৎ করার মাধ্যমে দেশের দিঘি-পুকুরসমূহে মাছ চাষ বাধ্যতামূলক করা।
- ❒ মৌসুমী জলাশয়ে মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ❒ দেশী-বিদেশী দ্রুত বর্ধনশীল ও উচ্চ ফলনশীল মাছ চাষে জনগণকে উৎসাহিত করা।
- ❒ থানা পর্যায়ে মাছ চাষে বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর প্রদর্শনী খামার পরিচালনা।
- ❒ মহিলা সমাজকে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের কাজে অর্ধেক হারে যুক্ত করা। বিশেষ করে বাড়ী সংলগ্ন ছোট পুকুর-ডোবায় মহিলাদের মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা।
- ❒ কৃষি ও পশুসম্পদের সাথে মাছ চাষের (যেমন ধান ক্ষেতে মাছ চাষ) সমন্বয় সাধন করা।
- ❒ প্রযুক্তির সঠিক সম্প্রসারণ এবং জনগণকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।

উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ

বিদেশী বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ বিগত বছরগুলোতে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। যদিও হেক্টর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য নয় (হেক্টর প্রতি ২০০-২৫০ কেজি) তথাপি চিংড়ি খামারের আয়তন ১৯৮৪ সালে ৫১ হাজার হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১.৪০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে এবং চিংড়ি উৎপাদন ১১,২৮২ টন থেকে ৪৫,০০০ টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আধানিবিড় পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন হেক্টর

প্রতি এক ফসলে ৩,০০০-৫,০০০ কেজি উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে কক্সবাজার অঞ্চলে ৬৩৫ হেক্টর এবং খুলনা অঞ্চলে ৮১০ হেক্টর আধানিবিড় চিংড়ি চাষ হচ্ছে। দেশের উপকূলীয় চিংড়ি খামারের সংখ্যা ও আয়তন দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করছে।

মৎস্য বিভাগ বর্তমানে আধানিবিড় চাষের উপযোগী এলাকাসহ চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হচ্ছেন। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে সরকার রাস্তাসহ উপযুক্ত ভূমি, বিদ্যুৎ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে। এ লক্ষ্যে হ্যাচারি স্থাপন, খাদ্য প্রস্তুত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য সরকার কর্তৃক বেসরকারি সেক্টর এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

উন্নয়নের সমস্যা

- ❒ চিংড়ির খাদ্য ও চিংড়ির পোনার অপ্রাপ্যতা এবং উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাবে আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ বর্তমানে বাধার সম্মুখীন।
- ❒ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য মজুদ এবং বার্ষিক কী পরিমাণ লার্ভা ও কিশোর চিংড়ির আগমন ঘটে এবং বাইরে চলে যায় তার তথ্যাদি নেই বললেই চলে।
- ❒ উপকূলীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্য, জেলেদের নিম্নমানের সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জেলেদের বিকল্প আয়ের উৎসের অভাব এবং পরিবেশ সম্পর্কে কম সচেতনতার ফলে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের ওপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।
- ❒ উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকতে সক্ষম, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তির অনুপস্থিতি।
- ❒ প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা প্রাপ্তির নির্ভরতা, বাণিজ্যিক মৎস্যখাদ্যের অপ্রাপ্যতা, উচ্চ মাত্রায় লবণাক্ততা, ওঠানামা, উচ্চ বিনিয়োগ মূল্য, ভূমি ব্যবহারের দন্ড বা বিরোধ, নিরাপত্তার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি দেশে চিংড়ি চাষ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।
- ❒ চিংড়ির রোগ।
- ❒ প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরিত চিংড়ি পোনার সাথে অন্যান্য বহু প্রজাতির মাছের পোনা ধ্বংস হচ্ছে।
- ❒ উন্নত প্রযুক্তি, জ্ঞান এবং সমন্বিত নীতিমালার অভাব।

কলাকৌশল

- ❒ উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে চিংড়ি উৎপাদনে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ।
- ❒ চিংড়ির পোনা ও উন্নত প্রসারের অভাবে উৎপাদনের হারে তেমন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায় চিংড়ি খামারের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি সীমিত রেখে চিংড়ি উৎপাদন হার বৃদ্ধির প্রযুক্তি প্রসারের দিকে অধিক মনোনিবেশ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দেশে চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।
- ❒ চিংড়ি চাষ অভিকর আইন বলবৎ।
- ❒ প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ির পোনা আহরণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করা এবং কৃত্রিম প্রজননে চিংড়ি পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- ❒ রোগ নির্ণয়ের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সঠিক প্রযুক্তির উন্নয়ন।

সামুদ্রিক মৎস্য

বিশাল জনসম্পদে পরিপূর্ণ এ দেশে রয়েছে ৪৮০ কি.মি. বিস্তীর্ণ উপকূল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল। স্বাধীনতার পর থেকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ৮৫ হাজার টন থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ২.৬০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে, যার বৃদ্ধির হার প্রায় ৩০০%। সমুদ্র থেকে আহরিত মৎস্যসম্পদের প্রায় ৯৫ শতাংশ যান্ত্রিক ও দেশী নৌকা অর্থাৎ আর্টিসেনাল ফিশারিজের অবদান। কিন্তু এতদিন আর্টিসেনাল ফিশারিজের এ রেগুলেটরি কর্মকান্ড অধ্যাদেশের আওতায় না থাকায় মৎস্য আহরণে যান্ত্রিক ও দেশী নৌকার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সামুদ্রিক সম্পদের উৎপাদন মাত্রা সহনশীল রাখার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের আওতায় ট্রলার বহরের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে এবং কতিপয় জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৭০টি চালু ও বিকল ট্রলার রয়েছে এর মধ্যে ৪৫ টি চিংড়ি ট্রলার এবং ১৫টি সাদা মাছ

ধরার ট্রলারসহ কমবেশি ৬০টি চালু আছে। আর্টিসেনাল জেলেদের ৩,৩১৭ টি ইঞ্জিনচালিত এবং ১,১৪,০০০ টি ইঞ্জিনবিহীন নৌকা উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ আহরণে নিয়োজিত । সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ মজুদ নির্ধারণ এবং নতুন মৎস্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের এবং যে সব মূল্যবান সামুদ্রিক মাছের (টুনা, ম্যাকারেল) মজুদ সম্পর্কে ইতোপূর্বে জরিপ পরিচালনা করা হয়নি সেগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের ২টি গবেষণা জাহাজ জরিপ কাজে অব্যাহত রয়েছে।

উপরিবর্ণিত অবস্থায় আর্টিসেনাল মৎস্য আহরণ নৌকা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরকার আর্টিসেনাল ফিশারিতে মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যেই নৌকা পিছু লাইসেন্স প্রথা চালুর বিধি জারি করেছে। যদি উক্ত বিধি বাস্তবায়িত হয় তাহলে অতি আহরণের প্রবণতা বন্ধ হবে।

সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় উদ্যোক্তা অথবা যৌথ উদ্যোগে পেলাজিক উৎস থেকে মৎস্য আহরণ প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যেই একটি দেশী কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় যৌথভাবে পেলাজিক মাছ আহরণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণের জন্য ২৫টি নৌযানের (লং লাইনার্স, স্কিপজেক বোটস) জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনুমতির জন্য আবেদন পেশ করেছে। প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

উন্নয়নের সমস্যাবলী

- উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ও চিংড়ির অতি আহরণের ফলে বঙ্গোপসাগরের অনেক ফিনফিশ ও শেলফিশের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
- আর্টিসেনাল ফিশারি কর্তৃক অতি আহরণের ফলে পোষ্ট লার্ভা ও কিশোর চিংড়িসহ অন্যান্য মাছের মজুদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- বেহুন্দি জাল, উপকূলীয় বেড় জাল, চিংড়ি পোনার ঠেলা জালসহ দেশীয় সাধারণ ও যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মৎস্য মজুদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।
- বর্তমানে দেশের ডিমা রসেল ট্রল ফিশারি এবং চিংড়ির ট্রল ফিশারি সমুদ্রে অধিক হারে মাছ ও চিংড়ি আহরণ করছে। ফলে সমুদ্রের ১০০ মিটার গভীরতার মধ্যে মৎস্য ও চিংড়ি আহরণের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে ১০০ মিটার গভীরতার বাইরে মৎস্য আহরণ হচ্ছে না। ডঃ ফ্রিটজফ নেনসেনের ১৯৮০ সনের জরিপ অনুযায়ী টুনা, ম্যাকারেল, স্কিপজেক, হাঙ্গর, এনচোভিজ, সার্ডিন প্রভৃতি পেলাজিক মাছের মজুদ ছিল ৬০,০০০-১,২০,০০০ মেট্রিক টন।
- পেলাজিক উৎস থেকে মাছ আহরণ সীমিত অথবা আদৌ মৎস্য আহরণ করা হয় না। এ সম্পদ আহরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদির অভাব আছে।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন কলাকৌশল

প্রাকৃতিকভাবে সকল জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত ও প্রাকৃতিক উপায়ে প্রত্যেক জলাশয়ের একটি সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা আছে। সামুদ্রিক জলাশয়ে বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদের একটি হিসেব পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় আহরণযোগ্য মাছের মজুদ ২,৫০,০০০ মেট্রিক টন এবং আহরণযোগ্য চিংড়ির মজুদ ৬৫০০-৭০০০ মেট্রিক টন। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় নিম্নরূপ ঃ

- সমুদ্রে মৎস্যসম্পদ জরিপের মাধ্যমে sustainable yield নির্ধারণ করা এবং সে হারে মৎস্য আহরণ।
- চিংড়িসহ কতিপয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্রে বছরের নির্দিষ্ট একটি মৌসুমে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা।
- গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ জোরদার করা।
- সামুদ্রিক মৎস আইনের প্রয়োগ জোরদার করা।
- আর্টিসেনাল ফিশারিতে নিয়োজিত ১০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন যান্ত্রিক নৌকা মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় আনা এবং তার নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া শুরু।
- বিস্তীর্ণ উপকূলে সনাতনী ও যান্ত্রিক নৌযানের ওপর বিস্তারিত আইনের ধারাসমূহ বলবৎ বা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

মুক্ত জলাশয়ে চাষভিত্তিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক ও
মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশ আবহমান কাল হতে অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয় বরং উৎপাদনশীলতা এবং মাছ, চিংড়ি ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য জলজ জীবের প্রাচুর্যের বিবেচনায়ও তা সমৃদ্ধ। জলজ ও মৎস্যসম্পদের এত প্রাচুর্য থাকা সত্বেও দেশে মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ তথা মাছের প্রাপ্তি এবং মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক নয়। মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব যথাযথভাবে বিবেচনা না করে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য আহরণের ওপর অত্যধিক চাপ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে এর গুণগত অবক্ষয় এবং এর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলেই মুক্ত জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন বিগত সত্তর ও আশির দশকে মারাত্মকভাবে কমে যায়। এতদসত্বেও বর্তমানে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে উৎপাদিত মাছের প্রায় ৬২% আসে মুক্ত জলাশয় হতে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে এবং কম সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাছের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ অবস্থা বিবেচনান্তে মুক্ত জলাশয়ে চাষভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির প্রাথমিক/নমুনা পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করা হয় ১৯৮৯-৯০ সালে। বাইরে থেকে রুই জাতীয় মাছের রেণু বা ধানি পোনা এনে হাওরে, বিলে স্থাপিত নার্সারিতে ছেড়ে তা বড় করে অথবা বিল বহির্ভূত এলাকা হতে বড় পোনা এনে বর্ষার শুরুতে বিল, প্লাবনভূমি/হাওরে অবমুক্ত করে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার পর বর্ষা শেষে মজুদকৃত পোনা বাজারজাত উপযোগী আকার ধারণ করলে তা আহরণ করা-সাদামাটাভাবে এ প্রক্রিয়াটাই হলো প্লাবনভূমি বা হাওরে চাষভিত্তিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং এদের বর্তমান অবস্থাঃ ১৯৮২ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে ৪৩,৩৯,৬৯৪ হেক্টর অভ্যন্তরীণ জলাশয় আছে যার মধ্যে মুক্ত জলাশয়ই হলো ৪০,৪৭,৩১৬ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে নদী ও খাল ১০,৩১,৫১৩ হেক্টর বিল ১,১৪,১৬১ হেক্টর কাপ্তাই লেক ৬৮,০০০ হেক্টর এবং মৌসুমী প্লাবনভূমি/হাওর হলো ২৮,৩২,৭৯২ হেক্টর। ১৯৮৪ সালে যেখানে মুক্ত জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন ৪.৭১ লাখ মেট্রিক টন (নদী ও খাল-২.১৬ লাখ মেট্রিক টন, বিল/হাওর-০.৫১ লাখ মেট্রিক টন প্লাবনভূমি ২.০ লাখ মেট্রিক টন এবং কাপ্তাই লেক-০.০৪ লাখ মেট্রিক টন) ছিল সেখানে ৭ বছর পরে ১৯৯০ সালে তা কমে নেমে যায় ৪.০৪ লাখ মেট্রিক টনে (নদী ও খাল-১.৯০ লাখ মেট্রিক টন, বিল/হাওর-০.৪৯ লাখ মেট্রিক টন, প্লাবনভূমি-১.৯৩ লাখ মেট্রিক টন এবং কাপ্তাই লেক-০.০৪ লাখ মেট্রিক টন)। এসব মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে মৌসুমী প্লাবনভূমি এবং বিল/হাওর হলো সবচেয়ে বেশী উৎপাদনশীল। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায় বা এর অংশ বিশেষে পানি থাকে কিন্তু বর্ষা মৌসুমে ৩-৬ মাসের মত পানি থাকে এরূপ এলাকাই প্লাবনভূমি বা হাওর হিসেবে পরিচিত। তবে প্লাবনভূমি অপেক্ষা হাওরের বিস্তৃতি অনেক বড় বর্ষাকালে যার কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকে না এবং এগুলো বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। এসব প্লাবনভূমি বা হাওরের যে অংশে প্রায় সারা বছর পানি থাকে এসব এলাকাকে সাধারণত বিল বলা হয়ে থাকে।

প্লাবনভূমি বছরের বেশির ভাগ সময় শুষ্ক থাকায় এখানে ধানসহ বিভিন্ন কৃষি ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত অনেক সার ব্যবহারের ফলে এবং প্রতি বর্ষায় প্রচুর পলিমাটি জমে বিধায় উৎপাদনের জন্য দরকারি মৌলিক উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। তাই এখানকার মাটি ও পানির উর্বরা শক্তি

তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হওয়ায় প্লাবনভূমি রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ইত্যাদি) মাছের উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট চারণ ভূমি ও আবাসস্থল। এ কারণে মুক্ত জলাশয় বিশেষত প্লাবনভূমি হতেই রুই জাতীয় মাছের সিংহভাগ উৎপাদিত হতো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব মতে, ১৯৭৬ সালে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে দেশে বার্ষিক ১ লক্ষ টন রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ইত্যাদি) মাছ উৎপন্ন হয়েছে যার সিংহভাগই উৎপাদিত হয়েছে প্লাবনভূমি হতে। এ রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন নানাবিধ কারণে মুক্ত জলাশয়ে হ্রাস পেতে পেতে মৎস্য অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে মাত্র ৮,১৩৩ টনে এসে দাঁড়ায়। প্লাবনভূমি হতে ক্রমান্বয়ে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন এরূপ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ হলো মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া/প্রতিক্রিয়ার ফলে মাছের প্রজনন ও আবাসভূমির গুণগত অবক্ষয় এবং এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়াতে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদের পরিমাণ মারাত্মকভাবে কমে যাওয়া। বিগত তিন দশক ধরে প্রাকৃতিক পোনা উৎপাদন ও মুক্ত জলাশয়ে এদের মজুদ মারাত্মকভাবে কমে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তরের এক হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৫ সালে যেখানে প্রাকৃতিকভাবে ১৯,৩৬২ কেজি রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদিত হত তা ক্রমান্বয়ে কমে ১৯৯৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৫,০৬৯ কেজিতে। প্রাকৃতিকভাবে প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনার মজুদ বর্তমানে প্রায় নগণ্য। ফলে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী প্লাবনভূমি প্রায় অব্যবহৃতই থেকে যায়, কেননা উক্ত জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরে (ecological niches) বিদ্যমান জীবের/খাদ্যের ব্যবহার হচ্ছে না বা অপচয় ঘটছে। তাছাড়া প্রাকৃতিকভাবে মজুদ না হওয়ার ফলে নদী, খালসহ অন্যান্য মুক্ত জলাশয়েও রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। পরিবেশের অবক্ষয়ের ফলে সম্পদের যে ক্ষতি হয়েছে বা হয়ে থাকে তা mitigation এবং compensatory- এ দুই ব্যবস্থার মাধ্যমেই আংশিক বা পুরোটা পূরণ করা বা পুষিয়ে নেয়া যায়। তবে এ দুটোর মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ mitigation মূলক ব্যবস্থাই হলো উৎকৃষ্ট কেননা তা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র সহ জলজ জীববৈচিত্রের যে অবক্ষয় হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার বা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা মোটেই সম্ভব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে mitigation ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মাছের অভয়আশ্রম স্থাপন, নদীনালা খালবিল পুনঃখনন, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় মৎস্য আহরণ, যেসব মাছ প্রায় বিলীন বা বিলীন হওয়ার পথে সেসব মাছের প্রজনন ও বিচরণ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা বা আবাসনের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। তবে, যত কিছুই করা হোক না কেন আমাদের দেশে বিদ্যমান পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুক্ত জলাশয় বিশেষত প্লাবনভূমি/হাওর বা অব্যবহারাধীন খাদ্যস্তর ব্যবহারের জন্য রুই জাতীয় পোনামাছ প্রাকৃতিকভাবে আর মজুদ হওয়ার কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। তাই মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এরূপ জলাশয়ের উক্ত খাদ্যস্তর ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উল্লিখিত চাষভিত্তিক লাগসই ব্যবস্থাপনা চালু করে একে টেকসই করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এক্ষণে সময়ের অগ্রাধিকারযোগ্য কার্যক্রম বলে বিবেচনা করা দরকার।

উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে যে হ্রাস পাচ্ছে তার গতিরোধ করা এবং উৎপাদনের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য বিগত আশির দশকের শেষ দিক হতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প হাতে নিতে শুরু করে। তারই অংশ হিসেবে ১৯৮৯ ও ৯০ সালে সরকারের নিজস্ব অর্থে মুক্ত জলাশয়ের কতিপয় স্থানে সামান্য পরিমাণে রুই জাতীয় মাছের পোনা ছাড়া হয়। এ সময়ের পর হতে এবং গত ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই উদ্দেশ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণে দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিশ্ব ব্যাংকের ঋণে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পসহ কয়েকটি প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর হাতে নেয়। তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১ সাল হতে পরীক্ষামূলকভাবে বৃহত্তর খুলনা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার যে সব প্লাবনভূমিতে অন্তত ৫ মাস পানি থাকে সেসব প্লাবনভূমিতে বর্ষার শুরুতে বড় আকারের (৩´´-৫´´) পোনা ছেড়ে তা খাবার উপযোগী আকারে পরিণত হলে বর্ষার শেষ এবং শুষ্ক মৌসুমে আহরণ করা হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৯০ সাল হতে বৃহত্তর সিলেট-ময়মনসিংহ হাওর অঞ্চলের প্লাবনভূমির অন্তর্গত বিলের কতিপয় নিচু স্থানে নার্সারি প্রস্তুত রুই জাতীয় মাছের রেণু ও ধানি ছাড়া হয় এবং বর্ষাকালে এসব নার্সারির পাড় ডুবে গেলে সেখানে উৎপাদিত পোনা সমস্ত প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এসব পোনা আহরণোপযোগী মাছে পরিণত হলে বর্ষার শেষ দিকে বা শুষ্ক মৌসুমে ধরা হয়। এ দু'ধরনের ব্যবস্থাপনা মডেলের ভিত্তিতে প্লাবনভূমিতে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির পরীক্ষামূলক কাজ চলছে।

প্লাবনভূমিতে মাছের পোনা অবমুক্তি ও উন্নয়ন কলাকৌশল

ড. এম. এ. মজিদ, পরিচালক ও
মোঃ শাহাদৎ হোসেন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

নদীমাতৃক বাংলদেশ আবহমান কাল থেকেই মৎস্যসম্পদে ভরপুর। এর মোট আয়তন প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর যার মধ্যে প্লাবনভূমি ও বিলের আয়তন যথাক্রমে ২৮.৩৩ লক্ষ ও ১.১৪ লক্ষ হেক্টর। এক সময়ে দেশের প্লাবনভূমি থেকে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। দেশের মৎস্যজীবীদের বেশির ভাগই প্লাবনভূমি থেকে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে প্লাবনভূমি থেকে মাছের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। এমতাবস্থায়, প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের মাধ্যমে প্লাবনভূমির বাস্তবসম্মত টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

প্লাবনভূমির বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা

দেশের যে নিম্নাঞ্চল সাধারণত বর্ষা মৌসুমে তলিয়ে যায় এবং ৪-৫ মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে তাকেই প্লাবনভূমি বলে। বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিম্নাঞ্চল প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হয়। কৃষি ফসলের জন্য সার ব্যবহার করায় এবং প্রচুর পলি জমা হওয়ায় প্লাবনভূমির মাটি ও পানির উর্বরাশক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। এ কারণে প্লাবনভূমি মিঠা পানির অধিকাংশ মাছের প্রজনন, চারণ ও আবাসস্থল। প্লাবনভূমি বর্ষা মৌসুমে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এর বড় অংশ বিভিন্ন ধরনের আগাছা, কচুরিপানা, ধানক্ষেত ইত্যাদিতে ভরে যায়।

প্রতি বছর পলি জমে জমে প্লাবনভূমি অগভীর হয়ে যাচ্ছে। নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদী থেকে প্লাবনভূমিতে পর্যাপ্ত পানি প্রবেশ করছে না, ফলে প্লাবনভূমির আয়তন কমে যাচ্ছে। পোনার লালন ও চারণ ক্ষেত্র হিসেবে প্লাবনভূমির আগাছা, উদ্ভিজ্জ কণা, প্রাণিজ কণা, ধান ইত্যাদি এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে। বর্তমানে প্লাবনভূমি ও নদীর মধ্যে মাছের চলাচল পথ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইস গেট, সেচ বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নদী থেকে রুই জাতীয় মাছের পোনা/রেণু পোনা প্লাবনভূমিতে আর প্রবেশ করতে পারছে না। তাই প্লাবনভূমির চমৎকার পরিবেশ সমৃদ্ধ পোনার লালন ও চারণ ক্ষেত্রের যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

প্লাবনভূমির উন্নয়ন ও তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প

দেশের বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে মৎস্য অধিদপ্তর এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট "তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প" শিরোনামের এই প্রকল্পটির কার্যক্রম যৌথভাবে মৎস্য অধিদপ্তর, মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। প্রকল্পের আওতায় ১৯৯২ সালে গোপালগঞ্জের চান্দা, খুলনার বিএসকেবি এবং নাটোরের হালতি বিলে হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ৩০ কেজি হারে রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করা হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে আরো বেশ কিছু বিলে পোনা মজুদ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়। পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, কোন কোন বিলে মজুদকৃত পোনার ১৩ গুণ পর্যন্ত এবং হেক্টর প্রতি ২৪৭ কেজি পর্যন্ত রুই জাতীয় মাছের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে।

প্লাবনভূমির উন্নয়ন গবেষণা

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাস থেকেই মাঠ পর্যায়ের গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প গবেষণা সহায়তা প্রদান করে আসছে। প্লাবনভূমিতে মৎস্য বিষয়ক গবেষণা বাংলাদেশে এটিই

প্রথম এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে একমাত্র তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পই গবেষণা সহায়তা পেয়ে আসছে। প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণার বিষয়বস্তু মূলত প্রকল্পের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্ধারণ করা হয় এবং প্রয়োজনে তাতে পরিবর্তন সাধন করা হয় বা নতুন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এযাবৎ নিম্নলিখিত গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে ঃ

- প্লাবনভূমি/বিলের ধরন, পানি অবস্থানের সময়সীমা, মাটি ও পানির প্রবাহ, বিলের সার্বিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন্ বিলে কত ঘনত্বে, কোন্ কোন্ মাছের পোনা কত পরিমাণ মজুদ করা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে তা নিরূপণ করা।
- সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক পোনা মজুদ করে কোন্ ধরনের বিলে মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো যায় সেসব বিল চিহ্নিত করা।
- প্লাবনভূমি/বিলে ব্যবহৃত মাছ আহরণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির শ্রেণী বিভাগ করা। মাছ ধরার কোন্ কোন্ জাল/ফাঁদ মজুদকৃত মাছের জন্য কোন্ সময়ে ক্ষতিকর তা নিরূপণ। বিলে মজুদকৃত পোনা বিপণনযোগ্য আকারে উপনীত হবার আগে তা না ধরেও অন্যান্য প্রজাতির মাছ কি উপায়ে আহরণ করা যায় তা নিরূপণ করা।
- বিলে মজুদের লক্ষ্যে সুস্থ সবল পোনা উৎপাদন, পরিবহণের বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যাবলী চিহ্নিত করে পরিবহণের উন্নত কৌশল নির্ধারণ, মজুদকালে কোন রোগবালাই বহন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
- বিলের মাছে কোন প্রকার রোগ দেখা দিলে রোগ সনাক্তকরণ ও রোগের কারণ নিরূপণ। বিশেষ করে বিলে ক্ষতরোগের প্রকোপ, ব্যাপকতা, ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাতি, ক্ষতরোগে মাছ আক্রান্ত হবার সময় ইত্যাদি নিরূপণ করা।
- রুই জাতীয় পোনা মজুদের ফলে বিলের অন্যান্য মাছের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ছে কিনা তা নিরূপণ করা।
- বিলের পরিবেশে গ্রাস কার্পের খাদ্যাভ্যাস নিরূপণ, মজুদের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।
- বিলের সার্বিক পরিবেশগত দিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিলে ছোট জাতের মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা উদ্ভাবন।

গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ

বিগত ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৩৬টি বিলের ওপর গবেষণা চালানো হয়। এর মধ্যে ৩টি (চান্দা, হালতি ও বিএসকেবি) বিলের ওপর সার্বিক বিষয়ে গবেষণা হয়ে আসছে। গবেষণার মাধ্যমে এযাবৎ প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে সংক্ষেপে প্রদান করা হলো।

- বিল থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য/বৈশিষ্ট্য (যেমন– পানি, মাছ, মাছ ধরা, আগাছা, ধান, কচুরিপানা, ভৌত–রাসায়নিক অবস্থা ইত্যাদি) এর ওপর ভিত্তি করে এর বার্ষিক জীবনচক্রকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; বিশ্রাম পর্যায় (পর্যায় ১), প্রস্তুতিমূলক পর্যায় (পর্যায় ২), বাড়ন্ত পর্যায় (পর্যায় ৩) এবং পচন পর্যায় (পর্যায় ৪)। এ ছাড়া বিলের ভৌত–রাসায়নিক অবস্থা, প্রাকৃতিক খাদ্য, ধান, কচুরিপানা, অন্যান্য আগাছা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বিলগুলোকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বে পোনা মজুদের পরিমাণ এবং প্রজাতি নির্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে মৎস্য অধিদপ্তর তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের পোনা মজুদ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
- বিলে জলজ খাদ্য কণিকা (উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ প্লাঙ্কটন) পুকুরের তুলনায় কম। ফলে বিলের মাছ এসব প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর খুব একটা নির্ভর করতে পারে না। তবে যেসব বিলের পানি কম ঘোলা এবং যেসব বিলে বেশি সময়ব্যাপী পানি থাকে সেসব বিলে প্রাকৃতিক খাদ্য তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। যেসব বিলে পানি অধিক ঘোলা সেসব বিলে মজুদকৃত মাছের বৃদ্ধির হার আশানুরূপ নয় এবং এসব বিলে জলজ আগাছা এবং ধানের বিস্তার কম বলে পানির ঘোলাত্ব বেশি।
- যেসব বিলে জলজ আগাছা বেশী সেখানে মজুদকৃত মাছের কতিপয় প্রাকৃতিক খাদ্য যেমন পেরিফাইটন বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। অর্থাৎ জলজ খাদ্য কণিকা কম থাকায় এসব মাছ জলজ নরম উদ্ভিদ খেয়ে বড় হয়। জলজ আগাছা সদ্য ছাড়া পোনা মাছের আশ্রয়স্থল

হিসেবে কাজ করে, রাক্ষুসে মাছের হাত থেকে ও বেআইনি আহরণ থেকে পোনাকে রক্ষা করে। একারণে বিলের পরিবেশে জলজ উদ্ভিদের অধিকতর গুরুত্ব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

- মাছের পাকস্থলী পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কমন কার্প ও মৃগেল প্রচুর পরিমাণে তলদেশের খাবার খায় ও অনির্দিষ্ট দ্রব্যাদি খেয়ে থাকে। কাতলা, রুই ও রাজপুঁটির পাকস্থলীতে প্রায় একই ধরনের খাবার পাওয়া গেছে। উদ্ভিজ্জকণা ছাড়া অন্যান্য খাবার গ্রহণে মজুদকৃত মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। এ ছাড়া আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কাতলা,রুই এবং রাজপুঁটি খাদ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আগাছা ও পেরিফাইটন গ্রহণ করেছে।

- পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে সিলভার কার্প বিলে মজুদের উপযুক্ত নয়। কমন কার্প ও রাজপুঁটি খুবই ভাল বাড়ে; কাতলা ও রুই মোটামুটি বাড়ে।

- পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে অতি সামান্য পরিমাণ রুই জাতীয় মাছের পোনা নদী থেকে বিলে প্রবেশ করে। উন্মুক্ত বিলে (জীবন্ত খাল দ্বারা নদীর সাথে সংযুক্ত) সামান্য পরিমাণ মাছের পোনার প্রবেশ ঘটলেও বদ্ধ, প্রায় বদ্ধ বা পেরেনিয়াল ধরনের বিলে পোনা প্রবেশের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য। এ থেকে বিলে পোনা মজুদের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

- বিলে মাছের মধ্যে মূলত ক্ষতরোগ বেশি দেখা যায় এবং সাধারণত এ রোগ ডিসেম্বরে শুরু হয়ে মার্চ পর্যন্ত থাকে, তবে জানুয়ারিতে এ রোগের সর্বোচ্চ প্রকোপ দেখা যায়। ক্ষতরোগে মজুদকৃত মাছের মধ্যে মৃগেল ও রাজপুঁটি সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্যান্য মাছের মধ্যে শোল, গজার, টাকি, বাইম, পুঁটি সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাতি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যখন তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে ঠিক তখনই ক্ষতরোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি থাকে।

- বিলে মজুদযোগ্য পোনা মাছের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পোনা প্রোটোজোয়ান পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত, কিছু সংখ্যক পোনা আঘাতপ্রাপ্ত, আবার কিছু সংখ্যক পোনার শরীর শ্লাইম (তরল পদার্থ) শূন্য। এ জন্য দায়ি দুর্বল নার্সারি ব্যবস্থাপনা, ত্রুটিযুক্ত পরিবহণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রানজিট পুকুর যেখানে বিভিন্ন স্থানের ভালমন্দ পোনার মিশ্রন ঘটে। সুষ্ঠু নার্সারি ব্যবস্থাপনা, বিল এলাকার কাছাকাছি থেকে মজুদের জন্য পোনা প্রাপ্তি এবং উন্নত পরিবহণের মাধ্যমে বিলে সুস্থ সবল পোনা মজুদ সম্ভব। এছাড়া নার্সারি মালিক এবং পোনা সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান দান করে উন্নত মানের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।

- পোনা মজুদের সময় বিলে অযাচিতভাবে সামান্য পরিমাণ গ্রাস কার্পের পোনা চলে আসে যেগুলোর বৃদ্ধির হার খুবই ভাল। তাই যেসব বিল বদ্ধ ধরনের (পোল্ডারড) এবং যেসব বিলে ধান হয় না সেখানে গ্রাস কার্পের পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

- বেড়জাল, ভেসাল জাল, ডুগাইর ও রাসানী প্রচুর পরিমাণ মজুদকৃত রুই জাতীয় মাছের পোনা নিধন করছে। স্রোতী জাল ও তার জালের ব্যবহার রুই জাতীয় পোনার জন্য ক্ষতিকর না হলেও যাবতীয় মাছের বংশ নিধনের জন্য দায়ি। ঝাঁকি জাল, কৈ জাল ও পুঁটি জাল দিয়েও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মজুদকৃত পোনা ধরা হয়। বেড়জাল একদিকে যেমন মাছের বংশ নিধন করছে তেমনি মাছের খাদ্যাভ্যাস, প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র এবং আশ্রয়স্থলও ধ্বংস করে ফেলছে। প্লাবনভূমি/বিলে বেড়জাল, ভেসাল জাল, ডুগাইর, রাসানী, কৈ জাল ও পুঁটি জালের ব্যবহার জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে মজুদকৃত মাছকে বড় হবার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া স্রোতী ও তার জাল মাছের বংশ নিঃশেষের জন্য দায়ি বলে এ জাল ২টি ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা প্রয়োজন।

- অধিকাংশ বিলের পানিই শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায়। এছাড়া কোন কোন বিলের গভীর অংশে সামান্য পানি থাকলেও সেখান থেকে সব মাছ ছেঁকে ধরে ফেলা হয়। উপরন্তু বিলের অভ্যন্তরে খাল ও কুয়ার মাছ পানি সেচের কারণে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে বিলের কিছু কিছু অংশ সংস্কার/পূনঃখনন করে অভয়াশ্রম গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অভয়াশ্রম গড়ে তুলে সংরক্ষণ করতে পারলে তা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের ওপর কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া

জাকির হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
ডঃ জি. সি. হালদার, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট,চাঁদপুর

বিশ্বে অধিক জনসংখ্যার চাপ, ব্যাপকভাবে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে ক্রমাগতভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণকারী পদার্থগুলোর মধ্যে কীটনাশক অন্যতম। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের পুঞ্জীভূতাংশ (pesticide residue) মাটিতে, পানিতে, বায়ুতে, শস্যে, মাছে, মায়ের দুধে এমনকি এন্টার্টিকার বরফেও পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল জাতের কৃষিজাত পণ্য চাষ হচ্ছে। এসব কৃষিজাত পণ্যের জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৭,০০০ মেট্রিক টন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নিকটবর্তী উন্মুক্ত জলাশয়ে চলে আসে। এ বিপুল পরিমাণ কীটনাশক জলজ পরিবেশকে ব্যাপকভাবে দূষিত করছে। এ দূষণ কোন কোন সময় তাৎক্ষণিকভাবে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। এছাড়াও কীটনাশক মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও দেহের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে থাকে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক অশিক্ষিত বলে তারা কীটনাশকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে পুর্ণ সচেতন নন। এমনকি এর প্রয়োগ বিধি সম্পর্কেও অনেক কৃষকের প্রয়োজনীয় ধারণা নেই। ফলে কৃষকগণ ফসলের কীটপতঙ্গ দমনের জন্য যথার্থ কীটনাশক ব্যবহার না করে ভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন ফসলের কীটপতঙ্গ সঠিকভাবে দমন হয়না অন্যদিকে পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দেখা দেয়। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কীটনাশক ব্যবহারকারী কৃষকদের মধ্যে ৩৪% অধিক মাত্রার কীটনাশক ব্যবহার করেন, কীটনাশক প্রয়োগ সম্পর্কে ৭৬% ব্যবহারকারীর কোন ব্যবহারিক জ্ঞান নেই। এছাড়া প্রায় ৭০% ভাগ কৃষকই এই মর্মে স্বীকার করেছেন যে, অতি মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ ও নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাছের মড়ক প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে কীটনাশক ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত কীটনাশকের পরিচিতি

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৮০টি কীটনাশক বাজারজাত করার জন্য রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। এসব কীটনাশক প্রধানতঃ অর্গানোক্লোরিন, অর্গানোফসফেট, কার্বমেট ও পাইরিথ্রয়েড জাতীয়।

অর্গানোক্লোরিন জাতীয় ঃ যে সব কীটনাশক কার্বন (বা অর্গানো), ক্লোরিন, হাইড্রোজেন ও কখনো অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত তাকে অর্গানোক্লোরিন জাতীয় কীটনাশক বলে। অর্গানোক্লোরিন ছাড়াও ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন, ক্লোরিনেটেড অর্গানিকস ও ক্লোরিনেটেড সিনথেটিকস নামেও পরিচিত। ক্লোরোডেন, এলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি অর্গানোক্লোরিন জাতীয় কীটনাশক। এ জাতীয় কীটনাশকের প্রতিক্রিয়ায় প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, মাংসপেশীতে টান পড়ে এবং এর প্রভাবে প্রাণী নিউরনের সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের ভারসাম্য হারায়। এ জাতীয় কীটনাশকের বিষক্রিয়া অন্যান্য গ্রুপের চেয়ে বেশি এবং এর বিষক্রিয়া পানিতে ৩-১৫ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সমগ্র পৃথিবীতে এ জাতীয় অধিকাংশ কীটনাশকের ব্যবহার বর্তমানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অর্গানোফসফেট জাতীয় ঃ যে সব কীটনাশকে কার্বনের সাথে ফসফরাসযুক্ত থাকে তাকে অর্গানোফসফরাস জাতীয় কীটনাশক বলে। এসব কীটনাশকের সবগুলোই

ফসফরিক অ্যাসিড হতে উদ্ভুত। এরা অর্গানোফসফরাস ছাড়াও অর্গানিক ফসফেট, ফসফরাস এন্টার ও ফসফরিক অ্যাসিড এস্টার নামে পরিচিত। ডায়াজিনন, ডাইমেক্রন, নগস, বাসুডিন, ম্যালাথিয়ন, সুমিথিয়ন ইত্যাদি অর্গানোফসফরাস জাতীয় কীটনাশক। এ জাতীয় কীটনাশকের প্রতিক্রিয়ায় প্রাণীর রক্তের এনজাইমের (cholinesterase) কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্গানোফসফেট জাতীয় কীটনাশকের প্রভাবে স্নায়ু পেশীতে টান পড়ে, পরিশেষে অবশ হয়ে যায় এবং শ্বাসতন্ত্র তার কার্যকারিতা হারায়। এ জাতীয় কীটনাশক পোকা-মাকড় দমনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫০টির অধিক এ জাতীয় কীটনাশক ব্যবহারের জন্য রেজিষ্ট্রিকৃত। এ জাতীয় কীটনাশকের বিষক্রিয়া পানিতে সাধারণত ১৫-১৮০ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

কার্বমেট জাতীয় ঃ এ জাতীয় কীটনাশক কার্বামিক অ্যাসিড হতে উদ্ভুত। এর জৈবিক কার্যকারিতা অনেকটা অর্গানোফসফেট জাতীয় কীটনাশকের মতই। এর প্রতিক্রিয়ায়ও প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের এনজাইমের (cholinesterase) কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণী দেহে প্রবেশের পর খুব তাড়াতাড়ি বিপাক (metabolized) হয়ে যায় ও মূত্রের সাথে বেরিয়ে পড়ে। কার্বারিল, কার্বোফুরান, পাদান, মার্শাল, মিপসিন ইত্যাদি কার্বামেট জাতীয় কীটনাশক। দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি কার্বামেট জাতীয় কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জাতীয় কীটনাশকের বিষক্রিয়া পানিতে ১৫-১৮০ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। মাছের ওপর এর বিষক্রিয়ার মাত্রা কম হলেও অন্যান্য জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণীর ওপর এর বিষক্রিয়ার মাত্রা বেশি।

পাইরিথ্রয়েড জাতীয় ঃ যে সমস্ত কীটনাশকে পাইরিথ্রিন জাতীয় পদার্থ থাকে সেগুলোকে পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক বলে। এ জাতীয় কীটনাশকের বিষক্রিয়া অর্গানোক্লোরিনের মত। এর প্রভাবে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। ডেসিস, রিপকর্ড, সিমবুশ, সুমিসাইডিন, সুমি-আলফা ইত্যাদি এ জাতীয় কীটনাশকের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে প্রায় ১৫-২০টি পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জাতীয় কীটনাশকের বিষক্রিয়া পানিতে ৭-৩০ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এ গ্রুপের প্রায় সকল কীটনাশক প্রয়োগের সাথে সাথে পানিতে বিদ্যমান মাছের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটায়।

বাংলাদেশে কীটনাশক ব্যবহারের গতিধারা

বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান প্রবর্তনের পর হতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক বাজারজাত করা হয়। বিগত ১৯৭৪ সনে কীটনাশকের ওপর থেকে প্রথমে ৫০% সরকারি ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং ১৯৭৯ সনে কীটনাশকের ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি করা হয়। কীটনাশকের ব্যবসা বেসরকারিখাতে হস্তান্তরের পর এর ব্যবহার পূর্ববর্তী বছর হতে তুলনামূলকভাবে সামান্য হ্রাস পায়। কিন্তু পুনরায় ১৯৮৫-৮৬ সন হতে কীটনাশকের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৬ সালের পর হতে বাংলাদেশে কীটনাশকের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালে ১৯৮৬ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

পরিবেশের ওপর কীটনাশকের প্রভাব

পরিবেশ বলতে আমরা সাধারণত বায়বীয়, স্থলজ ও জলজ পরিবেশকে বুঝে থাকি। নিম্নে বিভিন্ন পরিবেশের ওপর কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১) বায়বীয় পরিবেশ ঃ সাধারণত ফিমিগ্যান্ট জাতীয় কীটনাশক সহজে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়বীয় পরিবেশকে দূষিত করে। এ ধরনের দূষণ কীটনাশকের কারখানা, গুদাম ও দোকানের এলাকায় বেশি হয়ে থাকে। বায়ু হতে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে কীটনাশক মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- বৃক্ক, যকৃৎ, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, ত্বক ও মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। দীর্ঘক্ষণ কীটনাশকযুক্ত স্থানে অবস্থান করলে মানুষেরও মৃত্যু হতে পারে। কিছু কিছু কীটনাশক অত্যন্ত বিষাক্ত ত্বকে ক্ষতের মাধ্যমে রক্তের সংস্পর্শে এলে মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

২) স্থলজ পরিবেশ ঃ পৃথিবীর পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্যান্য দরিদ্র দেশের মত বাংলাদেশও বেশি মাত্রায় ক্ষতির সম্মুখীন । কেননা দরিদ্র দেশের জনগোষ্ঠী প্রধানত কৃষিকাজ ও জমির ওপর নির্ভরশীল। অধিক উৎপাদনের জন্য কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের পর কিছু কিছু কীটনাশক (পাইরিথ্রয়েড ও কার্বামেট) অল্প দিনের মধ্যে তাদের কার্যকারিতা হারালেও অধিকাংশ কীটনাশকের (অর্গানোক্লোরিন ও অর্গানোফসফেট) পুঞ্জীভূত কার্যকারিতা (residual effect) বছরের পর বছর মাটিতে থেকে যায়। আবার কোন একটি কীটনাশক ব্যবহারের ফলে তা দ্বারা শস্যের নির্দিষ্ট পোকা ছাড়াও মাটিতে বিদ্যমান অন্যান্য প্রায় সকল জীব মারা যায়। ফলে পরিবেশ ক্রমশ

তার জীব-বৈচিত্র্য (biodiversity) হারাচ্ছে এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে।

৩) জলজ পরিবেশ ঃ সকল জীবের দেহগঠন, বৃদ্ধি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই পানির অপর নাম জীবন। সেই পানি ও জলজ পরিবেশ ক্রমাগত বর্ধিত হারে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্বারা ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রায় ২৫% ধুয়ে মুছে পানিতে এসে পড়ে। কৃষি জমি ছাড়াও কীটনাশক তৈরির কারখানা, শহরের নর্দমার পানি, কীটনাশক স্প্রে করার যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকের পাত্র ধৌত করার মাধ্যমে জলজ পরিবেশে কীটনাশক এসে থাকে ও এভাবে জলজ পরিবেশও দূষিত হয়। এ দূষণ কোন কোন সময় তাৎক্ষণকভাবে মাছের মৃত্যু ঘটায়। অন্যান্য জলজ জীব যেমন- উদ্ভিজ্জ কণা (ফাইটোপ্লাংক্টন), প্রাণিজ কণা (জুপ্লাংক্টন) ও অন্যান্য মেরুদন্ডী এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর ওপরও সরাসরি কীটনাশকের বিষক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। অনেক জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণী যেমন ক্রাস্টাশিয়া, ক্লাডোসেরা, কপিপোড, পোকা-মাকড়ের লার্ভা ইত্যাদি মাছের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এসব অমেরুদন্ডী প্রাণীর ওপরও কীটনাশকের প্রভাব মাছের চেয়ে অনেক বেশি। কীটনাশক সমৃদ্ধ জীবন্ত খাদ্য কোন মাছ খেলে খাদ্য গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যে ঐ মাছ মারা যায়। এ দূষণ মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের মৃত্যু ছাড়াও জলজ পরিবেশের ভৌত-রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তন ও খাদ্য গ্রহণ ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটায়। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলোঃ

ক) জলজ পরিবেশের ভৌত-রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তন ঃ জলজ পরিবেশে জীবের স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা নির্ভর করে পরিবেশের ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীর (যেমন- তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বনডাই-অক্সাইড, পিএইচ, হার্ডনেস, জৈব পদার্থ ইত্যাদি) ওপর। কীটনাশক দ্বারা জলজ পরিবেশ দূষিত হলে জলজ পরিবেশে বসবাসরত জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাসের আদান প্রদান ব্যাহত হয়। দূষিত পরিবেশে মাছসহ অন্যান্য জলজ জীবের অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ এর ওপর অর্গানোফসফরাস জাতীয় কীটনাশকের হাইড্রোলাইসিস নির্ভর করে। পানির তাপমাত্রা ২৫-৩৫ ডিগ্রি মে. অর্গানোফসফরাস জাতীয় কীটনাশক কয়েক দিনের মধ্যে পানিতে সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোলাইসিস হয়। পানির তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সে. বৃদ্ধির ফলে পানিতে অর্গানোফসফরাস জাতীয় কীটনাশকের কার্যকারিতা ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। পানির পিএইচ বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্গানোফসফরাস জাতীয় কীটনাশকের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। কীটনাশক দ্বারা দূষিত পানির হার্ডনেসও পরিবর্তিত হয় যা কখানো কখনো জলজ প্রাণীর সহ্যসীমার বাইরে চলে যেতে পারে। এভাবে কীটনাশক দ্বারা জলজ পরিবেশের ভৌতরাসায়নিক গুণাবলী পরিবর্তিত হওয়ার ফলে জলজ পরিবেশ জীবের বাসবাস অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

খ) জলজ পরিবেশে বসবাসরত প্রাণীর প্রজনন ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঃ অনেক জলজ প্রাণী জলজ উদ্ভিদের ওপর ডিম দেয়। কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে জলজ উদ্ভিদ বিষাক্ত হয়ে পড়ে এবং উক্ত বিষাক্ত পদার্থ জলজ উদ্ভিদ হতে ডিমে প্রবেশ করে। ফলে অধিকাংশ ডিম নষ্ট হয়ে যায় বা পরিস্ফুটন ক্ষমতা হারায়। এ ছাড়া অধিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে খালবিল, হাওর, বাঁওড়, নদীসহ সকল জলাশয়ের পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। এরূপ দূষিত পরিবেশ জলজ প্রাণীর সফল প্রজননের উপযোগী নয়। ফলে জলজ প্রাণী প্রজনন ক্ষেত্র পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রজনন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

মৎস্যসম্পদের ওপর কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া

মৎস্যসম্পদের ওপর কীটনাশকের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহ প্রধান। যথা ঃ

১) মাছের সরাসরি মৃত্যু ঃ প্রায় সকল প্রকার কীটনাশকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছের জন্য ক্ষতিকর। তাদের মধ্যে অর্গানোক্লোরিন ও পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের প্রায় সকল কীটনাশক এবং অর্গানোফসফেট ও কার্বামেট গ্রুপের প্রায় অর্ধেক কীটনাশক মাছের জন্য চরম বিষাক্ত। চরম বিষাক্ত কীটনাশক নিচু এলাকার ধান ক্ষেতে প্রয়োগের সাথে সাথে উক্ত স্থানসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থানরত মাছের সরাসরি মৃত্যু ঘটে থাকে। এছাড়া চরম বিষাক্ত কীটনাশক তৈরির কারখানার নিকটবর্তী জলাশয় সমূহের পানি কারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষিত হওয়ায় উক্ত এলাকার মাছেরও সরাসরি মৃত্যু ঘটে থাকে। বিভিন্ন প্রকার কীটনাশকের বিষাক্ততা নিরূপণের জন্য মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমে দেখা গিয়েছে যে, আমাদের দেশে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমদানিকৃত কীটনাশকের মধ্যে প্রায় ৬০% চরম বিষাক্ত, ৩০% অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত এবং মাত্র ১০% বিষাক্ত নয়। নিম্নে সারণি-১ এ গবেষণাগারে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কীটনাশকের বিষাক্ততা পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করা হলো।

সারণি-১। বাংলাদেশে পোকা দমনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার কীটনাশকের গবেষণাগার পরীক্ষার ফলাফল।

কীটনাশকের নাম		সুপারিশকৃত প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগের ৯৬ ঘন্টার মধ্যে	মন্তব্য
সাধারণ নাম	বাণিজ্যিক নাম	কেজি বা লিটার/হেক্টর	মাছের মৃত্যু হার (%)	
হেপ্টাক্লোর	হেপ্টাক্লোর ৪০ পি	৪.৫ কেজি	১০০	চরম বিষাক্ত
ডাই-এলড্রিন	ডাই-এলড্রিন	৪.৫ ,,	১০০	ঐ
ডায়াজিনন	বাসুডিন ১০ জি	১৬.৮ ,,	১০০	ঐ
		ডায়াজিনন ৬০ ইসি	১.৬৮ লি	১০০
ঐ				
ফেনভেলারেট	সুমিসাইডিন ২০ ইসি	২৫০ মি. লি	১০০	ঐ
সাইপারমেথ্রিন	রিপকর্ড ১০ ইসি	৫৬০ ,,	১০০	ঐ
		সিমবুশ ১০ ৎ	৫০০ ,,	১০০
ঐ				
ডেল্টামেথ্রিন	ডেসিস ১.৫ ইসি	৫০০ ,,	১০০	ঐ
পারমেথ্রিন	পাউন্স ১.৫ ইসি	৩.৪ কেজি	১০০	ঐ
ডেজোমেট	বাসমিড জি	১৬.৮ ,,	১০০	ঐ
ফেনপ্রপাথ্রিন	ডানিটল ১০ ইসি	৫০০ মি. লি	১০০	ঐ
ফসফামিডন	ডাইমেক্রন ১০০ এসসিডব্লিউ	৮৪০ ,,	১৮	অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত
কার্বোফুরান	কার্বোফুরান ৩ জি	১৬.৮ কেজি	১০	ঐ
	ফুরাডন ৫ জি	১৬.৭ ,,	১০	ঐ
ডাইক্লোরভস	নগস ১০০ ইসি	৫৬০ মি.লি	৫	কম বিষাক্ত
ফেনিট্রোথিয়ন	সুমিথিয়ন ৫০ ইসি	১.১২ লি	–	ঐ
ম্যালাথিয়ন	ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি	১.১২ লি	–	ঐ
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ এসপি	১.৩ কেজি	–	ঐ
কার্বোসালফান	মার্শাল ৬ জি	৬ ,,	–	বিষাক্ত নয়

উপরোক্ত সারণি-১ এ প্রদর্শিত ২০টি কীটনাশকের মধ্যে ১১টি কীটনাশকই চরম বিষাক্ত এবং ফসলের পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগের ৯৬ ঘন্টার মধ্যে গবেষণাগারে মাছের ১০০% মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত চরম বিষাক্ত কীটনাশকসমূহের মধ্যে ডায়াজিনন, ফেনভেলারেট, সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশকসমূহ আমাদের দেশের নিচু এলাকার ধানসহ অন্যান্য ফসলের পোকা দমনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওপরের তথ্য হতে দেশের মৎস্যসম্পদের ওপর কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়।

২) মাছের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঃ কীটনাশকের প্রতিক্রিয়ায় মাছের বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মাছের দেহে যে অংশে চর্বির পরিমাণ বেশি সেখানেই শোষিত কীটনাশকের ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া মাছের শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ও ডিমে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে কীটনাশক পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং যথাযথভাবে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপাদিত হয় না। সামান্য পরিমাণ ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপন্ন হলেও তার পরিপক্কতা আসে না। কারণ কীটনাশকের প্রভাবে স্পারমাটোজেনেসিস ও ওজেনেসিস প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুঞ্জীভূত কীটনাশকসমৃদ্ধ ডিম ফুটে যদি বাচ্চা হয় তার বেশির ভাগ বাচ্চাই পরিস্ফুটনের পর মারা যায় এবং যে সমস্ত বাচ্চা বেঁচে থাকে তাদের বেশির ভাগ বিকলাঙ্গ হয়। এছাড়াও কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় মাছের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন- বৃক্ক, যকৃৎ, ফুলকা, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, ত্বক ও মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্গানোক্লোরিন জাতীয় পুঞ্জীভূত কীটনাশকের প্রভাবে মাছের রক্তে সুগার ও যকৃতে গ্লাইকোজেনের পরিমাণ দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সুগার ও গ্লাইকোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হাইপারগ্লাইসেমিয়া এবং কমে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে থাকে। কার্প জাতীয় মাছের রক্তে সাধারণত ৬২.১% মিলিগ্রাম সুগার থাকে। কীটনাশকের প্রভাবে মাছের দেহে নিউক্লিক অ্যাসিডের (ডিএনএ ও আরএনএ) পরিবর্তন দেখা যায়। কার্বামেট জাতীয় পুঞ্জীভূত কীটনাশকের প্রভাবে মাছের রক্তের ইরাইথ্রোসাইট, লিওকোসাইট ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১.৫-২.০ গুণ হ্রাস পায়।

৩) মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঃ আমাদের দেশে বর্ষাকাল জুড়ে থাকে মাছের প্রজনন মৌসুম এবং এ সময়ই মূলত বিভিন্ন মাছ ডিম দিয়ে থাকে। বিশেষ করে কৈ, পুঁটি, শিং, মাগুর, টাকি, শোল, গজার, বেলে, টেংরা ইত্যাদি মাছ সাধারণত অল্প পানিতে ধানের জমিতে ডিম দেয় এবং বাচ্চা লালন করে। কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউস ইত্যাদি সহ অন্যান্য মাছের ছোট পোনা নিচু জমির ধানক্ষেতকে লালন ভূমি হিসেবে ব্যবহার করে। ধানের ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে এসমস্ত এলাকার পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ে এবং মাছ এ সমস্ত স্থানকে প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার না করে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় বা প্রজনন কাজ ব্যাহত হয়।

৪) মাছের খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঃ কীটনাশকের বিষক্রিয়ার প্রভাবে জলজ মেরুদন্ডী প্রাণীর চেয়ে অমেরুদন্ডী প্রাণী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় সকল জলজ অমেরুদন্ডীও নিম্নশ্রেণীর মেরুদন্ডী প্রাণী মাছের অতি প্রিয় ও প্রধান খাদ্য। কীটনাশকের প্রভাবে এসব গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রাণীর বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে এদের বংশবিস্তার ব্যাহত হয় ও প্রাচুর্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং মাছের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্যের অভাবে মাছ তার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে বা নতুন খাদ্য গ্রহণক্ষেত্র সন্ধানে বাধ্য হয়।

এভাবে কীটনাশকের বিষক্রিয়ার ফলে প্রতি বছর দেশের মৎস্যসম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ অতি প্রাচীন কাল হতে মৎস্যসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এক সময় দেশে উৎপাদিত অধিকাংশ মাছ মুক্ত জলাশয় হতে পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে কীটনাশক দ্বারা জলজ পরিবেশ দূষণ অন্যতম প্রধান কারণ বলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধারণা। আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে অধিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া মাছ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কীটনাশক যেমন ক্লোরোডেন, ডাই-এলড্রিন, ডিডিটি হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি কীটনাশক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নিষিদ্ধ অন্যান্য কীটনাশকও দেশে অবৈধভাবে আমদানি ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে মাছ ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার জরুরিভাবে দেশে নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

ফিশপাস

এস. এম. নাজমুল ইসলাম
ফ্যাপ-৬, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সমগ্র বিশ্বে পানিসম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিস্তার লাভ করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে দেশের বহুস্থানে বাঁধ, পানি নিয়ন্ত্রক গেট ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মাছের চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। উন্মুক্ত বা প্রবাহমান জলাশয়ে মাছের স্বাভাবিক চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মাছের প্রচরণশীল স্বভাবে (migratory behaviour) ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন আসছে যার ফলশ্রুতিতে এদের প্রাকৃতিক প্রজননের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাছ তার জীবনচক্রের বিভিন্ন সময়ে প্রজনন, বৃদ্ধি বা খাদ্যানুসন্ধানের জন্যে অথবা জলবায়ু বিরূপ প্রভাব হতে নিজেকে সুরক্ষার জন্যে বা সঠিক পরিবেশ প্রাপ্তির জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে অথবা কোন বিশেষ পরিবেশ হতে ভিন্ন পরিবেশে পরিভ্রমণ করে থাকে। একেই সাধারণভাবে মৎস্য প্রচরণ (fish migration) বলা হয়। কিন্তু পানিসম্পদ উন্নয়নের বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নকল্পে বাঁধ নির্মাণের ফলে মাছের চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় এদের প্রজনন ও বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়ে মৎস্যসম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। দেশের মৎস্যসম্পদ হ্রাসের চিহ্নিত কারণসমূহের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচপ্রকল্প অন্যতম।

মৎস্য প্রচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় নির্দিষ্ট মৌসুমে বা জীবনচক্রের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ তাদের প্রজননযোগ্য বা বৃদ্ধিতে সহায়কযোগ্য অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনা। এ অবস্থার ফলে ইতোমধ্যে বহু প্রজাতির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং কতিপয় প্রজাতির বিলুপ্তি হতে চলেছে। কোন প্রকার সংযোগ না রেখে হাওরসমূহ ঘিরে বাঁধ প্রদানের ফলে প্রবাহমান জলাশয় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান জৈবশৃঙ্খল ছিন্ন হয়, মৎস্য প্রজননযোগ্য এলাকার ভৌত-রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে এবং বাঁধের অভ্যন্তরস্থ মৎস্য বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে।

পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের উপরিবর্ণিত বিরূপ প্রভাব হতে মৎস্যসম্পদকে রক্ষার জন্যে মৎস্য চলাচলের উপযোগী এক প্রকার অবকাঠামো নির্মাণই একমাত্র প্রতিকার হিসেবে সারাবিশ্বে গণ্য হয়ে আসছে। সাধারণভাবে এ ধরনের অবকাঠামোকে 'ফিশপাস' বা 'ফিশওয়ে' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফিশপাস হচ্ছে এমন একটি কাঠামো যা কোন জলাশয়ে কৃত্রিম বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে মৎস্য চলাচলের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ফিশপাস কাঠামো দুটো জলাশয়ের মধ্যবর্তী বাঁধে নির্মাণ করা হয় যাতে এর মাধ্যমে প্রবাহমান জলস্রোত এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাতে মাছ নিয়ন্ত্রিত স্রোতধারা অতিক্রম করে অক্ষত এবং ক্লান্তিহীন অবস্থায় এক প্রান্তের জলাশয় থেকে অপর প্রান্তের জলাশয়ে সহজেই যাতায়াত করতে পারে। ফিশপাস সাধারণত চার ধরনের হয়ে থাকে এগুলি হলো ঃ

১। ভার্টিক্যাল স্লট ফিশপাস (Vertical slot fishpass)
২। পুল এন্ড ওয়্যার ফিশওয়ে (Pool & weir fishway)
৩। ডেনিল ফিশওয়ে (Denil fishway)
৪। ফিশলক (Fish lock)

আমাদের দেশের অধিকাংশ বাঁধ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচকার্যের জন্য নির্মিত হওয়ায় প্রাক্-বর্ষা ও বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি হাওরের পানির মধ্যে পার্থক্য বেশি হওয়ায় ভার্টিক্যাল স্লট ফিশপাস অধিকতর লাগসই বলে গণ্য করা হচ্ছে। বাঁধের দু'পাশের পানির কাছাকাছি হলে পুল এণ্ড ওয়্যার ফিশওয়ে নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে অবস্থান বিশেষে এর ধরন ভিন্ন রকমও হতে পারে। ফিশপাসের ধরন ও স্থান নির্বাচন কালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক।

১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব সময়ে মৎস্যসম্পদের অবস্থা (status)।

২। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের আকৃতি ও প্রকৃতি।

৩। এলাকায় প্রচরণকারী মাছের (migratory fish) প্রাচুর্য ও তাদের স্বভাব এবং সন্তরণ গতি

৪। বাঁধের দু'প্রান্তের জলাশয়ের সঙ্গে ফিশপাস কাঠামোর সংযোগ চ্যানেলের অবস্থা ও প্রকৃতি।

৫। সেচ প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তর ভাগের শস্য বিন্যাস ও শস্য উৎপাদন মৌসুম।

৬। বন্যা নিয়ন্ত্রণ/সেচ প্রকল্প ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের topography, hydrology এবং hydraulics এর ধরন।

ফিশপাস অবকাঠামো নির্মাণের স্থান নির্বাচনকল্পে বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য আহরণের জন্য মাৎস্য জীববিজ্ঞানী, কৃষি বিজ্ঞানী এবং পানিসম্পদ প্রকৌশলী সমন্বয়ে গঠিত দলের মাধ্যমে বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। সঠিক সমীক্ষা ব্যতিরেকে ফিশপাস অবকাঠামোর ধরন নির্ধারণ ও স্থান নির্বাচন পরবর্তীতে ফলদায়ক নাও হতে পারে।

কাশিমপুর ফিশপাস

মৌলভীবাজার জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত মনু নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প বাঁধের কাশিমপুর নামক স্থানে কানাডীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (Canadian International Development Agency, সংক্ষেপে CIDA) অর্থানুকূল্যে উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের (North-east Regional Water Management Project, সংক্ষেপে NERP) অধীনে ১৯৯৫ সালের মে মাসে এদেশে সর্বপ্রথম একটি ফিশপাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। এ প্রযুক্তির প্রয়োগ আমাদের দেশে নতুন হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এর প্রথম প্রয়োগ ঘটে। তবে তা' ততটা বিজ্ঞানভিত্তিক ছিলনা। পরবর্তীতে ডেনিল ১৯০৯ সালে ফিশপাস প্রযুক্তির ওপর গবেষণা পরিচালনা করে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর ওপর ভিত্তি করেই বিশ্বের বহু দেশে ফিশপাস নির্মাণ ও সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্থান, পরিবেশ ইত্যাদির সাথে খাপ খাইয়ে এর কাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ওপর ব্যাপক গবেষণা চলছে। কাশিমপুরে নির্মিত পরীক্ষামূলক ফিশপাসটি ইতোমধ্যে একটি সফল উদ্যোগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে লব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞান অনুরূপ অবকাঠামো নির্মাণ কালে আমাদের দেশের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে এর উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মনু নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পাঁচটি মাতৃ জলমহালের মধ্যে অন্যতম সেরা মাতৃ জলমহাল (mother fisheries) কাওয়াদিঘি হাওরের মৎস্যসম্পদের ওপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনু নদী প্রকল্পের ৫৯.০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধটি মনু নদীর ডান তীর এবং কুশিয়ারা নদীর বাম তীর ঘেঁষে কাওয়াদিঘি হাওরকে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে নির্মাণ করা হয়েছে। হাওরের পূর্ব দিকে রয়েছে ভাটেরা পাহাড়। কাওয়াদিঘি হাওরের অভ্যন্তর ভাগে রয়েছে ৭৯ টি বিল। বাঁধ নির্মাণের পূর্বে ৭টি ছোট নদী এবং খাল দ্বারা মনু ও কুশিয়ারা নদীর সাথে বিলগুলোর সংযোগ রক্ষা হতো। এককালে কাওয়াদিঘি হাওরে শতাধিক প্রজাতির মাছ পাওয়া যেতো এবং বহু প্রজাতির মাছের প্রজননের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। মনু নদী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে প্রাকবর্ষা ও বর্ষা মৌসুমে পূর্বের ভাটেরা পাহাড় থেকে স্বচ্ছ পানি ৩০ টিরও অধিক পাহাড়ি ঝর্ণা বেয়ে নেমে এসে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত নদীর পানির সাথে ধাক্কা খেয়ে আবর্তকার স্রোত উৎপন্ন করে মৎস্য প্রজননের প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতো। সে সময়ে কুশিয়ার নদী হতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংযোগ নদী খালগুলোর মাধ্যমে ঝাঁকে ঝাঁকে কাওয়াদিঘি হাওরে প্রবেশ করে হাওরের নির্মল পরিবেশে প্রজনন ঘটাতো। বর্ষামৌসুম জুড়ে বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিতে এরা বিচরণ করে বড় হতো এবং বর্ষা-উত্তর মৌসুমে হাওরের পানি হ্রাস পাবার সাথে তাল রেখে কুশিয়ারা নদীতে ফিরে যেতো এবং কিয়দংশ হাওরের গভীর বিলগুলোতে আশ্রয় নিতো। হাওরটি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির বৃহাদাকৃতির মাছের ভান্ডার বলে সুপরিচিত ছিল। এ হাওরের মৎস্যসম্পদকে ঘিরেই বিগত প্রায় দু'শতাধিক বছর ধরে মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর ঘাটে প্রতি বছর দেশের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী মাছের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু ১৯৮৩ সালে মনু নদী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বন্যা নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জিত ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হলেও হাওরের মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে ১৯৯২ সনে ২০% ভাগে এসে দাঁড়ায়। এছাড়াও হাওরের কতিপয় প্রজাতির যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল, ঘনিয়া, কালিবাউশ,

আড়, চিতল ইত্যাদি মাছের উপস্থিতি প্রায় শূন্যে নেমে আসে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে কাওয়াদিঘি হাওরে মাছের প্রবেশ সুবিধা প্রদান করে প্রজাতির সংখ্যা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাশিমপুরস্থ করাদাইর খালকে কুশিয়ারা নদীর সাথে সংযোগ করে মনু নদী প্রকল্প বাঁধের ওপর ফিশপাসটি নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ফিশপাসটি হলো সিঙ্গেল জেট ভার্টিক্যাল স্লট ধরনের এবং এর গঠন নিম্নরূপ ঃ

কাঠামো সংক্রান্ত	পানি গতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত	পরিচালন সংক্রান্ত
দৈর্ঘ্য–৬১.৮৫ মিটার তলের উচ্চতা – ৫.৪৬ মিটার (নদীর দিকে) ৩.১৬ মিটার (হাওরের দিকে) ডেকের উচ্চতা –১১.৪৬ মিটার (নদীর দিকে) ৮.১৬ মিটার (হাওরের দিকে) গড় উচ্চতা – ৬.৫৪ মিটার প্রস্থ – ৫.০০ মিটার পুলের সংখ্যা – ১৭টি পর্যবেক্ষণ পুলের সংখ্যা– ২টি পুলেল দৈর্ঘ্য – ৩.১০ মি. পুলের প্রস্থ – ২.৫০ মি. ব্যাফেলের সংখ্যা – ১৬টি ব্যাফেলের উচ্চতা –৪.৫০ মি. স্লটের প্রস্থ – ০.৪১ মি.	অভ্যন্তর ভাগে পানির – সর্বোচ্চ নির্গমণ বেগ – ১.৩০ মি.লি.	মেইন গেট – ৪ টি স্ক্রীন গেট – ৮ টি পর্যবেক্ষণ কেইজ – ২ টি

ফিশপাসের অভ্যন্তর ভাগে রয়েছে একসারি চৌবাচ্চা (pool)। নদীর দিকে ফিশপাসটির ২টি গেট খুলে দিলে এতে পানি প্রবেশ করে যখন এক চৌবাচ্চা থেকে অপর চৌবাচ্চায় প্রবাহিত হয় তখন পানির স্রোত নিয়মন ফলকের (baffle) মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে যাতে সহজেই মাছ স্রোতের বাধা অতিক্রম করে বা স্রোতের গতির সাথে খাপ খাইয়ে নদী হতে হাওরে বা হাওর হতে নদীতে প্রবেশ করতে পারে। কোন্ প্রজাতির মাছ কখন কোন দিকে চলাচল করছে তা পর্যবেক্ষণ চৌবাচ্চায় সংযোজিত বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অতি সহজেই নিরূপণ করা যায়।

ফিশপাস নির্মাণের পর এক বছর পরিচালন সময়ের মধ্যে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফল পরিলক্ষিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, ইতোমধ্যে ৬২ টি প্রজাতির মাছ এ অবকাঠামো ব্যবহার করে নদী থেকে হাওরে এবং হাওর থেকে নদীতে স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থায় যাতায়াত করছে। কাওয়াদিঘি হাওরে ১৯৯২–৯৩ সালে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী যেখানে প্রজাতির সংখ্যা ছিল ৪০ টি সেখানে ১৯৯৫–৯৬ এর জরিপে প্রজাতির সংখ্যা ৬৫ টি পাওয়া গিয়েছে। হাওরের ১৯৯৫–৯৬ সালের উৎপাদন জরিপ হতেও ফিশপাসের ফলদায়ক প্রভাবের সমর্থন মেলে। ১৯৯২–৯৩ সালকে হাওরের প্রারম্ভিক উৎপাদন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। ১৯৯২–৯৩ সালে প্লাবনভূমি ও বিলের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩১৪ ও ২৩ মেট্রিক টন এবং সমগ্র হাওরের উৎপাদন ছিল ৩৩৭ টন। ১৯৯৫–৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্লাবনভূমি ও বিলে যথাক্রমে ৫৩৯ টন এবং ১৪৯ টনে এবং সমগ্র হাওরের উৎপাদন দাঁড়ায় ৬৮৮ টনে। ফিশপাস নির্মাণের প্রভাব নিরূপণ করে কাওয়াদিঘি হাওরের মৎস্য উৎপাদন, পরিবেশগত উন্নয়ন এবং মৎস্যজীবীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে জরিপ কাজ চলছে। চলতি মৌসুমটি ফিশপাস পাইলট প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষ। পর্যায়ক্রমে তিন বছর পরিচালনার পর ফিশপাসের প্রভাব সম্পর্কে উপসংহারে পৌঁছা যাবে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ হারুণুর রশিদ, উপপরিচালক ও
মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের ৪৮০ কিলোমিটার তটরেখা ও ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত উর্বরা সমুদ্র এলাকা রয়েছে, যা এদেশের মূল ভূখন্ডের আয়তনের চাইতেও বড়। এই জলসীমায় আহরণযোগ্য চিংড়ি ও মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা অনেক। আহরণের পদ্ধতিও নানাবিধ ও বিচিত্র। এছাড়া রয়েছে অনাহরিত বিপুল সম্পদ। আহরণযোগ্য ও অনাহরিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা গেলে এখাত থেকে দেশের প্রোটিন ঘাটতির সিংহভাগ পূরণ করেও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। অন্যান্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশের মতোই আমাদের দেশেও এই বহু প্রজাতিভিত্তিক মৎস্যসম্পদ আর সেই সাথে মুক্ত জলাশয়ের বহু প্রকার ও পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা বেশ জটিল, আকার সমস্যাও অন্তহীন।

আহরিত মৎস্যসম্পদ ঃ সনাতনী ও আধাসনাতনী পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের জাল ও নৌকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে বেহুন্দি জাল, টানা জাল, খেপলা জাল, বড়শি, ফাঁদ, ফাঁস জাল প্রধান। এগুলো ব্যবহার করতে মোহনাঞ্চলে দেশী অযান্ত্রিক নৌকা ও একটু দূরে অগভীর পানিতে যান্ত্রিক নৌকা ব্যবহার করা হয়। অনেক রকমের ফাঁস জাল রয়েছে। যেমন– ইলিশ ধরার ভাসান জাল, বড় ফাঁসের ভাসান জাল, ডুবো জাল, পাথুরে জাল, ইলিশ ধরার টোড জাল ও ছোট ফাঁসের বাটা জাল। বেহুন্দি জাল মোহনায় ও অগভীর সাগরে পাতা হয়। টানা জাল বা 'বীচসীন' নদীর মোহনায় ও উপকূলে অযান্ত্রিক নৌকার সাহায্যে পাতা হয় ও কিনার থেকে টানা হয়। হাজারী বড়শি যান্ত্রিক নৌকা দিয়ে অগভীর সমুদ্রের তলদেশে পাতা হয়। আশির দশকের প্রথম দিকে মায়ানমার হতে টেকনাফ–কক্সবাজার উপকূলে ট্রামেল জাল নামে এক ধরণের তিন পরল্লার ডুবো ফাঁস জাল বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে।

রাশিয়ান প্রযুক্তি সহায়তায় সরকারি পর্যায়ে গড়ে ওঠা ট্রলার বহর ১৯৭৪ সালে প্রথম বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় গভীর অঞ্চলে বাণিজ্যিকভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৫৩টি ট্রলার (৪১টি চিংড়ি ও ১২টি মৎস্য) ৪০ মিটার থেকে ৮০ মিটার গভীর মহীসোপান অঞ্চলে চিংড়ি ও মাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এথেকে বার্ষিক ৩,৫০০–৬,০০০ মেট্রিক টন চিংড়ি ও ৮,০০০–১২,০০০ মেট্রিক টনে মতো বিভিন্ন মাছ অবতরণ করা হয়ে থাকে।

সামুদ্রিক চিংড়ির মধ্যে প্রধানত হরিণা, বাগদা, চাকা, বাঘাতারা ও সাদা চিংড়ি এবং তলদেশীয় মাছের মধ্যে পোয়া, কাটা, রূপবান, সোনালী বাটা, টিকটিকি মাছ, ছুরি, টেক চান্দা, দাতিনা, পরিমাছ, রূপচাঁদ, লটিয়া ও রাঙ্গাচোখা উল্লেখযোগ্য।

আংশিক আহরিত মৎস্যসম্পদ ঃ ট্রল ফিশারিসহ বিভিন্ন সনাতনী ও আধাসনাতনী পদ্ধতির আহরণ প্রক্রিয়ায় প্রধানত তলদেশীয় মাছ ও চিংড়ি ধরা পড়ে। ট্রল নেট ও বেহুন্দি জালের স্কুইড বা কাটল ফিশ, পাতা মাছ এবং বিভিন্ন ফাঁস জালে লবস্টার, হাঙ্গর, পিতাম্বরী ইত্যাদি উপ–আহরিত বা বাই–ক্যাচ হিসেবে আসে। স্কুইড বা কাটল ফিশ আহরণের জন্য অনেক দেশে স্কুইড জিগিং প্রচলিত। এই পদ্ধতি এখানে অবর্তমান। লবস্টার আহরণের জন্য বিভিন্ন রকমের লবস্টার পট বা ফাঁদ রয়েছে যেগুলো এখনো এদেশে পরিচিত নয়। অন্যদিকে অগভীর অঞ্চলে বিভিন্ন ফাঁস বা জালে বাই–ক্যাচ হিসেবে উপরিতলের মাছের মধ্যে হাঙ্গর, পিতাম্বরী, মাইট্র্যা ও টুনা খুবই অল্প পরিমাণে

ধরা পড়ে। ট্রল জালেও বাই-ক্যাচ হিসেবে হাঙ্গর, পিতাম্বরী পাওয়া যায়। এই আংশিক আহরিত সম্পদ উপযোগী পদ্ধতির অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

অনাহরিত সম্পদ ঃ বিভিন্ন প্রজাতির উপরিতলের মাছের কিছু কিছু যদিও বাই-ক্যাচ হিসেবে অগভীর অঞ্চল থেকে আহরিত হয়ে থাকে তথাপি টুনা, মাইট্যা, সার্ডিন, হেরিং, এনকোভি, হাঙ্গর ইত্যাদি প্রজাতি গভীর অঞ্চলের মাছ হওয়ায় বহুলাংশে অনাহরিত থেকে যাচ্ছে। সাত প্রজাতির টুনা ও চার ধরণের মাইট্র্যা মাছ আমাদের জলসীমায় রয়েছে যা আহরণের কোন প্রকার উপকরণ বা প্রযুক্তি বর্তমানে আমাদের নেই।

উন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র

অনাহরিত মৎস্যসম্পদের উন্নত আহরণ ঃ ট্রলার বহর ১০০ মিটার পর্যন্ত গভীর অঞ্চলেই সাধারণত চিংড়ি ও তলদেশীয় মাছ আহরণ করে থাকে। আমাদের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় ১০০ মিটারের অধিক গভীরতায় এবং তার চেয়ে কম গভীরতায় প্রচুর উপরিতলের মাছ রয়েছে যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই উপরিতলের মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় ও লাভজনকভাবে তা আহরণযোগ্য কিনা এর ওপর যথাযথ জরিপ কাজ অদ্যাবধি পরিচালিত হয়নি। তবে ডঃ ফ্রিড অব নানসেন-এর জরিপকালে উপরিতলের মৎস্য মজুদের পরিমাণ ৯০,০০০-১,৬০,০০০ মেটিক টনের মধ্যে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইনে পার্স-সিন, বড়শি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর টুনা, মাইট্র্যা প্রভৃতি বড় আকারের উপরিতলের মাছ আহরিত হয়ে আসছে। বিশ্ববাজারে টুনা জাতীয় মাছের দাম বেশি, চাহিদাও ব্যাপক। এসব মাছ দ্রুত সাঁতরাতে পারে বলে এক দেশ থেকে অন্য দেশের জলসীমায় চলে যেতে পারে। কাজেই যথাযথ পদ্ধতিতে এই সম্পদের ওপর জরিপ চালানো দরকার এবং এরপর লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে উপরিতলের মৎস্যসম্পদ আহরণে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এজন্য বিশেষ ধরণের মৎস্য নৌযান এবং প্রযুক্তি সংগ্রহ ছাড়াও দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হবে।

অন্যান্য সম্পদের উন্নয়ন ঃ অন্যান্য সম্পদের মধ্যে লবস্টার আহরণের জন্য বিশেষ ধরণের পট বা ফাঁদ, কাটল ফিশ ধরার জন্য স্কুইড জিগিং ডিভাইজ, ইন্ডিয়ান হ্যালিবাট ধরার জন্য ট্রামেল জাল ইত্যাদি প্রযুক্তি আনয়ন করে এই সব সম্পদকে দেশের অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে যথাযথ পদ্ধতিতে ব্যাপক অনুসন্ধান ও জরিপ কাজ পরিচালনার পাশাপাশি প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা এবং উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যাবলিতে। এছাড়া উপকূলে উপযুক্ত স্থানে কাঁকড়া, সী-উইড, ওয়েস্টার চাষ ও বিপণনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সাগরে খাঁচায় চাষ পদ্ধতিতে উপযুক্ত মাছের চাষ শুরু করতে হবে।

ট্র্যাশ ফিশের সদ্ব্যবহার ঃ চিংড়ি ট্রলারগুলোতে যে পরিমাণ মাছ ধরা পড়ে তা চিংড়ির তুলনায় লাভজনক না হওয়ায় এর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই ট্র্যাশ ফিশ হিসেবে সাগরে ফেলে দেয়া হয়। এতে করে বছরে ৩৫,০০০-৪৫,০০০ মেট্রিক টন সাদা মাছ সাগর থেকে আহরণ করা সত্বেও অবতরণ করা হচ্ছে না বা দেশের কোন কাজে আসছে না। এই তথাকথিত ট্র্যাশ ফিশকে কাজে লাগানোর বা অবতরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ গভীর সমুদ্রে প্রজনন ক্ষেত্রে চিংড়ি ও মাছের ডিম নিষিক্ত হওয়ার পর তা কম লবণাক্ত অঞ্চলের দিকে আসতে থাকে। এভাবে মোহনায় এলে এদের শৈশব-কৈশোর প্রজাতিভেদে এক-দু'মাস কেটে যায়। দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে আবার সেই কিশোর চিংড়ি ও মাছ গভীর সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয় বিভিন্ন পর্যায়ে। মোহনাঞ্চলে বাগদা চিংড়ির পোনা শিকারীরা খুব মিহি ফাঁসের নাইলনের জাল দিয়ে এদের ধরে ফেলে। শিকারীরা বাগদা পোনা বাদে বাকিগুলো সাধারণত সৈকতে বা নদীর পাড়ে ফেলে দেয়। পোনা ধরার জাল থেকে যেগুলো পরিত্রাণ পায় সেগুলো আবার মোহনা বেহুন্দি জাল ও টানা জালে (বীচ সীন) বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরপর যা বেঁচে যায় তার একটি অংশ সাগরের অগভীর অঞ্চলে সামুদ্রিক বেহুন্দি জাল, ফাঁস জাল, বড়শি, ট্রামেল জাল ইত্যাদিতে আটকা পড়ে। বাকি প্রাপ্তবয়স্ক চিংড়ি ও মাছ সাগরের বিচরণ ক্ষেত্রে ফিরে যায়। ট্রল জালে ধরা পড়ার আগে যে সামান্য পরিমাণে পরিপক্ক অবস্থায় প্রজননে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তা থেকেই আবার নতুন প্রজন্মের আগমন ঘটে। জীবনচক্রের এই চার স্তরের আহরণ প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, অতি শৈশবে পোনা ধরার জালে, কৈশোরে মোহনা বেহুন্দি জালে বর্তমানে এদের 'গ্রোথ ওভারফিশিং' বা প্রবৃদ্ধিজনিত অতি আহরণ হচ্ছে। পক্ষান্তরে ট্রলার বহর কর্তৃক 'রিক্রুট ওভারফিশিং, বা প্রাজন্মিক অতি আহরণ হচ্ছে। যদি মোহনাঞ্চলে পোনা জাল, বেহুন্দি জাল,

বীচ সীন কিংবা বাটা জাল ব্যবহার করা না হতো তাহলে এই কিশোর প্রজন্ম সাগরে ফিরে গিয়ে পূর্ণ বয়সে ট্রলার বহর কর্তৃক অনেকগুণ বেশি ফলন দিতে পারতো ও অনেক বেশি প্রজন্মের যোগান দিতে পারতো। যদি শুধু মোহনা বেহুন্দি জাল বন্ধ করা যেতো তাহলে ট্রলার বহর থেকে বর্তমান ফলনের আড়াইগুণ অথবা ট্রামেল জাল থেকে তিনগুণ ফলন বেশি পাওয়া যেতো।

বিরাজমান সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, বহু প্রজাতির ও বহু পদ্ধতির আহরণ প্রক্রিয়া উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য বেশ জটিল, তবুও অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে সুক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের সদাফলনযোগ্য এই সম্পদের সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য বিরাজমান সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধান নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

- উল্লেখিত উপরিতলের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমীক্ষা, যাচাই এবং যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণ করতে হবে।

- লবস্টার, কাটল ফিশসহ এদশে অপ্রচলিত কিন্তু বিদেশে দামি ও চাহিদা আছে এমন সব সম্পদের জন্যও যথাযথ সমীক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটাতে হবে। ওয়েস্টার, সী-উইড প্রভৃতি চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। সাগরে খাঁচায় চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোরাল ও কাটা জাতীয় মাছ চাষের উদ্যোগ নিতে হবে।

- চিংড়ি ট্রলার কর্তৃক ফেলে দেয়া সাদা মাছের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তা বন্দরে নিয়ে আসার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এ অপচয় রোধ করতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে ভর্তুকির কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। চিংড়ি ধরার ট্রলার বহর কমিয়ে সাদা মাছের ট্রলার বহর বৃদ্ধি করার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। 'নিষিদ্ধ এলাকায় ও নিষিদ্ধ সময়ে, ট্রলিং বন্ধ রেখে মৎস্যসম্পদকে বিশেষ করে পরিপক্ক চিংড়িকে নতুন প্রজন্মের উন্মেষ ঘটানোর সুযোগ দিতে হবে।

- সনাতনী পদ্ধতির জালের মধ্যে চিংড়ি পোনা জাল, মোহনা বেহুন্দি জাল ও টানা জালগুলের ক্ষতিকারক দিক স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু দেশের বিপুল সংখ্যক জেলে পরিবার এগুলোতে সংশ্লিষ্ট এবং এই জালগুলো দিয়ে বার্ষিক প্রায় আশি হাজার মেট্রিক টন মাছ ও চিংড়ি ধরা হয়ে থাকে যা উপকূলীয় গরীব জনগোষ্ঠীর প্রোটিন চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করছে। মোহনা বেহুন্দি জালের জেলে পরিবারের লক্ষাধিক মানুষকে অন্য কোনভাবে পুনর্বাসন না করে বারো-তেরো হাজার জাল গুটিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ সময় চিহ্নিত করে আহরণ হ্রাসের লক্ষ্যে জেলেদেরকে ক্ষতিকারক নয় এমন কোন মাছ ধরার উপকরণের ব্যবহার কিংবা অন্য কোন সুবিধাজনক পেশায় পুনর্বাসনে চেষ্টা নিতে হবে। বর্তমানে বিওবিপি'র কারিগরি সহায়তায় উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের পদ্ধতি উদ্ভাবন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

- সত্তর দশকের শেষের দিকে উপকূলীয় চিংড়ি চাষ প্রসারের সাথে সাথে প্রাকৃতিক উৎস থেকে বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণের প্রবণতা শুরু হয়। বর্তমানে বছরে ২০০ কোটিরও বেশি বাগদা চিংড়ির পোনা আহরিত হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, একটি বাগদা পোনা আহরণের সময় অন্তত ৯৯টি অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি, মাছ ও বিভিন্ন জু-প্লাঙ্কটন মারা যায়। এতে করে যেমন বিপুল সংখ্যক চিংড়ি ও মাছ সাগরে ফিরে গিয়ে বড় হয়ে মৎস্যসম্পদের যোগান সৃষ্টি করতে পারছে না তেমনি পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে যার পরিণতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কিন্তু এ সমস্যা সমাধান এ পর্যায়ে অত্যন্ত জঠিল। যতদিন না প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি গড়ে না উঠবে ততদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা আহরণ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তবে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কাজের মাধ্যমে পোনা আহরণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারা অন্যান্য পোনা সাগরের পানিতে ফেলে দেয়া, পরিবহণজনিত মৃত্যুর হার কমানো সহ পোনা শিকারীদের অন্য পেশায় সরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা যেতে পারে। অধিকাংশ পোনা শিকারী শিশু ও নারী এবং পোনা আহরণ একটি মৌসুমী পেশা, মূল পেশা নয়। পরিপক্ক বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক অন্তরায়গুলো দূরীকরণের মাধ্যমে এই খাতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমাদের পানিসম্পদ ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায়

ম. বদরে আলম খান
যুগ্ম সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

এক সময় সমাজের দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই ছিল মৎস্যজীবি। জেলে, মালো, রাজবংশী প্রভৃতি নামে ছিল এরা পরিচিত। তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অন্যান্য শ্রেণীর নিচে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা ছিল সবার পেছনে। তাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। আজো যে তাদের ভাগ্যের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যাবে না। উন্মুক্ত জলাশয় এবং নদী থেকে মাছ আহরণ এবং বাজারে তা বিক্রি করে এদের জীবিকা নির্বাহ হতো। আর্থিক অবস্থার কারণে শিক্ষার প্রতিও তারা ছিল অনাগ্রহী এবং অনগ্রসর। পেটে-ভাতে বেঁচে থাকাটাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাদের প্রতি অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে কসুর করতো না। তারা বলতে চাইতো, জেলেদের জন্মই মাছ ধরার জন্য।

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও এর নদীনালা, উন্মুক্ত জলাশয় সবকিছু নিয়ে মৎস্য চাষোপযোগী পানিসম্পদের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি যা প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর। এই পানিসম্পদে এক সময় প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর মাছ উৎপন্ন হতো এবং দেশের জনগণের আমিষ চাহিদার ৮০% মিটিয়ে আসছিল। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২% মৎস্য উৎপাদন, আহরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক পূর্ণকালীন এবং অন্যরা খন্ডকালীনভাবে মৎস্যচাষের সংগে জড়িত।

প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত কারণে একদিকে যেমন দেশের জলজসম্পদ এবং মৎস্যসম্পদ ক্রমান্বয়েই কমে আসছে অন্যদিকে জীবিকার তাড়নায় দেশের অন্যান্য দরিদ্র লোকেরাও ধীরে ধীরে মৎস্য আহরণকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করছে। ফলে মৎস্যসম্পদ আহরণের ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পূর্বে যে মাছ পাওয়া যেত, মৎস্যজীবিদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতি আহরণের কারণে তা অতি দ্রুত কমতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যজীবিদের মাথাপিছু মৎস্য আহরণ এবং আয় একইভাবে কমতে থাকে। ফলে মৎস্যজীবিদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। জীবিকার প্রয়োজনে অনেকে জাত পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু এতেও তাদের আর্থিক বা সামাজিক জীবনের কোন রকম হেরফের হচ্ছে না। আজ বাংলাদেশের দরিদ্র শ্রেণী বলে চিহ্নিত যে জনগোষ্ঠী আছে তার মধ্যে মৎস্যজীবিদের অবস্থানই হচ্ছে সম্ভবত সবার নিচে।

এক সময়ে উন্মুক্ত নদী বা জলাশয়ে মাছ ধরার অধিকার প্রায় সবারই ছিল। জমিদার বা ভূস্বামীদের সামান্য বার্ষিক কর বা নজরানা দিয়েই মৎস্যজীবিরা বা অন্যান্য মৎস্য আহরণকারীরা মৎস্য আহরণের অধিকার অর্জন করতো। ধারণা করা হতো মাছ প্রাকৃতিক সম্পদ, এর জন্ম-বৃদ্ধি সবই প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ে থাকে। জলাশয় বা উন্মুক্ত জলমহালগুলোর জৈবিক ব্যবস্থাপনার কোন চিন্তা ভাবনা তাই তাদের মনে আসেনি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা এবং মৎস্যজীবিদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হলো। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর যখন জলাশয়গুলোর ব্যবস্থাপনা সরকারের হাতে আসে তখন অবস্থার উন্নতির চেয়ে আরো দ্রুত অবনতি হতে থাকে। জমিদারের নায়েব বাবুর চাইতে কালেক্টর সাহেবের পেয়াদা অনেক বেশি ক্ষমতাবান হয়ে যায়।

সরকার বা কালেক্টর জলমহালগুলো থেকে শুধু রাজস্ব আদায়ের দিকটাই বিবেচনা করে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির

জন্য কালেক্টরদের উৎসাহেই, মৎস্যজীবিদের পরিবর্তে এক ধরনের মধ্যসত্বভোগী ইজারাদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। তারা জলমহালগুলোর জৈবিক ব্যবস্থাপনার কথা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে জলমহালগুলোর চরম ক্ষতিসাধন করে। যার ফলে দেখা যায় এসব ইজারাদারগণ সরকারের নিকট থেকে জলমহালগুলো বাৎসরিক অথবা দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা গ্রহণ করে পুনরায় তা দ্বিতীয় কোন ইজারাদারের নিকট ইজারা দেয়, যারা আবার তা মৎস্যজীবিদের নিকটই পুনরায় ইজারা দেয়। এর ফলে সরকারের সকল নীতি উপেক্ষা করে এই ইজারাদার শ্রেণী মৎস্যজীবিদের শোষণ করতে থাকে। দেখা গেছে যে, সরকারের কাছ থেকে যে মূল্যে তারা ইজারা গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ে সেই একই জলমহাল মৎস্যজীবিদের নিকট অথবা ২য় ইজারাদারের নিকট দ্বিগুণ মূল্যে পুনরায় ইজারা দেয়। এভাবে একটি জলমহাল ২/৩ হাত বদল হয়ে আবার মৎস্যজীবিদের কাছেই পৌছে। কারণ একমাত্র প্রকৃত মৎস্যজীবিরাই পারে জলমহালটির সঠিক ব্যবহার করতে। কিন্তু এর মধ্যে ইজারাদারদের কারণে জলমহালটির ইজারা মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

মৎস্যজীবিদের কোন দৃঢ় সংগঠন নেই। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি না থাকায় তারা প্রশাসনের উপরমহল পর্যন্ত যেতে পারে না। বাধ্য হয়েই তাদের মধ্যসত্বভোগীদের খপ্পরে পড়তে হয়। জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরকার অনেক আদেশ নির্দেশ জারী করেছেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু বাস্তবে এগুলোর প্রয়োগ হচ্ছে না। কারণ মৎস্যজীবি শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষা বা সামাজিক দিক থেকে পেছনে থাকার জন্য সরকারের দেয়া সুযোগগুলো সবসময় গ্রহণ করতে পারে না। কারণ একজন মৎস্যজীবির অবস্থা এতই খারাপ যে, তার জাল নেই, তার নৌকা নেই, এমনকি দু'দিনের জন্য মাছ ধরতে যদি বাইরে যায় ছেলে মেয়ে কি খাবে তারও সংস্থান নেই। স্বাভাবিকভাবে তাকে তাই পড়তে হয় মহাজনের খপ্পরে।

মৎস্যজীবিদের যে সব সংগঠন আছে যেমন- মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বা মৎস্যজীবি সমিতি সেখানেও ঢুকে পড়েছে ধুরন্ধর মধ্যসত্বভোগীরা। এসব মধ্যসত্বভোগীরা লেখা-পড়া জানে, কালেক্টর সাহেবের অফিস পর্যন্ত পৌছতে পারে, ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছ থেকে মৎস্যজীবি না হয়েও মৎস্যজীবিদের জন্য নির্দিষ্ট ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসতে গেলে প্রথমেই মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা, জীবিকার জন্য কারিগরি শিক্ষা তাদের দিতে হবে। তাদের শেখাতে বা বোঝাতে হবে যে, শুধু মাছ ধরা নয়, মাছ উৎপাদনের সঙ্গেও তাদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তারা যতই সংগঠিত হতে পারবে, জলমহালগুলোর ওপর তাদের অধিকার ততই প্রতিষ্ঠিত হবে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনার বর্তমানে যে পদ্ধতি রয়েছে তাতে শুধু সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। জলমহালগুলোর জৈব ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ মাছের বংশ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি বা জলমহালগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি মোটেও গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ বিষয়ে যে আইনের ব্যবস্থা রয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। যেটুকু বা রয়েছে তারও প্রয়োগ নেই। এখনো অনেকের বিশ্বাস মাছ প্রাকৃতিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই আমরা মাছের বংশ বৃদ্ধি বা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি এতদিন তত গুরুত্ব দেইনি। ফলে মৎস্যসম্পদ দ্রুত কমে আসছে। এখন আমাদের আশু প্রয়োজন দেশের মাছের উৎপাদন যাতে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা। রাজস্বভিত্তিক ইজারা প্রথা বন্ধ করতে হবে। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মাছের অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে হবে। সেগুলোতে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। সেগুলো ইজারা দেয়া যাবে না। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার। ধানের ফলন বৃদ্ধি করতে যেয়ে আমরা মাছকে ধ্বংস করছি। পৃথিবীর অনেক দেশ এর মধ্যেই কীটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। আমাদেরও সেরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

একদিন এদেশের মানুষের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে মাথাপিছু মাছের পরিমাণ ছিল ৩২ গ্রাম। বর্তমানে তা নেমে এসেছে ২০ গ্রামে। অথচ আমাদের মাথাপিছু প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ গ্রাম মাছের প্রয়োজন। এদেশের সাধারণ গরীব মানুষের প্রধান আমিষের উৎসই মাছ। অথচ সেই মাছ এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের মাথাপিছু মাছের প্রাপ্তি অনেক কম। জাপানে যেখানে মাথাপিছু বার্ষিক মাছের প্রাপ্তি ৬৫ কেজি, আমাদের সেখানে মাত্র ৭ কেজি। আমিষ গ্রহণের এই ক্রমবর্ধমান স্বল্পতা আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের ওপর দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। মাছের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছের বংশ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, জলাশয়গুলোর স্বাভাবিক

সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যকলাপগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই সকল কার্যকলাপকে প্রচার করতে হবে, না হলে ভবিষ্যতে মৎস্যসম্পদের যে আরোও অবনতি ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মৎস্য উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পানি সম্পদ। আমাদের এই পানিসম্পদ যথেষ্ট রয়েছে। আমাদের পানিসম্পদের ২০% এখনো মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আমাদের একর প্রতি উৎপাদনও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। মাছের চাষ একটি শ্রমঘন কাজ। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর শ্রমশক্তির। একদিকে যেমন আমাদের রয়েছে প্রচুর পানিসম্পদ, অন্য দিকে রয়েছে জনসম্পদ। মাছ চাষের জন্য উচ্চতর ডিগ্রীর খুব একটা প্রয়োজন নেই। গ্রামের সাধারণ অল্প শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত লোকজনকে অল্প কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ দিয়েই তাদের মৎস্যচাষের সাধারণ কৌশলগুলো শেখানো যায়। তাদের কাছে যদি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগুলো যেমন, পুকুর তৈরী, মাছের রেণু উৎপাদন, পোনা উৎপাদন, পোনা পালন, পোনা ছাড়া প্রভৃতি শেখানো যায় তবে গ্রামের সাধারণ মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করতে পারবে এবং তারা জাতীয় উৎপাদনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজের বোঝা হওয়ায় পরিবর্তে পল্লীর এ জনগোষ্ঠীই তখন মানব সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারবে।

আজকে গ্রামের মানুষ যেভাবে শহরমুখী হচ্ছে তাতে অল্প দিনের মধ্যেই নগর জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই লোকগুলো শহরে আসছে শুধু কর্মসংস্থানের জন্য। গ্রামে যেহেতু কাজ বা জীবিকার কোন সুযোগ নেই তাই সবাই ছুটছে শহরের দিকে। অথচ অতি অল্প মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে মাছ চাষের দ্বারা এদের জন্য গ্রামেই কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। দেশের বর্তমান এনজিওগুলো এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে গেলে পতিত পুকুরে মাছ চাষের চেয়ে উপযুক্ত পথ আর খুব একটা নেই। গ্রামে মূলধন বিনিয়োগের অন্য সুযোগ কম। মাছ চাষের জন্য সামান্য মূলধন বিনিয়োগ করলেই গ্রামে কর্মসংস্থান হবে, মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে এবং তা জাতীয় উৎপাদনে সংযোজিত হবে। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা শহরমুখী হবে না।

বড় কোন প্রকল্পের চাইতে ছোট প্রকল্পগুলোই আমাদের জন্য বেশি উপযোগী। যশোরর বিল-বাঁওড় ও ময়মনসিংহের ২য় মৎস্য চাষ প্রকল্প থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে তিনটি ক্ষেত্রে তা হল মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সেই সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি। জটিল বা অতি উন্নত কোন প্রযুক্তির চাইতে স্থানকালভেদে সহজ ও লাগসই প্রযুক্তিই এদের জন্য উপযুক্ত। জলাশয়ের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, পানির ব্যবস্থাপনা, কখন কি ভাবে কোন্ পোনা ছাড়তে হবে, সাধারণ কোন রোগবালাই দেখা দিলে কি করতে হবে, এইসব সাধারণ বিষয়গুলো যদি গ্রামের লোকজনদের শেখানো যায়, যা পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। তবেই পল্লী অঞ্চলে মাছ চাষ সফল হবে।

পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সবাইকেই এ ধরনের উৎপাদনমুখী কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়। এখানে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক হতে হবে। তাদেরকে এসব কার্যক্রম সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তারা শুধু প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি জ্ঞান দ্বারা তাদের সাহায্য করবে। লাভক্ষতি নির্ভর করবে তাদের প্রচেষ্টা বা দক্ষতার ওপর এবং এই লাভক্ষতি মাছ চাষীর নিজের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

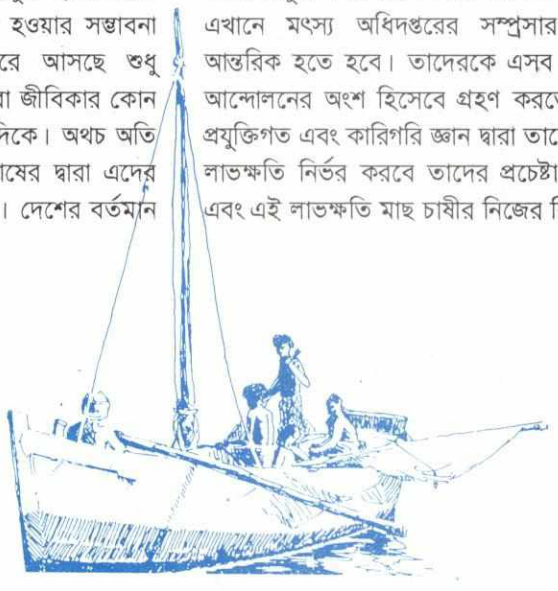

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে সোনালী ব্যাংকের ভূমিকা

এম. এ. ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক, ঢাকা

বাংলাদেশে অসংখ্যা নদনদী, খালবিল, হাওর-বাঁওড়সহ ১.৩ মিলিয়নের বেশী পুকুর রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে ১৬.৬০ মিলিয়ন হেক্টরের বেশী প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণযোগ্য সামুদ্রিক জলসীমা। এই সব জলাশয় থেকে আহরিত মৎস্যই দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য মৎস্য-আমিষের প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে অতীতে মৎস্যসম্পদের প্রাচুর্য ছিল বিধায় মৎস্যজীবী/সাধারণ জনগোষ্ঠী আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের তাগিদ অনুভব করেনি। কিন্তু ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাছের চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তীব্রতা সঞ্চারের কারণে মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন ও মাছের প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এভাবে মাছ এককালের মৎস্য-প্রাচুর্যময় এ দেশের মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

দেশের মানুষের ন্যূনতম মৎস্য চাহিদা মেটাতে (জনপ্রতি প্রতিদিন ৩৮.০ গ্রাম) প্রতি বছর আমাদের প্রয়োজন ১.৯ মিলিয়ন টন মাছ। অথচ বর্তমানে প্রতি বছরে উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ০.৭১ মিলিয়ন টন। দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পর্যাপ্ত আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে তবে এর পরিকল্পিত প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন যথাযথ বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা দরকার। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাবরই এ খাতের উন্নয়ন অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। এ প্রেক্ষিতে সরকারের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সরকারি খাস জলাশয়ের দীর্ঘ মেয়াদী (৭ বছর) ইজারা প্রথা প্রবর্তন।

২. সেচ প্রকল্প এলাকায় উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষের পরিকল্পনা ত্বরান্বিতকরণ।

৩. 'কারেন্ট' জালের স্থানীয় উৎপাদন ও আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আইন কার্যকর করার ব্যবস্থাগ্রহণ।

৪. নির্বিচারে মাছের পোনা নিধন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সক্রিয়করণ।

৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের আওতাধীন ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত জলাশয়সমূহ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে মাছ চাষের আওতায় আনয়ন।

৬. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জলাশয়সমূহ নিকটবর্তী অধিবাসী, সমবায় সমিতি/সংগঠন এবং মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে ইজারা দান।

৭. মৎস্য খামার, হ্যাচারি/নার্সারি স্থাপনের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮. মৎস্যকে শিল্পখাত রূপে ঘোষণা করে শিল্পখাতের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি এই খাতের জন্যও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সোনালী ব্যাংকের ভূমিকা

দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক তার প্রথাগত বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম ছাড়াও ১৯৭৩-৭৪ সন থেকে মৎস্যখাত সহ কৃষি উৎপাদনে ঋণদান কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত রয়েছে। সোনালী ব্যাংকের ১৩১৩ টি শাখার মধ্যে প্রায় ১০৫০ টি শাখা সরাসরি কৃষি ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি মৎস্যচাষ ঋণ কার্যক্রমও পরিচালনা করে আসছে।

সোনালী ব্যাংক কর্তৃক এ ক্ষেত্রে পরিচালিত প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচি।

(খ) পুকুরে মৎস্যচাষ কর্মসূচি।

(গ) ফার্মিং ও অফ-ফার্মিং ঋণ কর্মসূচি।

(ঘ) কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচি।

(ক) বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচি

প্রোটিন ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক ১৯৯৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাস হতে "বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচি" নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকের ১৮৫ টি নির্বাচিত শাখা সমগ্র বাংলাদেশে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালনের পাশাপাশি মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ঋণ সুবিধা কোন নির্দিষ্ট এলাকার স্থায়ী অধিবাসীকে একক অথবা দলগতভাবে দেয়া হয়। ঋনের টাকা প্রকল্পের প্রয়োজনে ধাপে ধাপে বিতরণ করা হয়। পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য কোন সহায়ক জামানতের প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিননামা/গ্রুপ গ্যারান্টি জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়। পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঋণ সীমা আবরিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পুকুর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি জামানত/সহায়ক জামানত হিসেবে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্টার্ড মর্টগেজ করতে হয়। তবে উদ্যোক্তার ইকুইটি (২০%) বাদে ঋণ সীমার অর্ধেক মূল্যের জামানত হিসেবে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে হয়। আলোচ্য কর্মসূচির ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এটি একটি নিবিড় তদারকিমূলক ঋণ কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে গঠিত কমিটি এই ঋণের সার্বিক তত্বাবধানে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত। ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর এবং কিস্তি ভিত্তিতে এই ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়।

(খ) পুকুরে মৎস্যচাষ কর্মসূচি

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৮ সনে পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচি শুরু করে। এই দেশের হাজামজা পুকুর পুনঃখনন করে মাছ চাষের কর্মসূচিটি প্রবর্তন করা হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় পুকুর মালিকগণ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান। যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে সকলের সম্মতিক্রমে একজনকে ক্ষমতা অর্পণ করা হলে যৌথভাবে ঋণ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। এই কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ঋণসীমা প্রতি বিঘা জলাশয়ের জন্য ১৭,২০০/-টাকা। ঋণ বিতরণের দেড় বছর পর হতে ৪টি সমান কিস্তিতে মোট সাড়ে চার বছরে এ ঋণ পরিশোধযোগ্য। ঋণের চাহিদা, মাছের পোনার মূল্য বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক খরচের কথা বিবেচনা করে পুকুরে মাছ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক ১৯৯৪-৯৫ সনে নিম্নবর্ণিত সম্প্রসারিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ঃ

- সারাদেশে ব্যাংকের ২০০টি নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।
- ঋণসীমা বিঘা প্রতি ২৫,০০০/-পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি প্রদান।
- ঋণের মেয়াদ ৩ বছর যা বাৎসরিক তিনটি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
- সমগ্র প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ ইকুইটি হিসেবে প্রদান করতে হয়।
- পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণসীমার জন্য কোন সহায়ক জামানতের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিননামা/গ্রুপ গ্যারান্টি জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়।
- পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঋণ সীমা আবরিত করে স্থাবর সম্পত্তি সহায়ক জামানত হিসেবে ব্যাংকে বন্ধক দিতে হয়।
- ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

(গ) ফার্মিং ও অফ-ফার্মিং ঋণ কর্মসূচি

- এই কর্মসূচিটি ১৯৯৪-৯৫ সনে শুরু করা হয়েছে।
- প্রতি বিঘা জলায়তনের জন্য ১৯,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ ঋণসীমা ১৫.০০ লক্ষ টাকা।
- ঋণের মেয়াদ ৩ বছর। সর্বোচ্চ ৬ মাস রেয়াতি মেয়াদ সহ দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধযোগ্য।
- সমগ্র প্রকল্প ঋণের শতকরা ৩০ ভাগ ইকুইটি।
- উৎপাদিত পণ্য ও প্রকল্পভূমি, দালান, পুরকর্মসহ/ অন্যান্য অবকাঠামো ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে বন্ধক থাকবে।

সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ঃ এই কর্মসূচিটি ১৯৮০-৮১ সনে প্রবর্তন করা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণ উক্ত ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু করে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করেছে।

(ঘ) কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচি

- ১৯৯১ সনের শিল্প নীতিমালা (সংশোধিত ডিসেম্বর '৯২) অনুযায়ী প্রযুক্তি ভিত্তিক মৎস্য/ চিংড়ি, পশুসম্পদ, বীজ উৎপাদন এবং খামার ভিত্তিক বহুমুখী কার্যক্রমকে কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসেবে গণ্য করার প্রেক্ষিতে উক্ত খাতসমূহে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সনে কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়।
- প্রকল্পের আয়তনের ভিত্তিতে ঋণসীমা নির্ধারণ করা হয় (কারিগরি এবং আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী)।
- প্রকল্প ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং চলতি মূলধন ঋণের মেয়াদ ১ বছর। তবে সন্তোষজনক ঋণ পরিচালনার ভিত্তিতে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ পর্যন্ত চলতি মূলধন ঋণ নবায়নযোগ্য।
- প্রকল্প এবং চলতি মূলধন ঋণ উভয় ক্ষেত্রেই ইকুটির পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ।
- প্রকল্প ঋণের জামানত হিসেবে প্রকল্পভূমি, দালান ও পুরকর্মসহ অন্যান্য অবকাঠামো মর্টগেজ হয়।
- চলতি মূলধন ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক জামানত হিসেবে স্থাবর সম্পত্তি মর্টগেজ নেয়া হয়।
- ১৫ বছর মেয়াদী ইজারাপ্রাপ্ত প্রকল্পভূমির ওপরও ঋণ প্রদান করা হয়।
- প্রকল্প ঋণ প্রদানের জন্য সকল প্রকার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় আনা হয়।

কৃষিজ শিল্প ঋণের আওতায় মৎস্য উপখাতে আধানিবিড় চিংড়ি চাষ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কক্সবাজার অঞ্চলে ব্যাংক অর্থায়নে ৬টি চিংড়ি প্রকল্প (বাগদা চিংড়ি) এবং একটি চিংড়ি হ্যাচারি (বাগদা এবং গলদা) স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের অন্যান্য স্থানে কয়েকটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। কক্সবাজার এলাকায় কোন কোন আধানিবিড় চিংড়ি প্রকল্পে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ছিল প্রতি একরে প্রায় ২২০০ কেজি।

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণের খতিয়ান নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(কোটি টাকায়।)

কর্মসূচি	মঞ্জুরি		বিতরণ	আদায়	বকেয়া
	সংখ্যা	পরিমান			
বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচি	১৭৮৮	৯.৩৪	৯.০৪	৩.৪৬	৬.৬০
পুকুরে মৎস্যচাষ কর্মসূচি	৪৯৩৪	৯.৩০	৮.৪৫	৯.১৯	১০.১০
ফার্মিং ও অফ-ফার্মিং ঋণ কর্মসূচি			-		
(ক) চিংড়ি চাষ (সনাতন)	৪৬৬	২২.৫২	২২.৩৬	১৭.৭৩	১৫.২৯
(খ) মৎস্য	৩৪	০.৪৮	০.৪৮	০.০৭	০.৪১
(গ) হ্যাচারি	০৫	০.১৯	০.১৯	০.০১	০.১৪
কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচি	২০	১৩.৪৮	১০.৭৩	৩.৪২	১০.৪৯
সর্বমোট ঃ	৭২৪৭	৫৫.৩১	৫১.২৫	৩৩.৮৮	৪৩.০৩

মৎস্য মেলায় সোনালী ব্যাংকের অংশগ্রহণ

সোনালী ব্যাংক উপরিউক্ত মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন ছাড়াও সরকার কর্তৃক আয়োজিত মৎস্য মেলায় প্রতি বছর অংশগ্রহণ করে থাকে। এই মেলায় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত মৎস্য উন্নয়ন সংক্রান্ত নানাবিধ ক্রেডিট কর্মসূচি প্রদর্শন সহ মেলায় আগত দর্শকদেরকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, চার্ট দেখানোসহ পুস্তিকা সরবরাহের মাধ্যমে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া এই মেলায় সোনালী ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের প্রক্রিয়াজাত মাছও বিক্রি করা হয়ে থাকে। সোনালী ব্যাংক মৎস্যচাষ পদ্ধতির ওপর কিছু পুস্তিকা প্রকাশ করেছে যা মৎস্য মেলায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

মৎস্যচাষ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যাবলী

- সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাছ ও চিংড়ির গুণগতমানসম্পন্ন পোনা সহজলভ্য নয়।
- স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম ইজারাভূক্ত জলাভূমির উন্নয়ন ও উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
- পুকুরসমূহের মালিকের অনুপস্থিতি এবং বহু মালিকানা সমস্যা।
- মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে লাগসই প্রযুক্তির অভাব।
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষবিদ্ এবং মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তির স্বল্পতা।
- মৎস্য খাদ্য তৈরির জন্য কাঁচামালের অভাব।
- মাছের রোগবালাই সমস্যা।
- অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ।
- নিরাপত্তার অভাব।
- বীমা সমস্যা।
- বিপণন ও পরিবহণ সমস্যা।

সুপারিশসমূহ

- গুণগত মানের মৎস্য/চিংড়ি পোনার সহজলভ্যতার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে হ্যাচারি স্থাপন করা।
- ইজারাপ্রাপ্ত প্রকল্পভূমি যাতে সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধক দেয়া যায় তার ব্যবস্থা করা।
- পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ আরো জোরদার করতে হবে যাতে অনুপস্থিত মালিকানাধীন ও বহুমালিকানাধীন পুকুরের সমস্যার সমাধান হয়।
- মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান খামার প্রযুক্তি ব্যবহার, মাছ ও চিংড়ি খামারের উন্নয়ন করে উচ্চ ফলনশীল রপ্তানিযোগ্য মাছ/চিংড়ি উৎপাদন করা।
- উন্নতমানের মাছ/চিংড়ির খাদ্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে আরো এ ধরনের খাদ্য শিল্প স্থাপনের সাথে সাথে কাঁচামালেরও নিশ্চয়তা বিধান করা।
- নিরাপত্তা, বীমা, বিপণন ও পরিবহণ সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

উপসংহার

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আমিষের ঘাটতি পূরণ ও অপুষ্টি নিবারন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সোনালী ব্যাংক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও যথাযথ তদারকি উন্নয়নের জন্য ব্যাংক একটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকসহ এ কর্মসূচির সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও মাৎস্য জ্ঞানে বেশ কিছু স্নাতক নিয়োগ করা হয়েছে এবং কর্মসূচি/স্কীমসমূহে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ৫ (পাঁচ) জন বিশেষজ্ঞ ও বেশ কিছু সংখ্যক ফিনানসিয়াল অ্যানালিস্ট এবং প্রকৌশলীও নিয়োগ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে রুই জাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির প্রবর্তন

ডঃ এম. ইউসুফ আলী
প্রাক্তন সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

এটি সর্বজন বিদিত যে, রুই জাতীয় মাছ যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল, কাল বাউস ইত্যাদি বদ্ধ জলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। তাই অতীতে রুই জাতীয় মাছ চাষে আগ্রহী মাছ চাষীদেরকে মাছের পোনা বা বীজ এর জন্য নির্ভর করতে হত নদীতে আহরিত মাছের রেণু পোনার ওপর। রুই জাতীয় মাছ স্রোতস্বিনী নদী ও খালে বর্ষামৌসুমের শুরুতে প্রজনন সম্পন্ন করে। ১৯৪৭ সালের বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশে রুই জাতীয় মাছের রেণুর প্রধান উৎস ছিল পদ্মা বা গঙ্গা নদীর উভয় পাড়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলা ঘাট, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, রাজশাহী শহর, সারদাহ, চরঘাট, পাবনা জেলার পাকশী, তৎকালীন নদীয়া জেলার ভেড়ামারার পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদী, কুষ্টিয়া শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত গড়াই নদী এবং সিরাজগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদী। এ সব নদী হতে ৪-৫ দিন বয়সের মাছের রেণু পোনা সংগ্রহ করা হত। চট্টগ্রামের হালদা নদীও রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম বা Fertilized egg এর সংগ্রহস্থল। পূর্বে ডিম আহরণকারীগণ সংগৃহীত নিষিক্ত ডিম নদীর পাড়ে মাটির হাপাতে ফুটিয়ে রেণু পোনা উৎপাদন করতো। উল্লিখিত পদ্মা ও যমুনা নদীতে আহরিত রেণু পোনার প্রধান বাজার ছিল কোলকাতা শহর। সাধারণতঃ রেল যোগে এ সকল রেণু পোনা মাটির হাঁড়িতে করে কোলকাতা নিয়ে যাওয়া হত। এই রেণু পোনার কিছু অংশ স্থানীয় পোনা উৎপাদনকারী চাষীরা কিনে নার্সারী বা আঁতুড় পুকুরে চাষ করে দু/তিন ইঞ্চি বা চারা পোনা করে তা পুকুরের মালিকদের কাছে ফেরী করে বিক্রী করতো।

প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ ও চারা পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বড় অসুবিধা ছিল যে, রেণু পোনা কোন প্রজাতির তা নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা যেত না এবং এদের মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত বেশী। ফলে প্রচুর পরিমাণে পছন্দসই প্রজাতির পোনার প্রাপ্যতা মাছচাষে প্রধান অন্তরায় ছিল। এই প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা অবহিত ছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য দেশ যেমন ব্রাজিল, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস দেশেও এই প্রতিবন্দ্বকতা দূরীকরণে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট ও উদ্যোগী ছিলেন।

পিটুইটরী হরমোন ইনজেকশনের সাহায্যে মাছের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ব্রাজিলে ১৯৩৪ সালে প্রথম বারের মত সাফল্য অর্জন করে। যদিও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৩১ সালে। সোভিয়েত রাশিয়াতে পিটুইটরী হরমোন ইনজেকশনের সাহায্যে ১৯৩২ সালে মাছের প্রজনন কার্যক্রম শুরু করেন দুজন বিজ্ঞানী কিন্তু সফলতা আসে ১৯৩৬ সালে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে ১৯৩৭ সলে হামিদ খান পিটুইটরী হরমোন ইনজেকশনের সাহায্যে মৃগেল মাছের প্রজনন ঘটানোর প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে হামিদ খান স্তন্যপায়ী প্রাণির পিটুইটরী গ্রন্থির সম্মুখ ভাগ (anterior lobe) থেকে হরমোন নির্যাস নিয়ে তা মৃগেল মাছে প্রয়োগ করেন কিন্তু এই পরীক্ষা থেকে উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া যায়নি। বিভাগোত্তর ভারতবর্ষে পিটুইটরী হরমোন ইনজেকশন দ্বারা রুই জাতীয় মাছের প্রজননে সাফল্য অর্জন করেন হীরালাল চৌধুরী এবং আলী কুনী ১৯৫৭ সালে।

বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যদিও রুই জাতীয় পোনা প্রাপ্তি ও সরবরাহের সমস্যা ভারতবর্ষের মতই ছিল, তবুও প্রথম বারের মত এ দেশে এর গবেষণা শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে অবস্থিত স্বাদুপানির মৎস্য গবেষণাগারে সর্বপ্রথম মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী গবেষণা কাজ শুরু করেন । বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও গবেষণার জন্য সুযোগ-সুবিধার অসুবিধা সত্বেও ডঃ ইউসুফ আলী ১৯৬৫

সালের মে মাসে পরীক্ষা কার্য্যক্রম শুরু করেন। ডঃ আলী ২৩ জোড়া মৃগেল এবং ৩ জোড়া রুই মাছে বিভিন্ন রুই জাতীয় মাছের হরমোন নির্যাসের ইনজেকশন প্রয়োগ করেন এবং ১৯৬৫ সালের ২৭ শে জুন তারিখে সফলতা লাভ করেন। ঐ দিন ইনজেকশন প্রাপ্ত মৃগেল মাছ বদ্ধ পুকুরে রক্ষিত কাপড়ের হাপাতে প্রথম বারের মত ৪,৫৫৪ শুক্রকীট নিষিক্ত ডিম ছাড়ে। রুই মাছের ক্ষেত্রে ডঃ মোঃ ইউসুফ আলী সফল ফলাফল অর্জন করেন ২৯ শে জুন, ১৯৬৫ সালে। এই দিন ইনজেকশনকৃত একটি স্ত্রী রুই মাছ এবং একটি পুরুষ রুই মাছ থেকে ২৮০,০০০ টি নিষিক্ত ডিম পাওয়া যায়। মৃগেল ও রুই মাছের এই নিষিক্ত ডিম ফুটিয়ে তা থেকে আঁতুড় পুকুরে মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়। রুই জাতীয় মাছ ছাড়াও অন্যান্য মাছ যেমন তিত্‌পুটি, টাটকিনি এবং দাঁড়কেনি মাছ থেকেও এই প্রক্রিয়ায় সাফল্যজনক ভাবে নিষিক্ত ডিম পাওয়া যায়।

এই গবেষণার সাফল্যজনক ফলাফলের ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা বিভাগ দেশের বিভিন্ন মৎস্য বীজ খামারে এই কার্য্যক্রম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রসারের জন্য তৎকালীন সরকারের তৃতীয় পাঁচ সালা পরিকল্পনায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। উক্ত বরাদ্দের ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ৬০টি মৎস্য বীজ খামারে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এই কার্যক্রম প্রসারিত হয়।

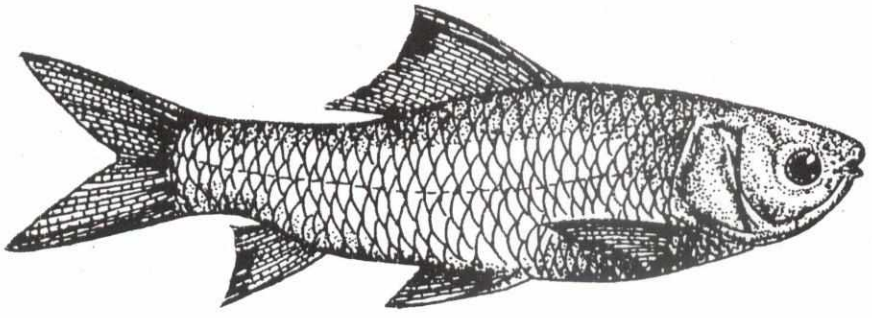

হ্যাচারি-উৎপাদিত পোনার মান নিয়ন্ত্রণ

ডঃ এম. জি. হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
শ্যামল মাহাতা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ

দেশে মৎস্যচাষের প্রসার লাভের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম। ষাটের দশকে এদেশে মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি প্রয়োগের পর থেকে বর্তমানে নব্বই শতাংশের অধিক মাছের পোনা হ্যাচারি উৎস জাত। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের চার শত হ্যাচারি থেকে প্রায় অর্ধ শত মেট্রিক টন রেণু পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র পাঁচ টন রেণু পোনা। প্রধানত তিনটি কারণে দেশে হ্যাচারির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রথমত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে পোনা প্রাপ্তির প্রাকৃতিক উৎসের অবক্ষয়, দ্বিতীয়ত বিগত এক দশকে মাছ চাষের ব্যাপক প্রসার এবং তৃতীয়ত উচ্চ মুনাফা।

তাই হ্যাচারির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। পরিকল্পিত মৎস্যচাষের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যতম উপাদান পোনার সহজলভ্যতা বৃদ্ধিতে হ্যাচারিগুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছে। উচ্চ মুনাফা এবং সহজ প্রযুক্তির ফলস্বরূপ হ্যাচারি ও হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখা দিয়েছে গুণগত মানের ক্রমাবনিত। দেশের বিপুল সংখ্যক হ্যাচারি অপারেটরগণ অভিজ্ঞতা বশত এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে জেনে বুঝে এই অবনতি ঘটাচ্ছেন। আর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে সার্বিক মৎস্যচাষের ওপর। মৎস্যচাষীরা কাঙ্খিত ফলন লাভে ব্যর্থ হতে হতে মৎস্যচাষে ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে বসেছেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিপুল সম্ভবনাময় মৎস্য খাত পশ্চাৎপদতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

আমরা জানি কৃষিজাত পণ্যের ফলন দুটি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথমত বংশগত ক্ষমতা (genetic potential) এবং দ্বিতীয়ত পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা (environment and management)। প্রথমোক্ত বিষয়টি দ্বারা "গুণগত মান" কথাটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল জাতের বৈশিষ্ট্যাবলীর মিলিত রূপ "গুণগত মান" হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। কাজের "গুণগত মান" বিষয়টি বিমূর্ত এবং আপেক্ষিক। এটি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ। আর এই লক্ষ্যকে সামনে এনে আজ আমাদের প্রয়োজন আদর্শ সুষম মান স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা অপেক্ষা নদীর পোনা শ্রেয়তর এই ধারণা থেকেই আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের প্রমাণ মেলে। হ্যাচারির পোনার ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গুণগত মানের ওপর সৃষ্ট হতাশার কারণগুলো খতিয়ে দেখা অত্যাবশ্যক। হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস, অঙ্গসংস্থানগত বিকৃতি (বিকলাঙ্গ পোনা), রোগবালাই এবং ব্যাপক মৃত্যু হার সম্পর্কে অভিযোগ নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে ধারণা মেলে যে, সম্ভবত ব্রুড মাছ বাছাইয়ে ঋণাত্মক নির্বাচন-প্রবণতা, অপরিকল্পিত সংকরায়ন, অন্তঃপ্রজনন (inbreeding) এবং অপ্রতুল ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যার মিলিত ফলস্বরূপ এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এই বিষয়াবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্য মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের উদ্যোগে বিগত ১৯৯৪ সালে, ৩০-৩১ মার্চ "প্রজননক্ষম মাছের ব্যবস্থাপনা ও হ্যাচারিতে মাছের কৌলিতালিত্বক উন্নয়ন" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে যোগ দেন দেশের সকল অঞ্চলের সরকারি ও বেসরকারী নেতৃস্থানীয় হ্যাচারি অপারেটর/মালিকগণ। পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগেও ১৯-২২ মার্চ, ১৯৯৫ রাজশাহী, যশোর এবং ফরিদপুরে হ্যাচারিতে অন্তঃপ্রজনন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার উদ্দেশ্যে কতিপয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। হ্যাচারিতে বড় মাছ নির্বাচন ও

ব্যবস্থাপনা, খাবার ও পানি সরবরাহ, ইনকিউবেশন বা হ্যাচিং জারে ডিমের উচ্চ ঘনত্ব, রেণু পোনা রক্ষণাবেক্ষণের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগবালাই এবং অন্তঃপ্রজননজনিত বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় এবং এই সকল সমস্যার আশু সমাধানকল্পে কতিপয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

এই নিবন্ধে আমরা মূলত হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার "গুণগত মান" বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো, অতঃপর তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ববর্তী কর্মশালার সুপারিশমালা এবং আমাদের গবেষণালবব্ধঅভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করবো।

হ্যাচারিতে নিম্নমানের পোনা উৎপাদনের কতিপয় কারণ এখানে আলোচনা করা হলো।

(ক) অপরিণত ও খর্বাকৃতি মাছ প্রজনন ঃ মাছের বয়স ও ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের ডিম প্রদানের আপেক্ষিত ক্ষমতা (GSI) হ্রাস পায়। এজন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক হ্যাচারি অপারেটরগণ বৃহদাকার মাছ ব্যবহারে মোটেই উৎসাহ বোধ করেন না। সেই সাথে বৃহদাকার মাছ প্রজননে রয়েছে প্রজনন অসফলতাসহ নানাবিধ জটিলতা। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের মাছ প্রজনন সহজতর। ব্রুড মাছ লালন-পালনে খাদ্যসহ অপরাপর উপকরণ বাবদ বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। এই ব্যয় হ্রাস করা হয় আর তা করা হয় মুনাফা বৃদ্ধির জন্য। ছোট আকৃতির অসংখ্য মাছ দ্বারা ব্রুড ষ্টক গঠনের মাধ্যমে। এই ধরনের মাছ থেকে উৎপাদিত পোনা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে অধিক হারে মৃত্যুবরণ করে এবং কাঙ্খিত ফলন দিতে ব্যর্থ হয়।

(খ) অপরিকল্পিত সংকরায়ন ঃ সংকরায়নের মাধ্যমে উচ্চতর ফলনশীল জাত উদ্ভাবন একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশুর জাত উন্নয়নের ফসল আমরা ভোগ করছি। কিন্তু এই সংকরায়ন যদি পদ্ধতিগত ভাবে অনুসৃত না হয়ে বাছবিচারহীন ভাবে ঘটানো হয় তাহলে ফলাফল দাঁড়ায় উল্টো। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই হ্যাচারি অপারেটরগণ শুদ্ধ প্রজননের জটিলতা এড়িয়ে মুনাফার কথা ভেবে যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ন করে পোনা তৈরি করছেন। এগুলো প্রকৃতিতে এসে আমাদের প্রাকৃতিক জেনেটিক সম্পদের (genetic resources) শুদ্ধতা ও সম্ভাবনার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। সরকার গৃহীত ৩য় মৎস্যচাষ প্রকল্পাধীন উন্মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ পোনা ছাড়া হচ্ছে সেখানে অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রবণতায় এই ধরনের বিপর্যয় ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে এসব জলাশয়ে কার্পজাতীয় মাছের অশুদ্ধ সংকর পোনা ছাড়ার কুফল হিসেবে আমাদের দেশীয় বিশুদ্ধ জাতের মাছের ষ্টকের কৌলিতাত্ত্বিক অশুদ্ধতা (genetic purity) সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে।

(গ) অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding) ঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বংশজাত ব্রুড মাছের মধ্যে এবং একই স্ত্রী মাছ থেকে উৎপাদিত ভাইবোনের (sib) মধ্যে প্রজনন ঘটানোর মাধ্যমে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় বংশধারায় বৈচিত্র্যহীনতা (homozygosity) বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ উৎপাদনশীলতা হ্রাস, প্রজনন বিফলতা, বিকলাঙ্গতা, রোগ প্রবণতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা দেছে একটি প্রজন্মের অন্তঃপ্রজননের ফলে বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রায় ২৫ শতাংশ বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। হ্যাচারি মালিকগণ নিজস্ব হ্যাচারিতে উৎপাদিত মাছ ব্রুড হিসেবে যোগ (recruit) করে থাকে বাতিলকৃত (discarded) মাছের শূন্যতা পূরণের জন্য। এইভাবে দিন দিন মাছের বংশগত ফলনশীলতা (genetic Potential) হ্রাস পাচ্ছে আশংকাজনক হারে।

(ঘ) ব্রুড মাছের ঋণাত্মক নির্বাচন ঃ খর্বাকৃতির অপরিণত মাছ ব্যবহার করে রেণুপোনা উৎপাদনকালে হ্যাচারিগুলোতে অসংখ্য ব্রুড মাছ মারা যায়। আর এই শূন্যতা পূরণ হয়ে পড়ে জরুরি। হ্যাচারি সংলগ্ন নার্সারি কিংবা নিকটস্থ চাষীর নার্সারি পুকুর থেকে দ্রুত বর্ধনশীল অঙ্গুলি পোনা বিক্রয় শেষে অবশিষ্ট খর্বাকৃতির পোনা পুকুরে লালন-পালন করে ব্রুডে পরিণত করা হয়। অঙ্গুলি পোনা বিক্রয়কালে দ্রুত বেড়ে ওঠা পোনাগুলো বিক্রয় হয়ে যায়, থেকে যায় তুলনামূলকভাবে কম বর্ধনশীল পোনা (seeds with poor genetic potential)। পরবর্তীতে এগুলো থেকেই ব্রুড হিসেবে ব্যবহারের জন্য মাছ সংরক্ষণ করা হয়।

সমস্যা নিরসনের উপায় ও পোনার মান নিয়ন্ত্রণের কৌশল

(ক) সুনির্বাচিত ব্রুড ষ্টক গঠন ঃ হ্যাচারি স্থাপনকালে মালিকগণ সর্বপ্রথম যে ভুলটি করেন তাহলো সীমিত কয়েকটি উৎস থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা। এতে করে ব্রুড ষ্টক কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য (genetic variety) বাহুল্য

বর্জিত হয়। এই ধরনের ষ্টক থেকে উৎপাদিত পোনার উৎপাদনশীলতা স্বাভাবিক ভাবেই কম হয়। কাজেই হ্যাচারি স্থাপনকালে ও ব্রুড ষ্টক গঠন কালে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। এজন্য ধৈর্যের সাথে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে সংগ্রহ করা মাছ নিয়ে ব্রুড ষ্টক গড়ে তোলা প্রয়োজন। কোন উৎস থেকে মাছ সংগ্রহের পূর্বে সেই মাছের পূর্বপুরুষের ইতিহাস (pedigree) জেনে নিতে হবে। এইভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্কযুক্ত মাছ সংগ্রহ সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে উত্তম বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস যেমন হালদা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর প্রজনন ক্ষেত্র (spawning ground) থেকে প্রাপ্ত পোনা লালন-পালন করে সুস্থ, সবল, বড় আকারের দ্রুত বর্ধনশীল মাছ বাছাই করে ব্রুড হিসেবে চয়ন। এই ষ্টকগুলোর মধ্যে অন্তঃপ্রজনন (Interstock Breeding) ঘটিয়ে উৎপাদিত পোনার মধ্যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতার (genetic potential) সমাবেশ ঘটানো সম্ভব। এই ধরনের উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ কোন হ্যাচারির পক্ষে সম্ভব না হলে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক উৎসের মাছ ক্রয় করতে হবে। ক্রয়কালে কোন একটি উৎসের স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার মাছ না নিয়ে কেবল স্ত্রী কিংবা পুরুষ ক্রয় করতে হবে।

(খ) হ্যাচারিসমূহের মধ্যে ব্রুড মাছ বিনিময় ঃ স্বল্পতম ব্যয়ে উৎকৃষ্ট মানের পোনা উৎপাদনের আর একটি সহজ উপায় হ্যাচারি সমূহের মধ্যে ব্রুড মাছ বিনিময় কার্যক্রম। এক হ্যাচারির স্ত্রী মাছের সাথে ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত অপর হ্যাচারির মাছের প্রজনন করিয়ে উভয় হ্যাচারিই লাভবান হতে পারেন। জীবিত মাছ পরিবহণ অনেক সময় সহজসাধ্য হয় না। সেক্ষেত্রে পুরুষ মাছ থেকে বীর্য সংগ্রহ করে বিনিময় করা যেতে পারে। সংগৃহীত বীর্য উপযুক্ত পরিবেশে দীর্ঘদিন কার্যক্ষম থাকে। এজন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপকরণ (liquid nitrogen) হ্যাচারি মালিকগণের নিকট সহজলভ্য করা সম্ভব হলে পোনার গুণগত মান উন্নয়নে যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে।

(গ) সুষম খাদ্য ঃ ব্রুড মাছ লালন-পালনে সুষম খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত পরিমাণে আমিষ, শর্করা, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, মিনারেল প্রভৃতির সমন্বয়ে তৈরি সুষম খাদ্য ব্রুড মাছের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। হ্যাচারি মালিকগণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আশানুরূপ মূল্যে পোনা বিক্রয় করতে না পেরে উন্নত মানের খাদ্য ব্যবহার করতে পারেন না। তাই খাদ্য উপাদান প্রাপ্তি ও দুর্মূল্যজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। মনে রাখতে হবে মাছের জাত যত উন্নতই হোক উপযুক্ত পরিমাণ সুষম খাদ্যের অভাবে আশানুরূপ মানের পোনা উৎপাদন সম্ভব নয়।

(ঘ) সহজ নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ ঃ নির্বাচন (selection) হলো কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটানোর জন্য বাছাই করা মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটানো। এভাবে সচেতন ভাবে নির্বাচিত মাছের মধ্যে ক্রমাগত প্রজনন ঘটিয়ে উন্নজাতের ব্রুড ষ্টক গঠন করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় কোন উচ্চতর জ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রয়োজন পড়ে না। দরকার শুধু একটু সচেতনতা ও ধৈর্য। প্রতিটি হ্যাচারিতে সম্ভব না হলেও যদি এলাকাভিত্তিক কিছু আদর্শ এবং উদ্যোগী হ্যাচারি মালিকগণের সহযোগিতায় আঞ্চলিকভাবে "কেন্দ্রীয় ব্রুড ব্যাংক" বা ব্রুড ষ্টক গঠন করা যায়, তবে সেখান থেকে বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ধরনের ব্রুড ব্যাংক গঠনের জন্য প্রথমে প্রয়োজন দুইটি ভিন্ন নদী উৎস থেকে সংগৃহীত মাছ। এই ষ্টকের মাছের কম পক্ষে ২৫ জোড়া মাছের প্রজনন ঘটিয়ে উৎপাদিত পোনা থেকে সবচাইতে বর্ধনশীল ১০০ জোড়া মাছের মধ্যে পুনরায় প্রজনন ঘটাতে হবে। এই পোনা ব্রুডে পরিণত হলে তা থেকে অবাছাইকৃত দৈব চয়নের মাধ্যমে প্রজনন ঘটালে যে মাছ উৎপন্ন হবে সেগুলো থেকে ব্রুড ব্যাংক গঠন করতে হবে।

(ঙ) প্রশিক্ষণ ঃ হ্যাচারি অপারেটরদের মধ্যে উন্নত ব্রুড মাছ সংরক্ষণ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে উন্নত জাতের পোনা উৎপাদনে তাদের পক্ষে ভূমিকা রাখা সহজতর হবে। হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স প্রথার প্রচলন করা যেতে পারে।

(চ) আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ ঃ উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা হ্যাচারির মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই বিধিমালা আইনের আকারে প্রবর্তিত হলে ভাল হয়। শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয় আইন যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনায় বংশগতিবিদ্যা

ডঃ মোঃ সামছুল আলম, সহকারী অধ্যাপক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ব্রুড ব্যবস্থাপনায় বংশগতিবিদ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোন পপুলেশনের জৈবিক ক্ষমতা তার বংশগতি (genetics) দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন মজুদের প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন ভালো হ্যাচারি পরিবেশ। পপুলেশনের (allele alternate form of a gene) বা 'জিন'-এর বিকল্পরূপই হচ্ছে তার জৈবিক ক্ষমতা। একজন হ্যাচারি ব্যবস্থাপককে তাই allele ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও একে কাজে লাগানোর কৌশল জানতে হবে। যে কোন ব্যবস্থাপনা কৌশল/পদ্ধতি একটি পপুলেশনের 'জিন' সমষ্টিকে (gene pool) প্রভাবিত করার ফলে এর উৎপাদনশীলতাও প্রভাবিত হয়। প্রতিবার ব্যবহারের সময় কিছু বৈশিষ্ট্য ও allel-এর বিলুপ্তি ঘটে। কাজেই ব্রুড ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তির এবং জেনেটিক বৈসাদৃশ্য হ্রাসের মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে। এই নিবন্ধে ব্রুড ব্যবস্থাপনার কিছু সহজ নীতি ও কৌশল বর্ণনা করা হল।

ব্রুড মাছ নির্বাচন ঃ ব্রুড ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজই হচ্ছে উন্নত মানের ব্রুড মাছ নির্বাচন ও সংগ্রহ। ব্রুড ব্যবস্থাপনা তথা হ্যাচারির সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে নির্ভুলভাবে ব্রুড নির্বাচনের ওপর। হ্যাচারিতে যেহেতু ব্রুড মাছ ব্যবহার করা হয়, তাই হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় এর সঠিক নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা কোথায় চাষ করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে ব্রুড মাছ নির্বাচন করা উচিত।

মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্তির জন্য পোনা উৎপাদন ঃ নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন নদী, হাওর ইত্যাদিতে আজকাল রুই জাতীয় মাছের প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিকভাবে ঐ সমস্ত জলাশয়ে পোনা সংযোজন (recruitment) কম হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে মুক্ত জলাশয় থেকে আহরিত মাছের পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। পোনা সংযোজনের এই ঘাটতি পূরণের জন্য কয়েক বছর যাবৎ হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা সরকারিভাবে বিভিন্ন মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করা হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন হ্যাচারিতে প্রচুর পরিমাণে পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত কর্মসূচির সফলতা নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐ সমস্ত পোনার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষমতার ওপর। এ কাজে ভাল ফল পেতে হলে মুক্ত জলাশয় যেমন নদীর মাছকেই ব্রুড হিসেবে নির্বাচন করা উচিত। স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সমস্ত মাছ বাস করে তাদের জেনেটিক বৈসাদৃশ্য (Genetic variability) বেশি থাকে। যেহেতু মুক্ত জলাভূমির পরিবেশ খুবই পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজেই এরূপ পরিবেশে ভালোভাবে বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য যে সমস্ত মাছের জেনেটিক বৈসাদৃশ্য বেশি সেরূপ মাছই উপযুক্ত।

খামারে ব্যবহারের জন্য পোনা উৎপাদন ঃ খামার যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার মাছই ব্রুড হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ খামার এলাকায় এবং পরিবেশে যে সমস্ত মাছ বেশি বাড়ে, যাদের রোগবালাই কম হয় বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং যাদের খাদ্য রূপান্তর হার কম এ ধরনের মাছই ব্রুড হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। কোন সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট হতে অথবা কোন গবেষণামূলক প্রকাশনা থেকে কিংবা নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ সমস্ত তথ্য জানা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক উৎসের মাছ এবং হ্যাচারি উৎপাদিত মাছের মধ্যে বাছাই করার সুযোগ থাকলে খামারে ব্যবহারের জন্য হ্যাচারি উৎপাদিত মাছই বাছাই করা উচিত। কারণ হ্যাচারি স্টক খামার পরিবেশে ইতঃপূর্বেই টেকসইকৃত হয়েছে।

খামার পরিবেশে হ্যাচারি উৎপাদিত মাছের উৎপাদন বেশি হবার কথা। যে হ্যাচারি থেকে পোনা সংগ্রহ করা হবে তাতে সঠিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে কিনা, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

কোন স্টকের মাছ নির্বাচনের আগে অবশ্যই তার ইতিহাস জানতে হবে। ঐ স্টকের উৎপত্তি কোথায়? কতবার হ্যাচারি বদল করেছে? ঐ স্টক ব্যবহার করে কেমন উৎপাদন পাওয়া গেছে? ঐ স্টকের রোগের ইতিহাস কি? ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই জানা দরকার। এতে একদিকে যেমন অন্য কারও সমস্যা নিজে টেনে আনা বন্ধ করা যায় অপর দিকে তেমনি সবেমাত্র যে সমস্যা বিতাড়িত হয়েছে তার পুনরাগমণ রোধ করা যায়। কোন স্টকের বংশগতি সম্পর্কীয় জ্ঞান তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে বিবেচিত হয়।

ব্রুড মাছের সংখ্যা ঃ বেশির ভাগ হ্যাচারি ম্যানেজার কোন পপুলেশন বা স্টকের Ne (অসীম নয় এমন কোন পপুলেশনের যত সংখ্যক মাছ প্রজননে অংশগ্রহণ করে থাকে সেই সংখ্যাকে কার্যকর প্রজনন সংখ্যা বা effective breeding number বা Ne বলে) জানেন না। দশ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট কোন পপুলেশন থেকে ব্রুড সংগ্রহ করলেও কোন লাভ হবে না যদি সেই দশ লক্ষ মাছ ১০ টি ব্রুড মাছ থেকে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এমনও উদাহরণ আছে যেখানে মাত্র ২ টি মাছের পোনা থেকে উৎপাদিত ব্রুড দিয়ে কয়েকটি হ্যাচারি শুরু করা হয়েছে। এই ধরনের পপুলেশনে জেনেটিক বৈসাদৃশ্য খুব কম হয় যা ভবিষ্যতে অন্তঃপ্রজনন ও জেনেটিক নিষ্ক্রিয়তাজনিত কারণে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে সমস্যা সৃষ্টি করে।

Ne কমে গেলে কোন পপুলেশনের জৈবিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে করে উৎপাদন কমে যায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে স্টক উন্নয়নের সুযোগ কমে যায় বা একেবারেই থাকে না।

সর্বনিম্ন Ne কত হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্যই জানতে হবে ঃ

১) কি পরিমাণ অন্তঃপ্রজনন আপনি মেনে নেবেন?

২) যে allele বা বৈশিষ্ট্য আপনি রক্ষা করতে চান তার সংঘটন বা ফ্রিকোয়েন্সি হার কত?

৩) অন্তঃপ্রজনন সংঘটনের পূর্বে আপনি কত জেনারেশন প্রজনন করাতে চান?

হ্যাচারির আকার, লক্ষ্য এবং বাজেটের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক ম্যানেজারকে তার হ্যাচারির কোন স্টকের Ne নির্ধারণ করতে হবে। হ্যাচারি ম্যানেজার তার হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য প্রথম যখন ব্রুড মাছ সংগ্রহ করেন তখন তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি শুরুতেই Ne এর মান কমাচ্ছেন না। যদি তা করা হয় তাহলে মারাত্মক ভুল হবে, যাকে বলা যেতে পারে 'গোড়ায় গলদ'। তার অর্থ হচ্ছে প্রথম জেনারেশন (F_1) তৈরির পূর্বেই কিছু জেনেটিক বৈসাদৃশ্য খোয়া গেল। কাজেই এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুরুতেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন হ্যাচারি ব্যবস্থাপক যদি অন্য কোন হ্যাচারি থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করেন তাহলে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে ঐ স্টকের Ne বেশি বড় ছিল। এমনও হতে পারে যে একজন ৫০০ টি ব্রুড মাছ থেকে উৎপাদিত পোনা ব্রুড হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন, কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না যে ঐ ৫০০ ব্রুড মাছের মাতা-পিতা একই ছিল। সুতরাং আগেই এদের বংশ পরিচয় জেনে নিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে অল্প পরিমাণ পোনা বেশি বেশি স্টক থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

বস্তুত জৈব ও নির্বাচিত নমুনা চয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করাই সমীচীন। যত বেশি সম্ভব নানাবিধ ভৌগোলিক এলাকা থেকে মাছ সংগ্রহ করা ভালো। যদি একই জায়গা থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয় তাহলে এমনও হতে পারে যে সেগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত বা আত্মীয়।

কাঙ্খিত Ne পাওয়ার জন্য Ne এর মানের চেয়ে বেশি সংখ্যক মাছ সংগ্রহ করতে হবে। কারণ যৌন পরিপক্কতা লাভের আগেই কিছু মাছ মারা যায় এবং কিছু মাছ প্রজনন করেনা। উদাহরণ স্বরূপ যৌন পরিপক্কতা পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যুহার যদি ৫০% হয় এবং প্রজনন সফলতা যদি ৬০% হয় তাহলে Ne ১০০ এর জন্য $\frac{১০০}{০.৫স০.৬)}$ = ৩৩৩ টি মাছ সংগ্রহ করতে হবে।

ব্রুড মাছের ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক কোন মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করার জন্য যদি পোনা উৎপাদন করা হয় তাহলে প্রাকৃতিক জলাশয়ে ব্রুড মাছ মুজদ করা সবচেয়ে ভাল। এক্ষেত্রে Ne যতটুকু সম্ভব বড় হতে হবে। এই জাতীয় কর্মসূচির লক্ষ্যই হবে জেনেটিক বৈসাদৃশ্য সংরক্ষণ করা যাতে জেনেটিক

বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলীয় ও মিঠা পানির মৎস্য প্রকল্পসমূহে সুষম, সম্পূরক এবং আন্তর্জাতিক মানের মৎস্য/চিংড়ি খাদ্য সরবরাহ করে আসছে। বর্তমানে আরো দু'একটি বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এ খাতে এগিয়ে আসছে। এতে করে বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য উৎপাদন আরো বাড়বে এবং খাদ্য প্রাপ্তি তুলনামূলক সহজ হবে।

বাণিজ্যিক মৎস্যখাদ্যের উপাদানসমূহ

মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন অনেক খাদ্য উপাদান আমাদের দেশে রয়েছে। দেশে প্রাপ্ত প্রায় ৮০টি খাদ্য উপাদানের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী উপাদান বাণিজ্যিক মৎস্যখাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সব উপাদান সহজ প্রাপ্য এবং এদের মূল্য ও পুষ্টিগত গুণাগুণ বাণিজ্যিক খাদ্য প্রস্তুতিতে সহায়ক। এগুলোর মধ্যে ফিশমিল, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, গম, গমের ভুসি, ময়দা, সয়াবিন খৈল, চিংড়ির খোসা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে খাদ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ এবং অন্যান্য রাসায়নিক অপরিহার্য উপাদানসমূহ আমাদের দেশে সহজপ্রাপ্য নয় বিধায় বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

সম্পূরক খাদ্যের সুবিধাসমূহ

উন্নত পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্যের বিকল্প নেই। এর ব্যবহারে চাষকৃত মাছের দ্রুত বৃদ্ধি, স্বল্প সময়ে বাজারজাতকরণের আকৃতি প্রাপ্তি, স্বগোত্র ভোজন প্রতিরোধ, অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়। উপরন্তু, উচ্চ মানসম্পন্ন খাদ্য ব্যবহারে খাদ্য রূপান্তর হার সুবিধাজনক হয়, যা পরবর্তীতে মুনাফার হার বৃদ্ধি করে। নিচের বিশ্লেষণ থেকে এ ব্যাপারে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে–

বিবেচ্য বিষয়সমূহ	সনাতন পদ্ধতির চাষ	উন্নত পদ্ধতির চাষ
পুকুরের আয়তন (একর)	১.০০	১.০০
উৎপাদন (কেজি/বছরে)	৩০০.০০	২,০০০.০০
বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	১৫,০০০.০০	১০০,০০০.০০
ব্যবস্থাপনা খরচ (পোনা, ইত্যাদি)	৫,০০০.০০	১০,০০০.০০
সম্পূরক খাদ্য	০.০০	৬৪,০০০.০০*
মুনাফা	**১০,০০০.০০**	**২৬,০০০.০০**

* প্রতি কেজি খাবারের মূল্য ১৬.০০ টাকা(কার্প জাতীয় মাছের জন্য)। খাদ্য রূপান্তর হার –২:১

(সূত্র : সৌদি–বাংলা ফিশ ফিড লিমিটেড)

বাংলাদেশে মৎস্যখাদ্য ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

উপরিবর্ণিত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, সুষম ও সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে এবং এতে করে মুনাফার পরিমাণও দ্বিগুণের অধিক। তবে এ ব্যাপারে আমাদের আর্থ–সামাজিক মূল্যবোধের কারণে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে, যা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১. সনাতন ধ্যান-ধারণা ঃ আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মাছ মূলত পুকুরে উৎপাদিত শ্যাঁওলা জাতীয় পদার্থ খেয়েই বেঁচে থাকে এবং এর বাইরে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। পাশাপাশি আরো একটি শ্রেণীর ধারণা, পুকুরে সার প্রয়োগ এবং মাঝে মাঝে দু'এক বস্তা চালের কুঁড়া, খৈল, গোবর, হাঁস–মুরগির বিষ্ঠা, গরুর নাড়ি–ভুঁড়ি ইত্যাদি অশোধিত দ্রব্য প্রয়োগই মাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। আসলে এর কোনটিই পুরোপুরি সঠিক নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার পুকুরের পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। বস্তুত মাছ এসব পদার্থের সবগুলো সরাসরি গ্রহণ করে না। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উপাদানের কারণে পুকুরে শ্যাঁওলা জাতীয় উদ্ভিদের উৎপাদন বাড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন পানির গুণাগুণ নষ্ট করে দেয়। এরচেয়ে বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্য, যার গুণাগুণ মাছের পুষ্টির দিকে লক্ষ রেখেই বজায় রাখা হয়, তা ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ এবং লাভজনক।

২. সনাতনী চাষ পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের মানুষের সাধারণত রুই, কাতলা জাতীয় মাছ চাষের প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এগুলোর দৈহিক বৃদ্ধি আশানুরূপ নয় এবং খাদ্য প্রয়োগেও তেমন ভাল ফল পাওয়া যায় না। এর চেয়ে অধিক দৈহিক বৃদ্ধি সম্পন্ন প্রজাতি, যেমন – গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছের চাষ জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিতে হবে। এসব প্রজাতি কম সময়ে বাজারজাতকরণ আকৃতি প্রাপ্ত হয়, খাদ্য প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়।

৩. সরবরাহ ঃ সনাতন ধ্যান–ধারণা ছাড়াও মৎস্য খাদ্য ব্যবহার বৃদ্ধির আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রান্তিক চাষীদের নিকট মৎস্যখাদ্যের সরবরাহ। যেহেতু দেশে এ পর্যন্ত মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র একটি, সেহেতু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ

সৈয়দ জাফর সাদেক, মহাব্যবস্থাপক
সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিঃ, ঢাকা

মাছ আমাদের দেশের মানুষের আমিষের প্রধান উৎস। প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৮০ ভাগ আসে মাছ থেকে। বাংলাদেশে বর্তমানে বাৎসরিক মাছের উৎপাদন প্রায় ১.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা মেটাতে হলে আরও প্রায় ০.৯ মিলিয়ন টন মাছ প্রয়োজন। আমিষ চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি ক্ষেত্রেও মৎস্যসম্পদ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৪.৭ ভাগ আসে এ সম্পদ থেকে। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ আসে মৎস্য রপ্তানি হতে। কর্মসংস্থানেও এ শিল্পের বিরাট অবদান আছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ এ কাজে জড়িত।

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তুলনামূলক আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে এ অঞ্চলের খুব কম দেশেই এ রকম বিশাল জলজ সম্পদ রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০ লক্ষ হেক্টরের ওপর এবং বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন উপকূলীয় চিংড়ি খামার সহ প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর। এছাড়াও তটরেখা সহ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তন ১.৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ এ পর্যন্ত সনাক্ত করা গেছে। এত বিস্তৃত সম্পদ থাকা সত্বেও বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ১৮ গ্রামে এসে দাঁড়িয়েছে, যা কিনা ১৯৬২ সালে ছিল ৩৩ গ্রাম। এই বিশাল পানিসম্পদ হতে মূলত গ্রামীণ মৎস্যচাষ, জল মহাল ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ দ্বারা মাছ উৎপাদিত হয়ে আসছে। অপরদিকে উন্নত ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুকুর, দিঘি এবং বদ্ধ জলাশয়গুলোতে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ বাংলাদেশের পরিকল্পিত মৎস্যসম্পদ আহরণের বিশেষ দিক, যা প্রকৃত পক্ষেই আশাব্যঞ্জক। আমাদের দেশের সমগ্র জলজ সম্পদ উন্নত পদ্ধতির আওতায় আনা গেলে দেশে মৎস্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের পূর্বশর্ত হচ্ছে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ, বিশেষ করে সুষম ও সম্পূরক খাবারের সহজ প্রাপ্তি ও সরবরাহ।

সুষম ও সম্পূরক খাদ্য কি এবং কেন ?

অন্যান্য প্রাণির মতই মাছকেও বেঁচে থাকা এবং দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত পুকুরে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করেই মাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবে দ্রুত বৃদ্ধি এবং অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্যে প্রাকৃতিক খাবারই যথেষ্ট নয়। এছাড়া পুকুরের প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধির জন্যে অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করেও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। এজন্যে সুষম ও সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হয়। কারণ এ খাদ্যে মাছের প্রয়োজনীয় আমিষ, শ্বেতসার, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ, স্নেহজাতীয় পদার্থ ইত্যাদি সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। তাই এ খাদ্য প্রয়োগে দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। তাছাড়া, অধিক ঘনত্বে বৈজ্ঞানিক চাষের ক্ষেত্রে সুষম ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ এক কথায় অপরিহার্য।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ

আধুনিক পদ্ধতির মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্যের অপরিহার্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশে 'সৌদি-বাংলাদেশ শিল্প ও কৃষি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (সাবিনকো), সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয় এবং ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সৌদি-বাংলা ফিশ ফিড লিঃ, নামক একমাত্র মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬,০০০ মেট্রিক টন। এ যাবৎ কাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান

খাদ্য প্রয়োগের হার ও পদ্ধতি

খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্য নিম্নোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করলে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সর্বোত্তম হয় এবং মাছের উৎপাদন বেশী পাওয়া যায়।

খাবারের প্রকার	প্রয়োগ হার	প্রতিদিন	প্রয়োগ পদ্ধতি
নার্সারি খাদ্য (পাউডার/ দানাদার খাদ্য)	মাছের মোট ওজনের ১০-২০%	৩-৪ বার	পুকুরের চার পাশে ৫-৬টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
মিশ্র চাষের জন্য ঃ			
পিলেট খাদ্য	মাছের মোট ওজনের ২-৫%	১-২ বার	পুকুরের চার পাশে ৪-৫টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
ভেজা খাদ্য	মাছের মোট ওজনের ৬-৮%	১-২ বার	পুকুরের চারপাশে ৩-৪টি নির্দিষ্ট জায়গায়, পানির ১-২ ফুট নিচে খুঁটিতে আটকানো টিনের তৈরি ট্রে অথবা চাটাই ও পলিথিন দ্বারা তৈরি মাচায় রেখে প্রয়োগ করতে হবে।

ব্রুড মাছের খাবার মাছের দৈনিক ওজনের ১.৫-৩% (শুকনো খাবার) এবং ভেজা খাবার ৩-৬% হারে প্রতিদিন একবার প্রয়োগ করতে হবে। মাগুর জাতীয় মাছের খাদ্য শুকনো অবস্থায় দৈহিক ওজনের ৩-৬% এবং ভেজা অবস্থায় ৬-১০% হারে প্রতিদিন ১-২ বারে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাবার প্রয়োগ করলে মাছ ঐ নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে খাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তাই প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাবার প্রয়োগ করা উচিত।

* পুকুরের পানির তাপমাত্রা এবং গুণাগুণের তারতম্যের সাথে খাদ্য প্রয়োগ হারও কমবেশী হবে।

* পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে ১ বার এবং মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রতি ১৫ দিনে/মাসে ১ বার নমুনা সংগ্রহ করে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

* শীতকালে (পৌষ-মাঘ মাস) খাবারের পরিমাণ অর্ধেকের বেশী কমিয়ে আনা যেতে পারে।

* পুকুরে শ্যাঁওলার উৎপাদন খুব বেশী হলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে অথবা বন্ধ রাখতে হবে।

* মাটির চাড়ি বা ট্রেতে ভেজা খাবার প্রয়োগ করলে খাদ্যের অপচয় কম হয়।

* চটের বস্তায় পুরে খাবার দেয়া ঠিক নয়। এতে খাবারের অপচয় হয়, পানি দূষণ হয়, অক্সিজেনের অভাব হয়। বেশীর ভাগ খাবার দামি সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অধিক মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য খামারে তৈরি মৎস্য খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি পুকুরে নিয়ম মাফিক সার প্রয়োগ করতে হবে। এতে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন বেশী হবে। রাজপুঁটি বা গ্রাস কার্পের জন্য মাছের ওজনের ১০-৩০% হারে নরম ঘাস দিতে হয়। ক্ষুদি পানা, কুটি পানা এসব মাছের উত্তম খাদ্য। ঘাসকে ছোট করে কেটে পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁশের ফ্রেমের ভিতর দিতে হয়।

উপরোক্ত নিয়মে মাছের খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ করে পোনা মাছের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি তিনমাসে ৯-১০ সে. মি. আকারের ৪,৫০,০০০ পোনা উৎপাদন করা সম্ভব (বাঁচার হার ৭০-৭৫%)। ১,২৯,৬৩৫ টাকা খরচ করে ৩,৬০,০০০ টাকা আয় এবং ২,৩০,৩৬৫ টাকা মুনাফা পাওয়া যেতে পারে। মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে বছরে হেক্টর প্রতি ৬-৭ টন মাছ উৎপাদন করে ১,৪৬,৭২৫ টাকা খরচের বিপরীতে ২,৮০,০০০ টাকা আয় এবং ১,৩৩,২৭৫ টাকা মুনাফা করা সম্ভব।

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট উদ্ভাবিত ফর্মূলা অনুযায়ী মৎস্যখাদ্য তৈরি করে খামারের তৈরি মৎস্যখাদ্যের মান উন্নত করা যেতে পারে এবং ইনষ্টিট্যুট নির্দেশিত খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যের অধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খামারে মাছের উৎপাদন বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে ২-৩ গুণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

* এমবাভিট ফিশ প্রিমিক্স/শ্রিম্প প্রিমিক্স এবং এমবাভিট জি এস প্রতি কেজি নার্সারি খাদ্যের মূল্য ১০.০০-১৩.৫০ টাকা এবং মিশ্রচাষের জন্য প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য ৮.০০-৯.০০ টাকা।

নার্সারি খাদ্যের খাদ্য রূপান্তর হার- ১.৫:১

মিশ্রচাষের খাদ্যের খাদ্য রূপান্তর হার- ২:১

মাগুর মাছের চাষের জন্য প্রতি কেজি খাদ্যে ২৮৫ গ্রাম সরিষার খৈল/তিলের খৈল, চালের কুঁড়া ৩১০ গ্রাম, তাজা রক্ত ৫০০ গ্রাম (১১.৫ গ্রাম শুকনো), ফিশমিল ১৮০ গ্রাম, আটা ৫০ গ্রাম, চিটাগুঁড় ৩০ গ্রাম, ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ ১০ গ্রাম, সয়াবিন তৈল ১০ গ্রাম, ঝিনুক চুর্ণ ৫ গ্রাম এবং লবণ ৫ গ্রাম দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য পড়বে ১০.৫০-১২.৫০ টাকা। এ খাদ্যে আমিষের পরিমাণ প্রায় ৩২%।

রুই জাতীয় ব্রুড মাছের খাদ্যে (২৫% আমিষ) তৈরিতে ১৬% ফিশমিল, ১০% সরিষার খৈল, ২৬% তিলের খৈল, চালের কুঁড়া ২০%, গমের ভুসি ১৯%, আটা ৩%, চিটাগুঁড় ৫% এবং ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ ১% ব্যবহার করা যেতে পারে।

খাবার তৈরিতে অধিক মূল্যের ফিশমিলের পরিবর্তে রেশমকীট, ব্লাডমিল, চিংড়ি গুঁড়া, কাঁকড়া চূর্ণ এবং মুরগি ও গরু-ছাগলের নাড়িভুঁড়িও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাণিজ আমিষের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ আমিষ যেমন ক্ষুদি পানা, কুটি পানা ইত্যাদি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের খাবার তৈরি করা যায়, কিন্তু খাবারের দাম কিছুটা বেশী হলেও মাছের খাদ্যে কিছু পরিমাণ প্রাণিজ আমিষ না রাখলে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না।

খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী

সূত্রানুযায়ী পরিমাণমত উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য উপাদান প্রয়োজনে গ্রাইন্ডার বা আটা পেষা মেশিনে বা ঢেঁকিতে ভাল করে চূর্ণ বা গুঁড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। এর পরে ফর্মূলা অনুযায়ী উপাদানসমূহ একটি একটি করে নির্দিষ্ট মাত্রায় মেপে নিতে হবে। এবং অল্প অল্প করে মিক্সার মেশিনে বা বড় একটি পাত্রে ঢেলে বা মেঝেতে রেখে হাত কিংবা লাঠি বা বেলচা দিয়ে শুকনো অবস্থায় ভালভাবে মেশাতে হবে। উত্তমরূপে মেশানোর পর অল্প অল্প করে পানি এমনভাবে মিশিয়ে নাড়তে হবে যাতে সমস্ত মিশ্রণটি একটি আঠাল পেষ্ট বা মন্ডে পরিণত হয়। এ পেষ্ট বা মন্ডকে হাত দিয়ে গোল্লা বানিয়ে ভেজা খাদ্য হিসেবে সরাসরি মাছকে দেয়া যেতে পারে অথবা মেশিনে পিলেট বা বড়ি বা দানাদার খাদ্য তৈরী করে শুকিয়ে রাখা যায়। পিলেট বা বড়ি বা দানাদার খাদ্যের আকার চাষকৃত মাছের মুখের আকার অনুযায়ী তৈরি করতে হবে যাতে মাছ এ খাবার মুখে নিয়ে খেতে পারে। নির্দ্দিষ্ট আকারের চালনি ব্যবহার করে এটা করা যায়। হস্তচালিত সেমাই মেশিনের মত লোহা দিয়ে কম খরচে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মেশিন তৈরি করে হাতে চালিয়ে অথবা ১/২ হর্স পাওয়ারের মটর ব্যবহার করেও পিলেট বা বড়ি তৈরি করা যেতে পারে। এছাড়াও পিলেট/বড়ি তৈরির জন্য বড় আকারের (বাণিজ্যিক) পিলেট মেশিন রয়েছে যাতে মিশ্রণ ও পিলেট দুটোই করা যায়। খামারে ব্যবহার উপযোগী স্বল্পমূল্যের (৩০,০০০ টাকা) একটি পিলেট মিক্সার মেশিন উদ্ভাবন করেছে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ঘন্টায় ২০-৩০ কেজি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এ মেশিনটি তৈরি করে খামারীগণ পিলেট খাদ্য তৈরি করতে পারেন।

বাণিজ্যিক মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ভেজা বা আর্দ্র খাবার কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয় যদিও প্রতিদিনের খাবার তৈরি করলে এ সমস্যা এড়ানো যায়। মাছ চাষীদের জন্য ভেজা খাবার অধিকতর উপযোগী। তবে বাণিজ্যিক মৎস্য চাষের জন্য শুকনো পিলেট বা বড়ি জাতীয় খাদ্যই সবচেয়ে উপযোগী। এটি পানিতে অধিকতর স্থিতিশীল, প্রয়োগ করা সহজ এবং কম তাপমাত্রায় সংরক্ষনের প্রয়োজন হয় না। খাবার ভেজা বা শুকনো যাই হোক না কেন পানিতে অবশ্যই স্থিতিশীল হতে হবে যাতে খাবার প্রয়োগের সাথে সাথে পানিতে গলে না যায়। খাবারকে স্থিতিশীল করার জন্য এতে কিছু প্রাকৃতিক আঠালো উপাদান যেমন-বার্লি, ময়দা, আটা, চিটাগুঁড় ইত্যাদি মোট খাদ্য উপাদানের ৫ হতে ৮ ভাগ হারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তৈরি পিলেট/বড়ি পলিথিন শিটে বা চাটাইয়ে রেখে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে পলিথিনের বস্তায় অথবা কোন পাত্রে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে সংরক্ষিত খাবার পুনরায় রোদে শুকিয়ে ঠিকমত সংরক্ষণ না করলে ছত্রাক ও পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এতে খাবারের মান নষ্ট হয়। তাই খাবার পিলেট/বড়ি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা উচিত।

উপাদানের নাম	আমিষ (%)	স্নেহ (%)	শর্করা (%)	শক্তি (ক্যালরি/কেজি)
ঝিনুক/শামুকের মাংস	৩০.৩৯	২.৯০	৫৫.৮৪	৪২৮৫
গরুর নাড়িভুঁড়ি	৫১.৬০	২১.১৪	১৩.০৪	৫৫৬৬
চালের কুঁড়া	১১.৮৮	১০.৪৫	৪৪.৪২	৩৯৫২
গমের ভুসি	১৪.৫৭	৪.৪৩	৬৬.৩৬	৪৩৯৪
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	১৩.৪৪	৩৪.৩৮	৪৯৭৮
তিলের খৈল	২৭.২০	১৩.১৮	৩৪.৯৭	৪৭৫৩
মাসকালাই ভুসি	১৮.৮৯	০.৫৫	৫০.২৬	৪২৫২
সয়াবিন ভুসি	২৩.৮২	২৪.৮৩	৩৭.৯৯	৫১৮৮
ক্ষুদি পানা	১৪.০২	১.৯২	৬০.৮৮	৩৯৩৯
কুটি পানা	১৯.২৭	৩.৪৯	৫০.১৯	৩৯১২
আটা	১৭.৭৮	৩.৯০	৭৫.৬০	৪৪৮৮
চিটাগুঁড়	৪.৪৫	-	৮৩.৬২	৩৬২৪

এর মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত উপাদানগুলো হলো ঃ চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ফিশমিল, গরু ও ছাগলের রক্ত এবং জলজ উদ্ভিদ যেমন- ক্ষুদি পানা ইত্যাদি।

মাছের খাদ্য তৈরির সূত্র

খাদ্যের সূত্র তৈরির প্রথমে মাছের পুষ্টি চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী কম মূল্যের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য উপাদান এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে চাষকৃত মাছের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং দামও কম হয়। রুই এবং মাগুর জাতীয় মাছের পুষ্টি চাহিদা মাছের প্রজাতি, বয়স এবং চাষের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস) পোনা মাছের আমিষের চাহিদা প্রজাতি ভিত্তিক ৪০-৪৫%, খাবার মাছের আমিষের চাহিদা ৩৫-৪০% এবং প্রজননক্ষম মাছের আমিষের চাহিদা ৩৮-৪২% এর মধ্যে থাকে। মাগুর জাতীয় (মাগুর, শিং, পাবদা ইত্যাদি) পোনা মাছের আমিষের চাহিদা প্রজাতি ভিত্তিক ৪৫-৫০%, খাবার মাছের ৩৭-৪২% এবং প্রজননক্ষম মাছের আমিষের চাহিদা ৪০-৪৫% এর মধ্যে থাকে। অতএব, সর্বোচ্চ মাত্রার উৎপাদন পেতে হলে, একটি মৎস্যখাদ্যে কমপক্ষে সর্বনিম্ন মাত্রার আমিষ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে পুকুরে যেহেতু কিছু প্রাকৃতিক খাবার থাকে সেজন্য পুকুরে মাছ চাষের জন্য মৎস্য খাদ্য আমিষের পরিমাণ উপরোক্ত চাহিদা থেকে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার ওপর ভিত্তি করে ৫-১৫% কম করা যেতে পারে। সুষম খাদ্য তৈরির জন্য খাদ্যের সাথে সাধারণত ০.৫-২% ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ ব্যবহার করতে হয়। খাবার পানিতে বেশীক্ষণ স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসেবে আটা অথবা ময়দা অথবা চিটাগুঁড় ব্যবহার করতে হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাছ চাষীদের সঙ্গতির কথা বিবেচনায় রেখে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ এবং পুকুরে পোনা চাষের জন্য স্বল্প মূল্যের উন্নত মানের সম্পূরক খাদ্য উদ্ভাবন করেছে যা অনুসরণ করে খামারীরা তাদের তৈরি খাদ্যমান উন্নত করতে পারেন। উক্ত খাদ্যের সূত্র নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সারণি-২। রুই জাতীয় মাছের নার্সারি এবং মিশ্রচাষের খাদ্য সূত্র।

উপাদানের নাম	আমিষের পরিমাণ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)		আমিষ (সরবরাহকৃত)	
		নার্সারি	মিশ্রচাষ	নার্সারি	মিশ্রচাষ
ফিশমিল/ব্লাড মিল	৬৩.১৫-৭০.৯৮	২১.০০	১০.০০	১১.৯২	৫.৬০
সরিষার খৈল/ তিলের খৈল	৩০.৩৩/২৭.২০	৪৬.০০	৩৩.০০	১৩.২৮	১০.০১
চালের কুঁড়া/গমের ভূসি	১১.৮৮/১৪.৫৭	১৮.০০	৪৮.৫০	২.৩৯	৫.৭৬
আটা	১৭.৭৮	১৪.০০	২.০০	২.৫০	০.৩৬
চিটাগুঁড়	৪.৪৫	-	৬.০০	-	০.২৭
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	-	১.০০	০.৫০	-	-
		১০০	১০০	৩০	২২

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খামারে নিজস্ব পদ্ধতিতে খাবার তৈরিতে কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। এতে খাবারের মূল্য কম পড়ে। তবে খামারীরা তাদের খামারে যে খাবার তৈরি করেন তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক। মাছের পুষ্টি চাহিদা, পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে এসব খাবারকে সুষম করা, বিজ্ঞানসম্মত করা এবং মান উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

খামারে তৈরি খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ঃ বর্তমান অবস্থা/প্রেক্ষাপট

বেশীর ভাগ খামারীরা তাদের মৎস্য/চিংড়ি খামারে খাবার প্রয়োগের নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট হার ঠিক করেন না বা ঠিক রাখেন না। ইচ্ছামতো খাবারের হার ও সময় বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করেন। খাবার প্রয়োগ পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন।

নার্সারির ক্ষেত্রে কোন কোন খামারী মজুদকৃত পোনার ওজনের ৩ গুণ হারে দিনে দু'বার খাবার প্রয়োগ করেন। পরবর্তীতে প্রতি সপ্তাহ/প্রতি ১০ দিন পরপর ২ কেজি পরিমাণে খাবার বাড়াতে থাকেন। খাবার সাধারণ সারা পুকুরে অথবা পুকুরের বেশ কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া হয় শুকনো অবস্থায়। কিছু কিছু খামারী খাবারকে পানির সাথে মিশিয়ে তরল অবস্থায়ও ছিটিয়ে দেন। খাবারের পরিমাণ এবং প্রয়োগ মাত্রা/দফা (feeding frequency) বিভিন্ন খামারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়। কেউ কেউ আরো কম/বেশী পরিমাণে খাবার দেন এবং দিনে একবার বা ২ দিনে একবারও খাবার প্রয়োগ করেন।

মিশ্র চাষ এবং মাগুর মাছের খামারে কিছু কিছু খামারী মাছের ওজনের ২-৮% হারে, কেউ কেউ ইচ্ছামতো হারে দিনে একবার অথবা ১ দিন/২দিন অন্তর অন্তর খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। কেউ কেউ শুকনো খাবার পুকুরে ছড়িয়ে দেন। আবার কোন কোন খামারী ভেজা গোল্লা খাবার পুকুরে ছড়িয়ে দেন। সাধারণ চিংড়ি খামারীরা তাদের খামারে ইচ্ছামতো বিভিন্ন হারে বিভিন্ন পরিমাণে, বিভিন্ন সময়ে খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। কোন খামারী দিনে একবার, আবারো কেউ কেউ ২ দিন অন্তর অন্তর একবার খাবার দেন। উন্নত খামারীরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট হারে (৩-১০%) সন্ধ্যাবেলা অথবা ভোর বেলায় খাবার দেন। রুই জাতীয় নার্সারি, বড় মাছ এবং ব্রুড মাছ, মাগুর জাতীয় মাছের নার্সারি ও বড় মাছ এবং চিংড়ির পোনা ও বড় মাছ চাষের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময় খাবার পুকুর/ঘেরের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয় এতে খাবারের প্রচুর অপচয় হয়। খাবারে বাইন্ডার না থাকাতে খাবার দেয়ার সাথে সাথে পানিতে গলে যায় এবং অনেক খাবার নষ্ট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চটের বস্তায় অনেক খাবার একসাথে নিয়ে পুকুর/ঘেরের কয়েক জায়গায় বাঁশের খুঁটি পুঁতে পানির ভিতরে বাঁশের খুঁটিতে বস্তাভর্তি খাবার বেঁধে রাখা হয়। এক থেকে দু সপ্তাহ পর্যন্ত খাবার এভাবেই থাকে। এ খাবারের বেশীর ভাগই মাছ খেতে পারে না এবং পচে পুকুরের পরিবেশ দূষিত করে। ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায়। এ খাবারের বেশীর ভাগই খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে দামি সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে মাছের উৎপাদন কম হয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খামারীর ক্ষতি হয়।

খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্যকে কিভাবে আরো উন্নত করা যায়, খাদ্যের মান বাড়ানো যায় এবং খাদ্য ব্যবস্থাকে কিভাবে আরো বিজ্ঞানসম্মত করা যায় এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট মাছের খাদ্য উপাদান, মাছের পুষ্টি চাহিদা, সম্পূরক খাদ্য তৈরি এবং সঠিক খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন মাছ চাষের জন্য সুষম সম্পূরক খাদ্য উদ্ভাবন করেছে। ইনষ্টিট্যুট উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি খামারী/মাছ চাষীদের খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্যের মান বাড়াতে এবং সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে খামারে মাছের উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক হবে।

মাছের খাদ্য উপাদান

মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে এমন অনেক উচ্চ পুষ্টিমানের খাদ্য উপাদান আমাদের দেশে রয়েছে। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে খামারে মৎস্যখাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য খাদ্য উপাদানের গুণগত মানের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি-১। খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমানের বিবরণ।

উপাদানের নাম	আমিষ (%)	স্নেহ (%)	শর্করা (%)	শক্তি (ক্যালরি/কেজি)
ফিশমিল এ গ্রেড	৫৬.৬১	১১.২২	৩.৭৪	৪৭৫৪
ফিশমিল বি গ্রেড	৪৪.৭৪	৭.৮৭	১৬.৮২	৪০৬৮
রেশম কীট মিল	৫২.৪৬	২৩.২৩	১০.৮১	৫৯৩৯
শ্রিম্প মিল	৩৫.৮৮	১.০৬	৯.৭৩	৩৭৭৪
ব্লাড মিল	৬৩.১৫	০.৫৬	১৫.৫৯	৪২৯৪

খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্য ব্যবস্থাপনা

মোহাম্মদ জাহের
উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ

প্রচুর সম্ভাবনাময় এদেশের মৎস্যসম্পদ ব্যবহার করে মাছ চাষী এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ মৎস্য খামার গড়ে তুলে খামারে নিজস্ব পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি এবং প্রয়োগ করে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে পারেন। খামারে তৈরি সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ করে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা, মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো এবং পুষ্টির অভাব দূর করা সম্ভব। বাংলাদেশে প্রচলিত-অপ্রচলিত সহজলভ্য এবং স্বল্প মূল্যে এমন প্রচুর খাদ্য উপাদান রয়েছে যা খামারে মৎস্যখাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। খামারে মৎস্যখাদ্য তৈরিতে দামি যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন হয় না। ফলে খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্যের দাম পড়ে কম এবং তা মাছ চাষী বা খামারীদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে কিন্তু বাণিজ্যিক পিলেট খাদ্যের দাম খুব বেশী যা মাছ চাষী বা খামারীদের পক্ষে ক্রয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই আমাদেরকে খামারে মাছ চাষের জন্য নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বল্প মূল্যের সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির দিকেই বেশী নজর দিতে হবে। বর্তমানে খামারে মৎস্যখাদ্য তৈরি এবং খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাই খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগের ব্যবস্থাপনাকেও আরো উন্নত করতে হবে। মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিট্যুটে উদ্ভাবিত খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন সম্ভবপর হবে।

খামারে তৈরি মৎস্যখাদ্য ঃ বর্তমান অবস্থা/প্রেক্ষাপট

বেশীর ভাগ খামার মালিক/চাষীরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে খামারে স্থানীয় উপাদান সহযোগে মাছ/চিংড়ির খাবার তৈরি করে থাকেন। এদের খাবার তৈরির সূত্র ও পদ্ধতি বিচিত্র। কিন্তু কিছু খামার মালিক মিশ্র চাষে এবং নার্সারিতে শুধু চালের কুঁড়া ব্যবহার করেন। তেলাপিয়া এবং সরপুঁটির চাষে শুধু চালের কুঁড়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ চালের কুঁড়ার পরিবর্তে গমের ভুসিও ব্যবহার করেন। নার্সারি ক্ষেত্রে কোন কোন খামারী প্রথম দিকে কিছু ময়দা বা আটা ব্যবহার করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে নার্সারি খামারে সরিষার খৈল বা তিলের খৈল ব্যবহার করা হয়। খৈল আগের দিন ভিজিয়ে রাখা হয় এবং পরের দিন ভেজা খাবার প্রয়োগ করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খাবারের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা মাপ থাকে না। খামারীরা তাদের ইচ্ছামত খাবার দিয়ে থাকেন।

মিশ্র চাষের খামারে ব্যবহারের জন্য চালের কুঁড়া (৫০-৮০%) এবং সরিষার খৈল/তিলের খৈল (২০-৫০%) এর মিশ্রণে গোলাকৃতি মন্ড বা বল আকারের ভেজা খাবার কিছু খামারী নিজেদের খামারে তৈরি করে থাকেন। ব্রুড মাছের ক্ষেত্রে উন্নত খামারীরা ৫০% চালের কুঁড়া/গমের ভুসি, ৪৫% সরিষার খৈল এবং ৫% ফিশমিলের মিশ্রণে ভেজা গোল্লা খাবার তৈরি করেন। মাগুর জাতীয় মাছের জন্য সাধারণ খামারীরা কুঁড়া ও সরিষার খৈল এবং উন্নত খামারীরা ২০-৪০% ফিশমিল, ২০-৪০% সরিষার খৈল এবং ২০-৬০% চালের কুঁড়ার মিশ্রণে ভেজা গোল্লা খাবার তৈরি করে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নত খামারীরা মাগুর মাছের জন্য ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক দানাদার খাবারও ব্যবহার করেন।

চিংড়ি খামারে খামারীরা চালের কুঁড়া/গমের ভুসি, আটা বা ময়দা, ফিশমিল/গরু-ছাগলের নাড়িভুঁড়ি, সরিষার খৈল/তিলের খৈল ইত্যাদি বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে ভেজা গোল্লা খাবার তৈরি করেন। কিছু কিছু উন্নত খামারী স্থানীয় ভাবে তৈরি পিলেট মিশিয়ে দানাদার চিংড়ি খাদ্যও তৈরি করে থাকেন।

তাছাড়া মাছ খাঁচায় কতদিন ধরে লালন-পালন করবেন, কত বড় করে বাজারজাত করবেন, কি ধরণের খাবার দেবেন, কি পরিমাণ খাবার দিবেন, খাঁচায় পানির প্রবাহ (অক্সিজেনের পরিমাণ) কেমন এবং জলাশয়ের প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ ইত্যাদির ওপরও মজুদ সংখ্যা নির্ভরশীল।

ঘ) **খাদ্য ঃ** যেহেতু আপনার মজুদকৃত মাছের পক্ষে অবাধ বিচরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবেনা তাই বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক। পুকুরে ও চিংড়ি মাছের ঘেরে যে ধরনের খাদ্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সে ধরনের খাদ্য আপনি খাঁচার মাছকে খাওয়াতে পারেন। যেমন-চালের কুঁড়া,গমের ভুসি, খৈল, আটা, ময়দা, কুটি পানা, ইপিল-ইপিলের পাতা, মুরগি ও মাছের নাড়িভুঁড়ি, রান্না ঘরের এঁটো, পিঁপড়ার ডিম, উইপোকার ডিম, রেশম পোকা, শামুক, ঝিনুক, শুঁটকি মাছের গুঁড়ো, ফেক্টরীতে তৈরি খাবার ইত্যাদি। খাদ্যের পরিমাণ কম/বেশি করে দিয়ে দিয়ে সঠিক পরিমাণ নির্ধারন করতে পারেন। দিনে দু বার খাঁচায় খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। খাবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি দিকে আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রয়োগকৃত খাদ্যের অপচয় না হয় এবং খাবার খাঁচার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে না যায়। সেক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন, তবে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতিটি হচ্ছে মাটির পাত্র (সান্‌কি) ছিকা/দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তাতে খাদ্য প্রয়োগ।

ঙ) **পরিচর্যা ঃ** পুকুরে/চিংড়ি ঘেরের চাষের মতই পরিচর্যা/যত্ন করতে হয়। তবে ব্যতিক্রম হলো কয়েকদিন পর পর খাঁচা পরিষ্কার করতে হবে যাতে খাঁচার ফাঁকগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে পানির প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে আপনি এ কাজটি করতে পারেন। আরেকটি কাজ হলো নিয়মিত খাঁচা পরীক্ষা করে দেখতে হবে খাঁচায় কোন ছিদ্র হয়েছে কিনা। কাঁকড়া কাটার কারণে বা কোন কিছুর গুতো লেগে সাধারণত খাঁচায় ছিদ্র হয়। এদিকে লক্ষ্য না রাখলে মাছ পালিয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

কেয়ার-বাংলাদেশ কি করছে

কেইজেস (কেইজ অ্যাকোয়াকালচার ফর গ্রেটার ইকোনোমিক সিকিউরিটি) কেয়ার-বাংলাদেশের কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টরের একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প। ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য খাঁচায় মাছের চাষ প্রবর্তন করা এবং তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা।

কেইজেস প্রকল্প (CAGES) মেঘনা-গোমতী নদীতে (বাউসিয়া ঘাট, গজারিয়া থানা, মুন্সীগঞ্জ জেলা) সরকারের সহযোগিতায় খাঁচায় মাছের চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা/নিরীক্ষা পরিচালনা করছে। পাশাপাশি এই কেন্দ্রের আশেপাশের নয়টি গ্রামে ৩০ জন সহযোগী চাষীর মাধ্যমে উপযোগী প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের জন্য এই বর্ষা মৌসুমে কাজ শুরু হয়েছে। তদুপরি সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন বাঁওড় প্রকল্প, মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের এর সাথে যৌথভাবে প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের জন্য কাজ শুরু করা হয়েছে।

আপাতঃপর্যায়ে বৃহত্তর ঢাকা, যশোর, সিলেট, বরিশাল ও কুমিল্লা অঞ্চলে খাঁচায় মাছ চাষ প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। এতদঞ্চলে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে ইতোমধ্যে মত বিনিময় শুরু হয়েছে এবং উৎসাহী ও সমমনা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি সহায়তা ও প্রচারণা হবে এই কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি।

পারে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের জাল পাওয়া যায় যেমন সুতির, নাইলনের, টায়ারকর্ডের এবং পলিথিলিনের তৈরি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে পলিথিলিন, টায়ারকর্ড ও নাইলনের জাল পানিতে বেশি দিন টেকে। আপনি গাব অথবা অন্য কোন ধরনের সংরক্ষক (preservative) ব্যবহার করেও জালের স্থায়িত্ব বাড়াতে পারেন। এ ধরনের জাল আপনি ঢাকার জিঞ্জিরা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও ভৈরব বাজারের জালের আড়তগুলোতে পেতে পারেন কিংবা একটু খোঁজ নিলে আপনার নিকটস্থ বাজারেও পেতে পারেন।

খাঁচা তৈরির প্রথমে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে আপনার খাঁচার আকার ও আকৃতি, তারপর পরিমাণমত জাল কেটে চারপাশ ও তলদেশ উল্টানো মশারির মতন করে সেলাই করুন। সেলাই করার জন্য প্লাষ্টিক/নাইলনের রশি অথবা অন্য যে কোন ধরনের শক্ত রশি ব্যবহার করতে পারেন এবং এটি করতে আপনার প্রয়োজন হবে বড় ধরনের সুঁই (জাল, চটের বস্তা সেলানোর সুঁই)। সেলাই করার সময় লক্ষ্য রাখবেন যাতে সেলাইয়ের দুটি পাশাপাশি ঘরের মধ্যে এমন ফাঁক না থাকে যার মধ্য দিয়ে মজুদকৃত পোনা মাছ বের হয়ে যেতে পারে। তারপর আপনাকে খাঁচার তলদেশে মুড়ি বেঁধে কিছু দূর পর পর ওজন (Sinker) লাগাতে হবে। কারণ জালের তৈরি খাঁচা হলে ঢেউয়ের কারণে খাঁচার তলদেশ উপরের দিকে উঠে যেতে পারে, সেজন্য ওজন ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাধারণত ঝাঁকি জালে ব্যবহৃত লোহার কাঠি ব্যবহার করা হয়। আপনি অন্য কোন কিছুও ওজন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

খ) **খাঁচা পানিতে স্থাপন ঃ** খাঁচা পানিতে স্থাপনের সময় আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে খাঁচার তলদেশ যেন জলাশয়ের তলদেশের মাটি হতে কমপক্ষে ১.৫ ফুট ওপরে থাকে। খাঁচার অভ্যন্তরের পানির গভীরতা কমপক্ষে ৩ ফুট থাকতে হবে। আপনি ইচ্ছে করলে আরও বেশি রাখতে পারেন। আপনি যদি খাঁচার উপরিভাগ পানির লেভেলে রাখতে চান তাহলে অবশ্যই খাঁচার উপরিভাগ জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নাহলে মাছ খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবে। আপনি যদি খাঁচার উপরিভাগ পানির লেভেলে না রাখেন তবে সে ক্ষেত্রে খাঁচাকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে খাঁচার ওপরের অংশ পানির লেভেল থেকে কমপক্ষে ১.৫ ফুট উঁচুতে থাকে, ফলে মাছ খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না।

খাঁচা পানিতে রাখবেন কিভাবে ঃ জলাশয়ের পানির গভীরতা ও আর্থিক সামর্থ্যের দিক বিবেচনা করে খাঁচাকে দু'ভাবে পানিতে স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন স্থিরভাবে (fixed type) এবং ভাসমানভাবে (floating type)।

স্থিরভাবে ঃ জলাশয়ের পানির গভীরতা যদি কম হয় কিংবা আপনি যদি কম গভীরতায় খাঁচা স্থাপন করতে চান তাহলে কয়েকটি বাঁশের বা অন্যান্য ধরনের খুঁটি পানিতে পুঁতে খুঁটিগুলোর সাথে আপনার খাঁচা ঝুলিয়ে দিন। খাঁচাটি যদি জালের তৈরি হয় তাহলে বাঁধার সুবিধার্থে খাঁচার উপরিভাগে নাইলন/প্লাষ্টিকের রশির একটি লাইনিং দিয়ে (পায়জামার দড়ির মতন) চার কোণাতে লুপ (মশারি ঝোলানোর জন্য কোণায় যেমন রশি থাকে) আকারে বের করে লুপগুলোকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিয়ে খাঁচা ঝুলিয়ে দিন।

ভাসমানভাবে ঃ জলাশয়ের পানির গভীরতা যদি বেশি হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ভেলা (float) তৈরি করতে হবে। এই ভেলা আপনার খাঁচাটিকে পানিতে ভাসিয়ে রাখবে, মোটা বাঁশ পাশাপাশি বেঁধে ভেলা তৈরি করতে পারেন। কলাগাছ, তেলের ড্রাম, প্লাষ্টিকের ড্রাম দিয়েও খাঁচা ভাসিয়ে রাখা যায়। আপনি যদি বাঁশ বা কলা গাছ দিয়ে ভেলা বানান সেক্ষেত্রে খাঁচার আকার অনুযায়ী চার খন্ড ভেলা বানিয়ে একটির মাথা আরেকটির ওপর স্থাপন করে ভালোভাবে বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে দিন। আপনার খাঁচা যাতে স্রোতে ভেসে না যায় সে জন্য খাঁচাটিকে নোঙ্গর (anchor) করাতে হবে। নোঙ্গর কি দিয়ে বানাবেন তা নির্ভর করবে জলাশয়ের স্রোতের তীব্রতা ও পানির গভীরতার ওপর।

গ) **প্রজাতি নির্বাচন ও পোনা মজুদ ঃ** পুকুরে চাষযোগ্য যে কোন প্রজাতির মাছ আপনি খাঁচায় চাষ করতে পারেন। দ্রুত বর্ধনশীল ও যে কোন সাইজে বাজারজাত করা যায় এমন প্রজাতি নির্বাচন করাই বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু খাঁচায় মাছের চাষ একটি প্রায় নিবিড় পদ্ধতি তাই বড় আকারের পোনা মজুদ করা হয় এবং সাধারণত একক চাষই (monoculture) করা হয়। আপনি ইচ্ছে করলে মিশ্র চাষও (polyculture) করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রজাতি নির্বাচনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

পুকুরে সাধারণত যে ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হয় তার চেয়ে বেশি ঘনত্বে খাঁচায় পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে। মজুদ সংখ্যা নির্ভর করবে প্রজাতি ও সাইজের ওপর।

খাঁচায় মাছ চাষঃ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি সম্ভাবনা

তাপস কুমার রায়, জিয়াউল হক, নাসিম আহমেদ আলীম
কেয়ার-বাংলাদেশ, ঢাকা

কেন করবো?

এক সময় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে যে পরিমাণ মাছ আহরিত হতো, তাতেই আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটে যেতো। সময়ের আবর্তে দিন দিন বাড়ছে মানুষের সংখ্যা আর কমছে মাছ আহরণের পরিমাণ। আমাদের অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড জলাশয়ের পরিমাণ একদিকে যেমন কমাচ্ছে অপরদিকে তেমনি বাধা দিচ্ছে মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণে। পাশাপাশি নির্বিচারে চলছে মাছ আহরণ। এসবই মূলত এর জন্যে দায়ী। তাই আজ এসেছে মাছ চাষের কথা। ব্যাপক না হলেও বেশ সাড়া পড়েছে পুকুরে মাছ চাষের ব্যাপারে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে জনগোষ্ঠীর একাংশকে পুকুরে মাছ চাষের ব্যাপারে জড়িত করতে। তার কিছু কিছু সুফলও আমরা পেয়েছি ইতোমধ্যে।

আমাদের ব্যাপক জনগোষ্ঠী বাস করছে দারিদ্র্য সীমার নিচে। অনেকেরই কোন পুকুর নেই। এই ব্যাপক জনশক্তি বঞ্চিত হয়েছে মাছ চাষের মত একটি লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে শুধুমাত্র পুকুর নেই বলে। অন্যদিকে আমাদের রয়েছে উন্মুক্ত জলাশয় যা এখনও মাছ চাষের আওতায় আসেনি। এই জলাশয়ের আশেপাশে অসংখ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস।

খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে সম্ভব হবে এই উন্মুক্ত জলাশয় ও এই মানবসম্পদকে কাজে লাগানো। বাড়বে মাছের উৎপাদন, খুলে যাবে নতুন আয়ের পথ। শুধুমাত্র উন্মুক্ত জলাশয় নয়, কারিগরিগত, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যাগত কারণে যে সমস্ত পুকুর চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয় নি, সেই পুকুরসমূহও খাঁচায় চাষের মাধ্যমে মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে। ব্যাপারটা যে কাল্পনিক কিছু নয় তার নজির এশিয়াতেই আছে। আমাদের নিকটবর্তী দেশ যেমন ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে খাঁচায় মাছের চাষের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এমনকি আমাদের দেশেও এর প্রচলন শুরু হয়েছে, যদিও খুবই ক্ষুদ্র পর্যায়ে।

কোথায় খাঁচা স্থাপন করবেন?

নদীনালা, খালবিল, হাওরবাঁওড়, প্লাবনভূমি, সেচ প্রকল্পের খাল, লেক এবং পুকুর, যেখানে বছরে কমপক্ষে ৩-৪ মাস ৪ ফুট পানি থাকে এমন জলাশয়ে খাঁচা স্থাপন করে মাছ চাষ করা যায়। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী লোনাপানি অঞ্চলেও খাঁচা স্থাপন করে মাছ ও চিংড়ি চাষ করা সম্ভব।

কিভাবে করবেন?

ক) **খাঁচা তৈরি ঃ** একটি মশারিকে উল্টিয়ে ঝুলিয়ে দেলে যেমনটি হবে একটি খাঁচা দেখতে ঠিক তেমনই। এর আকৃতি (Shape) সাধারণত বর্গাকার বা আয়তাকার হয়ে থাকে। খাঁচা অন্যান্য আকৃতিরও হতে পারে। তবে আকৃতি ও আকার (Size) নির্ভর করবে মূলত কোথায় আপনি খাঁচা স্থাপন করবেন তার ওপর অর্থাৎ জলাশয়ের বৈশিষ্ট্য ও , আপনার উৎপাদন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার ওপর। তবে এটুকু বলা যায় যে তিন ফুট দৈর্ঘ্য, তিন ফুট প্রস্থ ও তিন ফুট গভীরতা সংবলিত খাঁচায় ও লাভ জনকভাবে মাছ চাষ করা সম্ভব।

খাঁচা সাধারণত জাল দ্বারা তৈরি করা হয়। তবে আপনি ইচ্ছে করলে তারের জাল, বাঁশের চাটাই অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক দ্রব্য ব্যবহার করতে পারেন। আপনাকে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে খাঁচায় ব্যবহৃত দ্রব্যটি যাতে পানিতে সহজে পচে না যায়, খাঁচার ভিতর দিয়ে পানি যাতে অবাধে প্রবাহিত হতে পারে এবং খাঁচার ছিদ্র এমন হয় যাতে মজুদকৃত পোনা মাছ খাঁচার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যেতে না

আনসার ও ভিডিপি সদস্যের দ্বারা পরিচালিত পেনে মোট ২০,০০০ পোনা মজুদ করে সর্বমোট ৯,৬৪০টি মাছ পাওয়া যায় অর্থাৎ গড়ে মাছ বাঁচার বা টিকে থাকার হার ছিল ৪৭%। চিংড়ি মাছের টিকে থাকার হার ছিল সবচেয়ে কম এবং বিগহেড কার্পের হার ছিল সবচেয়ে বেশি যা যথাক্রমে ৩০% এবং ৫৮%। এ পেন থেকে ১২০ কেজি অবাঞ্ছিত ছোট মাছসহ ৬ মাসে সর্বমোট ৩,৩৯৭ কেজি মাছ পাওয়া গিয়েছিল। এ উৎপাদন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সিআইপি খালের পার্শ্বে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন গ্রুপ তৈরি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে খাল ৫ বছরের জন্য লিজ নিয়ে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করছে।

উপসংহার

আমাদের দেশে বর্তমানে মৎস্যসম্পদে যে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য আমাদের পরিকল্পিতভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষভাবে নজর দেয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের প্রয়োজনীয় আমিষের ঘাটতি কোনভাবেই পূরণ করা সম্ভব হবেনা। শুধুমাত্র পুকুরে মাছ চাষ ও উন্মুক্ত জলাশয় হতে আহরিত মাছ দ্বারা দেশের মাছের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া শুধুমাত্র কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করে দেশের কার্যক্ষম সমস্ত লোকের কর্মসংস্থান করাও সম্ভব নয়। একই ভাবে শুধুমাত্র পুরুষ জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েই অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই মহিলা। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। গ্রামীণ বেকার যুবক ও মহিলাদের সম্পৃক্ত করে পেনে মাছ চাষ পদ্ধতিতে সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে। পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তি মৌসুমী এবং উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানসহ দেশে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। পেনে মাছ চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে মৎস্য অধিদপ্তর দেশে ৪৮টি জেলা সেচ প্রকল্পের খাল, বরোপিট খাল এবং রাস্তার পার্শ্বস্থ খালে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষের এক বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। উক্ত খালের পাশে বসবাসরত বেকার যুবক ও মহিলাদের নিয়ে গঠিত গ্রুপগুলোর কাছে ৫–৮ হেক্টর জায়গা শতাংশ প্রতি ৬ টাকা হারে ৫ বছরের জন্য লিজ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে অব্যবহৃত জলাশয় হতে মৎস্য উৎপাদনের এক বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে আগামীতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

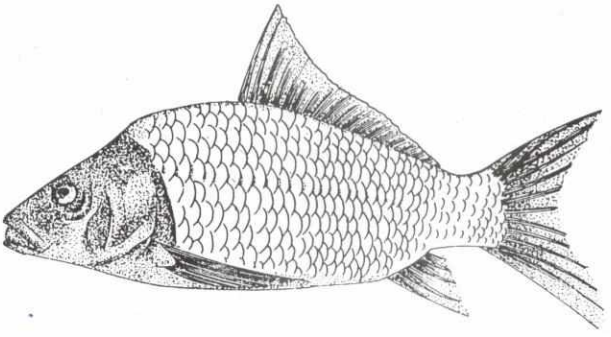

সারনি-৩। সিআইপি খালে ১৯৯৩ সনের বেকার যুবক দ্বারা পরিচালিত এক হেক্টর আয়তনের পেনে মোট মাছের উৎপাদন (মজুদ ঘনত্ব ২০,০০০/ হেক্টর)।

প্রজাতি	(%)	মজুদ সংখ্যা	হারভেষ্টকৃত মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	বাঁচার হার (%) একক	গড়	উৎপাদন কেজি/হেক্টর/ফসল	মোট উৎপাদন কেজি/হেক্টর/ফসল
রুই	৩০	৬,০০০	৩৫০	৫৮		৮২০	
মৃগেল	২০	৪,০০০	৪২৫	৫২		৬২০	
কাতলা	১০	২,০০০	৬৫০	৫৪	২৫	৬৮০	৩৬৬০
সিলভার কার্প	১০	২,০০০	৬৮০	৫৫		৭১০	
কার্পিও	৩০	৬,০০০	৫৭০	৩৯		৬৫০	
অবাঞ্ছিত মাছ						১৮০	

দশ জন বেকার যুবক কর্তৃক পরিচালিত পেনে মাছের উৎপাদন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যা সারণি-৩ এ সন্নিবেশ করা হলো। হেক্টর প্রতি ২০,০০০ ঘনত্বে মাছ মজুদ করে ৬ মাসে সর্বমোট উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে ৩,৬৬০ কেজি। এর মধ্যে ১৬০ কেজি অবাঞ্ছিত ছোট মাছ ছিল। প্রজাতি ভেদে রুই, মৃগেল, কাতলা, সিলভার কার্প ও কার্পিও বাঁচার বা টিকে থাকার হার ছিল যথাক্রমে ৫৮,৫২,৫৪, ৫৫ এবং ৩৯% যা গড়ে ৫২%। আহরণের সময় রুই ৩,৪৮০, মৃগেল ২,০৮০, কাতলা ১,০৮০, সিলভার কার্প ১,১০০ এবং কার্পিও ১,৩৪০ টি সর্বমোট ১০,০৮০টি মাছ পাওয়া যায়। মাছ চাষের সমায়ানুপাতে মাছের দৈহিক বৃদ্ধিও ছিল সন্তোষজনক। এই গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত পেনেও মাছের বাঁচার বা টিকে থাকার হার, নদী কেন্দ্র কর্তৃক গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে বেশি যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। মূলত চুরির হার কমে যাওয়ার জন্যই মাছের বাঁচার হার বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

সারণি-৪। সিআইপি খালে ১৯৯৩ সালে ভিডিপি,আনসার ও ইউপি সদস্য দ্বারা পরিচালিত এক হেক্টর আয়তনের পেনে মোট মাছের উৎপাদন (মজুদ ঘনত্ব ২০,০০০/ হেক্টর)।

প্রজাতি	(%)	মজুদ সংখ্যা	হারভেষ্টকৃত মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	বাঁচার হার (%) একক	গড়	উৎপাদন কেজি/হেক্টর/ফসল	মোট উৎপাদন কেজি/হেক্টর/ফসল
রুই	২০	৪,০০০	৩৫৫	৫৪		৬৮০	
মৃগেল	১০	২,০০০	৩৩০	৪৯		২৯৭	
কাতলা	২০	৪,০০০	৫৫০	৫০		৭২০	
সিলভার কার্প	১০	২,০০০	৬৯০	৫১	৪৭	৬০০	৩৩৯৭
কার্পিও	১০	২,০০০	৪২০	৩৮		২৯৪	
গ্রাসকার্প	১০	২,০০০	৫২৫	৪৮		৪২০	
বিগহেড	১০	২,০০০	২১০	৫৮		২০০	
গলদা চিংড়ি	১০	২,০০০	১১০	৩০		৬০	
অবাঞ্ছিত মাছ						১২০	

মূলধন খরচ	মূল্য (টাকা)
খ) বাঁশের বানা (২ বৎসর আয়ুস্কাল) (২৫ মিটার x ৩ মিটার)	৪,৫২৩.০০
গ) বাঁশের খুঁটি (আয়ুস্কাল ২ বৎসর)	৯২৫.০০
ঘ) গীটবিহীন জাল (পাঁচ বছর আয়ুষ্কাল) (প্রতি মিটার ৩৫ টাকা)	৭০০.০০
মোট মূলধন খরচ	**৬,৫২৩.০০**
পরিচালন ব্যয় ঃ	
ক) পোনা মাছের মূল্য	৪,০০০.০০
খ) মাছের খাদ্যের মূল্য	৩,৩৪৪.০০
মোট পরিচালন ব্যয়	**৭,৩৪৪.০০**
আয় (মাছ বিক্রি)	
উৎপাদিত রুই জাতীয় মাছ (৭০৯ কেজি) ৬৫ টাকা প্রতি কেজি	৪৬,০৮৫.০০
উৎপাদিত পাঙ্গাস মাছ (১৯১ কেজি) ৮৮ টাকা প্রতি কেজি	১৬,৮০৮.০০
অবাঞ্ছিত মাছ (৬০ কেজি) ৩০ টাকা প্রতি কেজি	১,৮০০.০০
মোট আয় ঃ	**৬৪,৬৯৩.০০ টাকা**
প্রকৃত মুনাফা (আয়-ব্যয়)	৫০,৮২৬.০০ টাকা

গ্রামের এই দরিদ্র মহিলারা অত্যন্ত উৎসাহ ও নিপুণতার সাথে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন। বানা তৈরি, জাল সেলাই, আগাছা দমন, মাছের খাবার ও পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে পুরুষদের চেয়েও অভিজ্ঞ। নিজেরা এক জোট হয়ে কাজ করে এবং অন্যান্য সামাজিক অসুবিধা যেমন চুরি ইত্যাদির হারও মহিলাদের মাঝে কম। একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নদীকেন্দ্র কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত পেনের চেয়ে গ্রামীণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পেনে মাছ বাঁচা বা টিকে থাকার হার অনেক বেশি। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, পেন পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই। স্থানীয় লোকজন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হলে মাছ চুরির হার কমে যায় ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দরিদ্র জনগণ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই সমগ্র বাংলাদেশে ৪৮টি জেলায় যে সেচ প্রকল্পের খাল রয়েছে তাতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষের এক বিরাট উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বেকার যুবক ও আনসার/ভিডিপি সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত পেন

সিআইপি খালের পার্শ্বে বসবাসরত ১০ জন বেকার যুবক নিয়ে ১টি গ্রুপ করা হয়। বহরিয়া থেকে লক্ষ্মীপুর গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় এক হেক্টর আয়তনের ১টি পেন নির্মাণ করা হয়। পেন নির্মাণের জন্য মহাল বাঁশের বানা, বরাক বাঁশের খুঁটি ও গীটবিহীন জাল (মেস সাইজ-১০.৫ মি.মি) ব্যবহার করা হয়। রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প এবং কার্পিও ৩০ঃ২০ঃ১০ঃ১০ঃ৩০ অনুপাতে ১ হেক্টর পেনে ২০,০০০ পোনা মজুদ করা হয়। সে মোতাবেক রুই ৬,০০০, কাতলা ২,০০০, মৃগেল ৪,০০০, সিলভার কার্প ২,০০০ এবং কার্পিও ৬,০০০ মজুদ করা হয়। মাছগুলোকে প্রতিদিন মোট ওজনের শতকরা ১ ভাগ হারে খৈল (৫০%) এবং কুঁড়ার (৫০%) মিশ্রণে তৈরি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। সারণি- ৩। এ বেকার যুবক দ্বারা পেনে মাছের উৎপাদন সংক্রান্ত উপাত্ত পরিবেশিত হলো। অনুরূপভাবে ১০ জন ইউপি এবং আনসার/ভিডিপি সদস্যদের নিয়ে ১ হেক্টর আয়তনের একটি পেন তৈরি করা হয়। পেনে রুই, মৃগেল, কাতলা, সিলভার কার্প, কার্পিও, গ্রাস কার্প, বিগহেড কার্প এবং গলদা চিংড়ি ২০ঃ১০ঃ২০ঃ১০ঃ১০ঃ ১০ঃ১০ঃ১০ অনুপাতে সর্বমোট ২০,০০০ পোনা মজুদ করা হয়। তারমধ্যে ছিল রুই ৪,০০০, মৃগেল ২,০০০, কাতলা ৪,০০০, সিলভার কার্প ২,০০০, গ্রাস কার্প ২,০০০, কার্পিও ২,০০০, বিগহেড কার্প ২,০০০ এবং গলদা চিংড়ি ২,০০০। পেনে প্রতিদিন মোট মাছের ওজনের শতকরা ১ ভাগ হারে খৈল এবং কুঁড়ার (৫০%) মিশ্রণে তৈরি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। সারণি-৪ এ মাছের উৎপাদনসহ আনুসঙ্গিক বিষয় উপস্থাপন করা হলো। যাবতীয় কর্মকাণ্ড যেমন পেন তৈরি, আগাছা ও রাক্ষুসে মাছ দমন, পাহারা, মাছের খাবার ও পরিচর্যা ইত্যাদি গ্রুপ সদস্যদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়।

সরপুঁটি, পাঙ্গাস যথাক্রমে ৩৩ঃ২৫ঃ৩৪ঃ৮ হারে মজুদ করা হয়েছিল। উক্ত পেনে হেক্টর প্রতি ২৪,০০০ হাজার পোনা হিসেবে ০.২৫ হেক্টর পেনে সর্বমোট ৬০০০ পোনা মজুদ করা হয়। তার মধ্যে ছিল ২,০০০ রুই, ১,৫০০ মৃগেল, ২,০০০ সরপুঁটি এবং ৫০০ পাঙ্গাস।

সেচ প্রকল্পের খাল, হ্রদ, নদনদীর খাড়ি ইত্যাদি এলাকার পানি অত্যন্ত উর্বর এতে প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য থাকলেও শুধুমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায় না। কারণ পেনে মাছের মজুদ ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। এজন্য পেনে মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ১-২% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের হার কম বা বেশি হতে পারে। মহিলা গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত পেনে মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ১% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত সম্পূরক খাদ্যের অনুপাত ছিল যথাক্রমে খৈল ৫০% এবং চালের কুঁড়া ৫০%।

পেনে জাল টেনে মাসে কম পক্ষে একবার মাছের বৃদ্ধি ও রোগবালাই পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং মাছের নমুনা সংগ্রহ করে মাছের বৃদ্ধি অনুযায়ী সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ সমন্বয় করে বর্ধিত হারে খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও পেনের বেড়া বা জালে কোনরূপ ক্ষতি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

মাছের উৎপাদন

মহিলা গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত পেনে মাছের উৎপাদন অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। সারণি-১ এ উক্ত পেনে উৎপাদনের ফলাফল বর্ণনা করা হলো। মাছ আহরণের সময় ১,০৩৫টি রুই, ১,০২৮টি মৃগেল, ১,২০৫টি সরপুঁটি এবং ৩৯৬ টি পাঙ্গাস সহ সর্বমোট ৩,৬৬৪ টি মাছ পাওয়া যায়। পেনে মাছ বাঁচার বা টিকে থাকার হার ছিল রুই ৫১.৭৫%, মৃগেল ৬৮.৫৩%, সরপুঁটি ৬০.২৫% এবং পাংগাস ৭৯.২০% যা গড়ে ৬৫%। ফলে প্রজাতি ভিত্তিক রুই ২৮২.৬০, মৃগেল ৩০৩.৮১, সরপুঁটি ১২২.৬০ এবং পাঙ্গাস ১৯১.২৫ কেজি উৎপন্ন হয়। উল্লেখিত মাছ ছাড়াও ৬০.৬০ কেজি অবাঞ্ছিত ছোট মাছ পাওয়া যায়। সর্বমোট মাছের উৎপাদন ছিল ৬ মাসে ৯৬০.৮৬ কেজি যা প্রতি ফসলে হেক্টর প্রতি দাঁড়ায় ৩,৮৪১ কেজি।

সারণি - ১। সিআইপি খালে ১৯৯৪ সালে ভূমিহীন মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ০.২৫ হেক্টর আয়তনের পেনে মাছের উৎপাদন। (মজুদ ঘনত্ব ২৪,০০০/ হেক্টর)

প্রজাতি	(%) গড় ওজন (গ্রাম)	মজুদ সংখ্যা একক	হারভেষ্টকৃত মাছের গড়	বাঁচার কেজি/পেন/ফসল	হার (%) কেজি/পেন/ফসল	উৎপাদন	মোট উৎপাদন
রুই	৩৩	২০০০	৩৯৫	৫১.৭৫		২৮২.৬০	
মৃগেল	২৫	১৫০০	৩১৪	৬৮.৫৩	৬৫	৩০৩.৮১	৯৬০.৮৬
সরপুঁটি	৩৪	২০০০	২১৫	৬০.২৫		১২২.৬০	
সূচী পাঙ্গাস	০৮	৫০০	৪৯৯	৭৯.২০		১৯১.২৫	
অবাঞ্ছিত মাছ						৬০.৬০	

উক্ত পেনে মাছ উৎপাদন কার্যক্রমের আয়-ব্যয় সারণি-২ এ উপস্থাপন করা হলো। রুই জাতীয় মাছ প্রতি কেজি ৬৫ টাকা, পাঙ্গাস ৮৮ টাকা এবং অবাঞ্ছিত মাছ ৪০ টাকা হারে বিক্রয় করা হয়। পেনের জায়গাটি শতাংশ প্রতি বছরে ৬ টাকা হারে ৫ বৎসরের পওনি নেয়া হয় এবং আয়ুষ্কাল হিসেবে বাঁশ বানা, বেড়া, জাল ইত্যাদির জন্য মোট খরচ বছর প্রতি দেখানো হয়েছে।

সারণি- ২। মহিলা গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত ০.২৫ হেক্টর আয়তনের পেনে আয়-ব্যয়।

মূলধন খরচ		মূল্য (টাকা)
ক)	জলাশয়ের (৫ বছরের জন্য)	
	শতাংশ ৬ টাকা হারে প্রতি বছর	৩৭৫.০০

পেনে মাছ চাষ সম্প্রসারণ

জুবাইদা নাসরীন আখতার ও
মোঃ রবিউল আউয়াল হোসেন,
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, চাঁদপুর

নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ আবহমান কাল থেকে অভ্যন্তরীণ জলসম্পদে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ। নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর এবং বন্যাপ্লাবিত জলাভূমি ইত্যাদি নিয়ে ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জলরাশিতে মৎস্য উৎপাদনে সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বর্তমানে দৈনন্দিন চাহিদার ৮০% ভাগ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ সহ জিডিপি শতকরা ৩.৫ ভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শতকরা ৯ ভাগ মৎস্যসম্পদ থেকে আসছে। তাছাড়া ১.৪ মিলিয়ন লোকের সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থানসহ মোট জনসংখ্যর শতকরা ১০ ভাগ লোকের খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের উৎস হচ্ছে এই মৎস্য সেক্টর। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৩ ভাগ কোন না কোন ভাবে মৎস্যচাষ, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদির সাথে জড়িত। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, উন্মুক্ত জলাশয়ে দিন দিন মাছের উৎপাদন কমে আসছে, ফলে আমিষজনিত পুষ্টির অভাব প্রকট হয়ে উঠছে, অথচ সুষ্ঠু পরিকল্পনা, লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিরাট জলরাশি থেকে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব। আপাতঃদৃষ্টিতে উন্মুক্ত জলাশয়ে নিবিড়/আধানিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর ১৯৯০ থেকে উল্লেখিত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ মৎস্য উৎপাদনের নিমিত্ত লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয় এবং সফলতা অর্জন করে। পেন বা ঘের তৈরি করে উল্লেখিত জলাশয়ে নিবিড়/আধানিবিড় পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের খালে, মরা নদীতে, হাওর, বাঁওড়, বন্যাপ্লাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়নোসহ বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে চাঁদপুরস্থ সেচ প্রকল্পের খালে ৭টি পেনে মাছ চাষ করে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। পেন ভেদে ৬ মাসে হেক্টর প্রতি গড়ে ২.৫ থেকে ৩.৫ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে খালের পার্শ্বস্থ জনগণ ২০টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ৬২ মাইল দীর্ঘ সিআইপি খালে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষের এক শুভ সূচনা করেছেন এবং প্রাথমিকভাবে এতে সফলতা অর্জন করেছেন নদী কেন্দ্রের কারিগরি সহায়তায় এবং গ্রামীণ বেকার যুবক, মহিলা, ইউপি সদস্য এবং আনসার/ভিডিপি সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ৩টি পেনে মাছ চাষের সফলতা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যা তাদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে।

ভূমিহীন মহিলা কর্তৃক পরিচালিত পেন

সিআইপি খালের পার্শ্বে বসবাসরত ১৫ জন দরিদ্র মহিলা নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করা হয় এবং খালের লক্ষ্মীপুর গ্রামের পার্শ্বস্থ ০.২৫ হেক্টর এলাকায় একটি পেন নির্মাণ করা হয়। পেন নির্মাণে বাঁশের বেড়া/বানা, খুঁটি গীটবিহীন পলিথিন জাল, টায়ার কর্ডের জাল, জিআই, তার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গীটবিহীন জাল ও বানার নিম্নাংশের ১-২ ফুট মাটিতে পুঁতে দেয়া হয় যাতে মাছ পেন থেকে বের হয়ে যেতে না পারে এবং অবাঞ্ছিত মাছ পেনে প্রবেশ করতে না পারে। পেন তৈরির পর ছোট ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং আগাছা পরিষ্কার করা হয়। চাষের জন্য প্রজাতি নির্বাচন এমনভাবে করা হয় যাতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পানির সকল স্তরের খাবার খায়, যাদের খাদ্য শিকল সংক্ষিপ্ত, কমদামি খাবার খায় এবং যাদের পোনা সহজলভ্য এবং অল্প সময়ে চাষ করে বিক্রয় উপযোগী করা যায়। এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের দেশের স্বাদুপানি এবং সেচ প্রকল্পের খালের জন্য রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কাপ, রাজপুঁটি, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া অত্যন্ত উপযোগী বিবেচিত হয়েছে। মহিলা গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত পেনে হেক্টর প্রতি ৩-৪″ সাইজের ২৪,০০০ পোনা মজুদ করা হয়েছিল। রুই, মৃগেল,

সহায়ক। উন্নত জাতের গরুর জন্য সবুজ ঘাসের প্রয়োজন। সাধারণত একটি গরুর জন্য ০.১৫-০.২০ একর ঘাসের জমিতে উন্নত জাতের যেমন নেপিয়ার, এ্যালিফেন্ট, সুদান, পারা প্রভৃতি ঘাস চাষ করতে হয়। ঘাস ছাড়াও উন্নতমানের শুষ্ক খাদ্যের সংস্থান রাখতে হবে।

পুকুর ব্যবস্থাপনা ঃ মাছের পুকুর ব্যবাপনা হাঁস বা মুরগির সাথে মাছ চাষের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে এক্ষেত্রেও তেমনটি হবে। পুকুর প্রস্তুতিসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি সম্পাদনের পর পানিপূর্ণ পুকুরে নিম্নলিখিত হারে প্রতি শতাংশে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০-১৫ সে.মি. আকারের ২৫-৩০ টি রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করতে হবে।

পোনা মজুদের শতকরা হার	
সিলভার কার্প	৩০%
বিগহেড কার্প	৫%
কাতলা	১৫%
রুই	২০%
মৃগেল	১৫%
মিরর/ কমন	১০%
গ্রাস কার্প	%%

এগুলোর সাথে প্রতি শতাংশে ২০০-৩০০ টি রাজপুঁটির পোনা (৫-৮ সে.মি. আকারের) মজুদ করা যায়। ফলে ৩-৪ মাসেই একটি বাড়তি ফলন পাওয়া যায়।

উৎপাদন ও আয় - ব্যয় ঃ গরু ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে অবশ্যই উন্নত জাতের দুধেল গরু পালন করতে হবে। ১ হেক্টর পুকুরের জন্য পালিত দুটো গরুর থেকে বছরে প্রায় ৭০০০-৮০০০ লিটার দুধ এবং সেই সঙ্গে দুটো বাচ্চা পাওয়া যাবে। গরুর পরিচর্যা ব্যয় মিটিয়েও প্রায় ২০-৩০% লাভ থাকে। অপর দিকে দুটো গরু ও বাচ্চা দু'টো পুঁজিকৃত মূলধন ফেরতের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দেয়। আর ১ হেক্টর পুকুরে বছরে প্রায় ৪০০০-৪৫০০ কেজি মাছ অত্যন্ত কম ব্যবস্থাপনা ব্যয়ে উৎপন্ন হতে পারে, যা থেকে প্রায় ১,২০,০০০- ১,৩৫,০০০ টাকা আয় সম্ভব।

ধানক্ষেতে মাছ চাষ

এটি একটি অত্যন্ত ফলপ্রসু সমন্বিত চাষ পদ্ধতি। এটি কৃষি ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

স্থান নির্বাচন ও জমি তৈরি ঃ সমতল নিচু জমিতে আল বেঁধে ৩০-৪০ সে.মি. পানি ধারণের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর প্রায় আধ মিটার গভীর ও ১ মিটার চওড়া আড়াআড়ি কিংবা চারিপাশ দিয়ে নালা কাটতে হয়। নালাগুলোর মাথায় গভীরতা কিছুটা বেশি রাখা দরকার।

ধান রোপণ ঃ লাঙ্গল দিয়ে জমি প্রস্তুতের পর তাতে সার ও পানি দিয়ে ধান লাগাতে হবে। এ ধরনের চাষে উন্নত জাতের ধান রোপণ করা দরকার। স্বাভাবিক ধান রোপণের নিয়মের চেয়ে এক্ষেত্রে ধানের গোছাগুলো একটু ফাঁক করে লাগানো হয়। এমনিভাবে ধান লাগানোর পর ধানগুলো একটু বড় হলে জমিতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে তাতে মিররকার্প, থাই সরপুঁটি, নাইলোটিকা বা মাগুর মাছের পোনা ছাড়া হয়। এগুলো অল্প পানিতে মোটামুটি ভাল জন্মে। পোনা ছাড়ার পর জমিতে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

কোন কোন জমিতে ধান কেটে নেয়ার পর তাতে পানি দিয়ে, সাময়িক পুকুর বানিয়ে স্বল্প সময়ে বিক্রিযোগ্য হয় এমন প্রজাতির মাছের চাষ করা যায়। মাছের বৃদ্ধির অবস্থা অনুযায়ী নালাগুলোর মধ্যে কিছু সম্পূরক খাদ্য দেয়া যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে ধানের যে ফলন হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়। বরঞ্চ প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০০-৬০০ কেজি মাছের বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায় যা বাড়তি আয় হিসেবে বিবেচিত।

মাছ ও ক্ষুদে পানার (duckweed) সমন্বিত চাষ

এদেশে পরীক্ষামূলকভাবে এধরনের চাষ পদ্ধতি শুরু করে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে। যে জলাশয় মাছ চাষের উপযোগী নয়, ছোট এবং বদ্ধ জৈব উপাদানে ভরপুর হাজা-মজা এসব জলাশয়ে ক্ষুদে পানা উৎপাদন করে তা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে মাছ চাষের ব্যয় কমানো ও উৎপাদন বাড়ানো যায়। ক্ষুদে পানার চাষকৃত এক হেক্টর জলাশয় হতে প্রতিদিন ৭০০ কেজি ক্ষুদে পানা সংগ্রহ করা যেতে পারে, যা ১ হে. পুকুরে মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ক্ষুদে পানার সমন্বিত মৎস্যচাষ বছরে হেক্টর প্রতি ১০-১১ টন মাছ উৎপাদন হয়। শুধু ব্যবস্থাপনায় এই উৎপাদন আরো বাড়ানো যায়।

তৈরি করা যায়। পুকুরের ওপর ঘর তৈরি করলে মেঝেটি বাঁশের পাতা দিয়ে তৈরি করা যায়, যাতে বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট সরাসরি পানিতে পড়ে।

হাঁসের সংখ্যা ঃ প্রতি হেক্টর জলায়তনের পুকুরের জন্য ৬০০-৮০০ টি (কারো কারো মতে ২০০-৩০০ টি) হাঁস পালন করা যেতে পারে। তবে পাড় স্থাপন করলে সংখ্যা কিছুটা বেশি হতে পারে। একটি হাঁস বছরে প্রায় ৬০-৭০ কেজি বিষ্ঠা ত্যাগ করে যা প্রায় ৩-৪ কেজি মাছ উৎপাদনে সহায়ক।

প্রজাতি ঃ হাঁসের মাংসের চেয়ে ডিমের চাহিদা বেশি। সে জন্য যে প্রজাতির হাঁস বেশি ডিম দেয় সেই প্রজাতি পালন করা উচিত। খাঁকি কেম্বেল, ইন্ডিয়ান রানার বছরে ২৫০-৩০০ ডিম দেয়। এগুলোর নির্বাচন যুক্তিযুক্ত। এ ছাড়া সিলেট মেটে, নাগেশ্বরী জাতের হাঁসও পালনের উপযোগী।

হাঁস পালন ব্যবস্থাপনা ঃ এ ব্যাপারে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন নির্দেশিকা অনুসরন করে খাবার, রোগবালাই প্রতিরোধ ইত্যাদি পরিচর্যার কাজ সম্পাদন করতে হবে।

মৎস্য পুকুর ব্যবস্থাপনা ঃ মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে যেভাবে পুকুর ব্যবস্থাপনা করা হয় সেক্ষেত্রেও তদ্রুপ করনীয়। ৩-৪ মাস পর পর পুকুরে বিঘা প্রতি ১৫-১৬ কেজি চুন প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

উৎপাদন ঃ প্রতি হেক্টর পুকুরে বছরে ৩৫০০-৪৫০০ কেজি মাছ ৯০,০০০-১,২৫,০০০ হাঁসের ডিম এবং ৫০০-৭০০ কেজি হাঁসের মাংস (তাজা অবস্থায়) উৎপন্ন হতে পারে।

আয় ঃ হাঁস মাছের সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে পরিচালনা ব্যয়ের ওপর লাভের হার প্রায় শতকরা ৪৭ ভাগ।

মাছ ও গবাদি পশুর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

পশুপাখির পরিত্যক্ত মলমুত্রের মধ্যে গরু থেকে উৎপাদিত মলমূত্রের পরিমাণ অনেক বেশি। একটি ৪৬০ কেজি ওজনের গরু বছরে ১৩,৬০০ কেজি গোবর এবং ৯০০০ কেজি প্রস্রাব ত্যাগ করে। চীনে একটি গবেষণায় দেখা গেছে গোবর সার দিয়ে পরিচর্যা করা পুকুরে মাছের উৎপাদন গোবর ব্যবহার না করা পুকুর থেকে ২.২-৩.৫ গুণ বেশি। হাঁস-মুরগির বিষ্ঠার চেয়ে গোবরের কণাগুলো বেশি সময় পানিতে ভাসতে থাকে। ফলে মাছের কিয়দংশ খাবার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তাই পানিতে জৈব সার পচনের জন্য অক্সিজেনের চাহিদা গোবর সারের ক্ষেত্রে অনেকাংশে কম।

গরুর ঘর নির্মাণ ঃ পুকুরে সার বা গোবর পরিবহণের ব্যয় কমানোর জন্য গরুর ঘর পুকুর পাড়ে করা যেতে পারে। তবে গরুর নিরাপত্তা না থাকলে তা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। পাড়ে নির্মিত গোয়াল ঘর থেকে নালার (drain) মাধ্যমে গোবর ও চেনা (গোমূত্র) সরাসরি পুকুরে নেয়া যায়। তবে তা সমভাবে পুকুরের সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ায় কার্যকারিতা কমে যায়। সার ও চেনা গোয়ালঘর থেকে সংগ্রহ করে পুকুরের সর্বত্র ছিটিয়ে দেয়া ভাল। গোয়াল ঘর থেকে সরাসরি পরিত্যক্ত পদার্থগুলো পুকুরে পড়লে সেক্ষেত্রে ১ হেক্টর মৎস্য-পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য দুটো গরুই যথেষ্ট। তবে খামারে পুকুর থেকে দূরে বা অন্যত্র গরু পালন করলে গরুর সংখ্যা পুকুরের আয়তনের ওপর নির্ভরশীল হবে না।

সার প্রয়োগ বিধি ঃ সারের কার্যকারিতার ওপর সারের প্রয়োগ মাত্রা ও সময় নির্ভরশীল। সারের কার্যকারিতা মৌসুমের সাথে পরিবর্তনীয়। শীতকালে ৫-৭ দিন অন্তর অন্তর, গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন অল্প অল্প করে এবং শরতে ২/৩ দিন পর পর সার দিতে হয়। পুকুরের পানিতে জীবকনার প্রাচুর্যের ওপর তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এ সার প্রয়োগের নিয়ন্ত্রণ তখনই সম্ভব যখন গরুর গোয়াল পুকুর থেকে দূরে অর্থাৎ গোবর ও চেনা সরাসরি পুকুরে পড়ে না।

গোবর প্রয়োগকৃত পুকুরে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্যের সম্ভাব্য পরিমাণ ঃ

উদ্ভিদ কণা	১৯.১৫ মি. গ্রা./লিটার
প্রাণিকণা	৫.৬১ মি. গ্রা./লিটার
ব্যাকটেরিয়া (সংখ্যা)	৫.১৮স১০^{৪}/ মি.গ্রা
জৈব পদার্থ	৬৪.৪৪ মি.গ্রা/লিটার

গরুর পরিচর্যা ঃ আলো-বাতাস লাগে এমন স্থানে গোয়াল ঘর করতে হবে। উন্নত জাতের গরু লালনপালন করলে দুধ ও মাংস বেশি পাওয়া যায়, পাশাপাশি গোবরের পরিমাণও বেশি পাওয়া যায়, যা পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য

ব্রয়লারের সংখ্যা ২-৩ গুণ বেশী রাখতে হবে। তারপর সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে পুকুরের প্রয়োজনীয় পরিমাণে রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রতি হেক্টর পুকুরের জন্য ৫০০-৬০০ টি। প্রথমে যদি ব্রয়লারের সংখ্যা বেশি না রাখা হয় এতে পুকুরের মাছের জন্য পরিপূরক হিসেবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন। লেয়ার মুরগির জন্য এত সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন পড়ে না। লেয়ার মুরগি বড় অবস্থাতে অনেক দিন লালন পালন করা যায়।

পুকুরে মজুদের জন্য পোনার সংখ্যা ঃ পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ না করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা আধানিবিড় পর্যায়ে রেখে মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষ করলে বিঘা প্রতি (১৩৩৩ বর্গ মিটার) প্রথম ৮০০-১০০০ টি কার্প জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মিরর কার্প ইত্যাদি) ১০-১৫ সেমি আকারের পোনা মজুদ করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির পোনার হার নিম্নরূপ ঃ-

মাছের প্রজাতি	শতকরা হার
সিলভার কার্প	৩০
কাতলা	১০
রুই	২৫
মৃগেল	২০
গ্রাস কার্প	১০
মিরর/কমন কার্প	৫
	১০০

বাড়তি কিছু উৎপাদনের জন্য এই পরিমাণ পোনার সাথে ৩০০-৪০০ টি রাজপুঁটির পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

রুই জাতীয় মাছ ছাড়াও মুরগির সাথে নাইলোটিকার সমন্বিত চাষও করা যায়। প্রতি শতাংশে ১০০টি মাগুরের পোনা মজুদ করলে এই সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে ২$\frac{১}{২}$ - ৩ মাসেই তা বিক্রীযোগ্য আকারের হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত অতিরিক্ত খাবার দেবার প্রয়োজন পড়ে না। প্রতি চাষে (৩ মাসের) বিঘা প্রতি ৭০০-৮০০ কেজি মাগুর মাছ উৎপন্ন হতে পারে।

মুরগির ব্যবস্থাপনা ঃ ব্রয়লার কিংবা ডিমপাড়ার মুরগির সুষ্ঠু পরিচর্যা নিশ্চিত করা অবশ্যই প্রয়োজন। ব্রয়লার মুরগি যেন ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি ১.৫ কেজির বেশি ওজনের হয় এবং ডিমপাড়া মুরগিগুলোর মধ্যে যেন প্রতদিন শতকরা ৭৫-৮০টি মুরগি ডিম দেয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য পশুসম্পদ কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থাপনা কাজ পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। ব্রয়লারের বৃদ্ধি কিংবা মুরগির ডিমপাড়ার হার কমে গেলে লাভের সম্ভাবনা কমে আসবে।

উৎপাদন ঃ মাছ ও মুরগি সমন্বিত মাছ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন মাছ এবং ৬০-৭০,০০০ ডিম ও ১৫০০-২০০০ কেজি মুরগির মাংস (ব্রয়লার) উৎপাদন হতে পারে।

সমন্বিত মাছ চাষে মুলধন বিনিয়োগের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে লাভের পরিমাণ পরিচালনা ব্যয়ের ওপর ৫৪-৬০%।

হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ

মাছ ও হাঁসের সমন্বিতচাষ মুরগি-মাছ এর সমন্বিত চাষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুরগির বিষ্ঠার চেয়ে হাঁসের বিষ্ঠার উপাদানগুলোর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। হাঁস একটি বাড়তি সুবিধা প্রদান করে তা হলো পুকুরের তলা থেকে খাবার সংগ্রহকালে তা নাড়া দিয়ে পানির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ায়।

হাঁসের ঘর নির্মাণ ঃ সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে হাঁসের ঘর তিনভাবে নির্মাণ করা যেতে পারে যেমন-

১) পুকুরের ওপর ঘর করে পুকুরের কিয়দংশ হাঁসের সাঁতারের বা বিচরণের জন্য জায়গা ঘিরে দেয়া। সেই সঙ্গে ঘর থেকে পুকুরের পানিতে নামার সিঁড়ি করে দেয়া। এই ধরনের ঘরে হাঁসের বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট সরাসরি পুকুরে পড়বে।

২) পুকুরের পাড়ের ওপর হাঁসের ঘর করে পানির অংশ বিশেষ ঘিরে বিচরণক্ষেত্র তৈরি করা। এক্ষেত্রে পাড়ে একটি করে পিট বা গর্ত তৈরি করে সেখানে হাঁসের ঘর থেকে সংগৃহীত বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট জমা রেখে পরিমাণ মত পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়।

হাঁস যেহেতু দিনের অধিকাংশ সময় পানিতেই বাস করে সেহেতু পুকুরের আশেপাশেই ঘর তৈরি বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি হাঁসের জন্য ৩ বর্গফুট স্থান হিসেবে ঘর তৈরি করা যেতে পারে। হাঁসের ঘর সাধারণত বাঁশ, টিন, ছন দিয়ে

কিংবা পাড়ের ওপর জমিতে মুরগির ঘর তৈরি করে সেখানে মুরগি প্রতিপালন করে তার বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য পুকুরে নিয়মিত প্রয়োগের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা যায়। অপর দিকে পুকুরের ওপরেই মুরগির ঘর তৈরি করে সেখানে মুরগি প্রতিপালনের মাধ্যমে তা রাখা যায়। এক্ষেত্রে বাড়তি জমির বা জায়গার প্রয়োজন হয় না। বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট পরিবহণ ও প্রয়োগের জন্য লোকের প্রয়োজন হয় না। দ্রব্যগুলোর অপচয়ও হয়না। ব্যবস্থাপনা ব্যয়ও কিছুটা হ্রাস পায়। তবে গ্রামীণ পরিবেশে পারিবারিক পুকুরে এ ধরনের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিরাপত্তার দিক থেকে নিরাপদ নয়। এছাড়াও পুকুরের পানির গুণাগুণ হঠাৎ প্রতিকূল হয়ে পড়লে মুরগির ঘর হতে বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্টের পতন নিয়ন্ত্রণ করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিতে পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো পুকুরের একই স্থানে স্তুপকারে জমে কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কমিয়ে ফেলে। তবে মাগুর মাছের ক্ষেত্রে এ অবস্থা কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

পুকুর নির্বাচন ঃ মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষের জন্য একেবারে ছোট আকারের পুকুর উপযোগী নয়। এতে পানির গুনাগুণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। পুকুর বা খামার উঁচু জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে বন্যার এবং বৃষ্টির পানিতে মাছ ও মুরগির ক্ষতি না হয়। মুরগির জন্য সাধারণত শুষ্ক স্থান বাঞ্ছনীয়। বসতবাড়ির নিকটে অবস্থিত পুকুর মুরগি ও হাঁসের সাথে মাছের সমন্বিত চাষের বিশেষ উপযোগী।

মুরগির ঘর ঃ মুরগির ঘর আলো বাতাস লাগে এমন স্থানে হওয়া উচিত। প্রতিটি ব্রয়লার মুরগির জন্য ১-১.৫ বর্গফুট এবং ডিম পাড়া মুরগির জন্য ২-২.৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। বাঁশ ও ছন দিয়ে কম খরচে এ ঘর তৈরি করা যায়। পুকুরের উপর ঘর করলে মেঝের বাতার ফাঁক এমনভাবে রাখতে হবে যাতে খাবরের উচ্ছিষ্ট ও বিষ্ঠা সরাসরি পানিতে পড়তে পারে।

মুরগির প্রজাতি ঃ সমন্বিত মাছ চাষের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে সার্বিক লাভের পরিমাণ বাড়ানো। তাই মুরগির প্রজাতি নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ন। মাংস ও ডিম যথেষ্ট পরিমাণে না পেলে মুরগি পালনে যে ক্ষতি হবে তা মাছ চাষ থেকে পূরণ করতে সার্বিক লাভ অনেকাংশে কমে যাবে। ব্রয়লার হিসেবে সেভার স্টার ব্রো ১৫, এবং ডিম পাড়ার মুরগি হিসেবে হোয়াইট লেগহর্ণ, ইসা ব্রাউন, স্টার ক্রস, হাই সেক্স, লোম্যান, ইত্যাদি ভাল। আজকাল অনেক বেসরকারি মুরগির হ্যাচারি হয়েছে। এসব হ্যাচারি ছাড়া সরকারি হ্যাচারি থেকেও মুরগির বাচ্চা সংগ্রহ করা যায়।

মুরগির সংখ্যা ঃ মুরগির সংখ্যা নির্ভর করে পুকুরের জলায়তনের ওপর। মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি পুকুরে পতনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে সেক্ষেত্রে পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য যে পরিমাণ জৈব সারের প্রয়োজন পড়বে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুরগির সংখ্যা নিরূপন করতে হয়। অতিরিক্ত বিষ্টা ও উচ্ছিষ্ট পানিতে জমা হলে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে মাছের ক্ষতি করতে পারে। একটি ব্রয়লার মুরগি সাধারণত ৩-৪ মাসের উৎপাদনকালে ৩-৪ কেজি বিষ্টা ত্যাগ করে। এক হেক্টর জলায়তনের পুকুরের জন্য ৫০০-৬০০ টি ডিমপাড়া মুরগি পুকুরের ওপর নির্মিত ঘরে পালন করলে পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য কোন প্রকার সার ও সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না। পুকুরের পাড়ে কিংবা নিকটস্থ খামারে মুরগি পালন করে তার বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট মাছ চাষে ব্যবহার করা হলে এক্ষেত্রে যে কোন সংখ্যক মুরগি লালন পালন করা যায়।

মুরগির খাবার ঃ লেয়ার মুরগি এবং ব্রয়লার মুরগির খাবারের পরিমাণ একরকম নয়। তাছাড়া পালনকালও ব্রয়লারের ক্ষেত্রে অনেক কম। মাত্র ২-২$\frac{১}{২}$ মাসেই ব্রয়লার মুরগি বিক্রীযোগ্য হয়। এই সময়কালে এদের খাবার পরিমাণ সাধারণত নিম্নরূপ ঃ-

বয়স (দিন)	প্রতি ব্রয়লারের দৈনিক খাবার (গ্রাম)	বয়স (দিন)	প্রতি ব্রয়লারের দৈনিক খাবার (গ্রাম)
১-৫	১০	৩১-৩৫	৮০
৬-১০	২০	৩৬-৪০	৯০
১১-১৫	৩২	৪১-৪৫	১০০
১৬-২০	৪৪	৪৬-৫০	১১০
২১-২৫	৫৮	৫১-৫৫	১১৫
২৬-৩০	৭০	৫৫-৬০	১২০

সূত্র ঃ Integrated Fish Farming in China

কেবল মাত্র ব্রয়লারের মাধ্যমে মাছ চাষ সমন্বয় করলে (পুকুরের ওপর) ব্রয়লার পালনের প্রথম ১ মাস পুকুরের জন্য

সমন্বিত মৎস্যচাষ ও এর সম্ভাবনা

সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

এদেশে মৎস্য উৎপাদনের উৎসগুলোর মধ্যে দিঘি, পুকুর, বাঁওড়, বরোপিট, সেচ-প্রকল্প এলাকার বদ্ধ জলাশয় মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার উপযোগী উৎস। আর এরই পাশাপাশি ঐতিহ্যগত দিক থেকে বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবারেই গৃহপালিত পশুপাখি লালন-পালন করা হয়, তাছাড়া খামার পর্যায়েও এসব পশুপাখি পালন করা হচ্ছে। এসব জীবজন্তুর মল-মূত্র এবং পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য মাছের পুকুরে ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

এভাবে খামারজাত কিংবা গৃহপালিত পশু-পাখির সাথে মৎস্যচাষের সমন্বয় এর মাধ্যমে যে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় তা'ই সমন্বিত মৎস্যচাষ নামে পরিচিত।

চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হাঙ্গেরী এবং ইউরোপের কিছু কিছু দেশে সমন্বিত মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা বেশ প্রচলিত। এভাবে স্বল্প পরিসর জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানসহ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলো গৃহপালিত পশুপাখি এবং মাছ চাষের সমন্বয় সাধনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সমন্বিত মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র গৃহপালিত বা খামার পালিত জীবজন্তুর সাথেই সম্পৃক্ত নয়। কৃষিজাত ফসল, শাকসব্জি, রেশমচাষ, চালের কল, অটোমিল, অন্যান্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার উপজাতের সাথে সমন্বয় সাধন করেও মাছ চাষ করা যায়।

সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ

দেশে যে বিদ্যমান দিঘি, পুকুর এবং মাছচাষের উপযোগী অন্যান্য জলাশয় রয়েছে সেগুলোতে হাঁস বা মুরগি কিংবা গরু পালনের মাধ্যমে সমন্বিত মৎস্যচাষ সম্ভব। বৃহদাকার মৎস্য খামারগুলোতে একাধিক রকমের পশুপাখি এবং কৃষি ও ফলমূলের চাষের সমন্বয়ের মাধ্যমে মৎস্যচাষ করা হয়ে থাকে।

ছোট আকারের খামারে কিংবা গ্রামের পুকুরে একটি বা দুটি বিষয়ের সমন্বয় করা শ্রেয়। বড় খামারগুলোতে দুই বা ততোধিক ক্ষেত্রে সমন্বয় করা অধিক লাভজনক। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সমন্বয়ের কতিপয় মডেল

ক) মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষ
খ) মাছ ও হাঁসের ,, ,,
গ) মাছ ও গরুর ,, ,,
ঘ) মাছ ও ফলমূলের ,, ,,
ঙ) মাছ ও গবাপিশুর জন্য ঘাসের চাষ
চ) ধান ক্ষেতে মাছের চাষ
ছ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও মাছের সমন্বিত চাষ
জ) সেচ প্রকল্প এলাকায় সমন্বিত চাষ
ঝ) মাছ ও ক্ষুদে পানা (ডাকউইড) এর সমন্বিত চাষ,
ঞ) মাছ, মুরগি, হাঁস, গবাদিপশু, ফলমূল, শাক-সব্জির সমন্বিত চাষ
ট) রেশম কীট ও মাছের সমন্বিত চাষ

এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে কতিপয় সমন্বিত চাষ পদ্ধতির আলোচনা করা হলো

মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষ

মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষ দু'ভাবে করা যেতে পারে। যেমন পুকুর বা জলাশয় থেকে দূরে বাড়ির আঙ্গিনায়

পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত করতে হবে। সাধারণত সকাল অথবা বিকালে পোনা অবমুক্তি করাই শ্রেয়। দুপুরে পোনা ছাড়া ঠিক নয়। মেঘলা দিনে/ভ্যাপসা আবহাওয়ায় পোনা দুর্বল হয়ে পড়ে।

মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

(ক) **পোনা বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ ঃ** পুকুরে পোনা ছাড়ার পর থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত পোনার চলাফেরা, মৃত্যুর সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং মৃত পোনার পরিবর্তে সমসংখ্যক প্রজাতিওয়ারী পোনা পুনঃমজুদ করতে হবে।

(খ) **সার প্রয়োগ ঃ** দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কিস্তিতে নিয়মিত মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ করতে হবে। শীতকালে ১১ ডিগ্রী সে. এর নিচে পানির তাপমাত্রায় সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। সকাল ১০–১১ ঘটিকায় সূর্যালোকিত দিনে সার প্রয়োগ করতে হবে।

(গ) **সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ ঃ** প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য মাছের ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কার্পের খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, ক্ষুদি পানা, কলাপাতা, নরম ঘাস, পেঁপে, মিষ্টি আলুর পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে। খাদ্যের পরিমাণ পানির তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল সাধারণত মাছের গড় ওজনের ৩–১২% ভাগ সম্পূরক খাদ্য দৈনিক প্রয়োগ করা হয়। খাদ্য প্রয়োগের উপযুক্ত সময় সকাল ১০–১২ ঘটিকা এবং বিকাল ৩–৪ ঘটিকা। মাছ ২৮° – ৩১° সে. তাপমাত্রায় বেশি খায় এবং বাড়ে।

(ঘ) **নমুণায়ন ঃ** নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের বেঁচে থাকার হার, মজুদ ঘনত্ব নির্ণয় করে পোনা মজুদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য প্রয়োগের হার নির্ধারণ করা হয়। নমুণা সংগ্রহের জন্য ৮ বর্গ কিলোমিটারের ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যায়।

(ঙ) **রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ঃ** জীব মাত্রই রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। মাছ চাষের সব নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পানির দূষণ ক্রিয়া, অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব, মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ, অতিরিক্ত জৈব পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, প্রটোজোয়ার অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে রোগ সৃষ্টি হয়। পুকুরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করার ওপর রোগ প্রতিরোধ এবং ভাল উৎপাদন নির্ভরশীল।

(চ) **মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ ঃ** বাজার দর ও চাহিদার ভিত্তিতে পুকুর থেকে মাছ আহরণ ও পোনা পুনঃ মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়মিত মাছ ধরা ও পুনঃমজুদ পুকুরের অধিক উৎপাদন ও অধিক লাভ নিশ্চিত করে।

(ছ) **মাছ চাষে আয়-ব্যয় পর্যালোচনা ঃ** পুকুরের আয়-ব্যয় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল, বাজারজাতকরণ, চাহিদা, চাষীর দক্ষতা, উপকরণে সহজলভ্যতা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

মিশ্র চাষের আয় ব্যয় (শতাংশ)

ব্যয়ের খাত	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
পুকুর ভাড়া	১ বছর	৪৫.০০
সেচ	১ ঘন্টা	৩৫.০০
চুন	৩ কিলো	২৪.০০
পোনা	৫৫ টি	১৪০.০০
সার		
সার জৈব	৫০ কিলো	২৫.০০
সার অজৈব	৩.৫ কিলো	২১.০০
খাদ্য		
কুঁড়া	২.৫ কিলো	১০.০০
খৈল	৬.০ কিলো	৩৬.০০
শামুক	৩.৫ কিলো	২০.০০
পাহারা		২০.০০
ঔষধ		৪.০০
বিবিধ		২০.০০
মোট		৪০০.০০

আয় (শতাংশ)

আয়ের খাত	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
মাছ	১২ কিলো	৪৮০.০০
চিংড়ি	২ কিলো	৩০০.০০
মোট–	১৪ কিলো	৭৮০.০০

নীট লাভ ঃ ৭৮০–৪০০ = ৩৮০.০০ টাকা (শতাংশ)।

(ঘ) **পুকুরে সার প্রয়োগ ঃ** চুন প্রয়োগের ৭–১০ দিন পর পুকুরে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের ফলে মাটি ও পানির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয়।

সার প্রয়োগ মাত্রা

সময়	সারের প্রকার	প্রয়োগ মাত্রা	মন্তব্য
পোনা মজুদের ১৫ দিন পূর্বে	জৈব সার ঃ ক) গোবর সার খ) হাঁস মুরগির বিষ্ঠা	 ৮–১০ কেজি/শতাংশ ৪–৫ কেজি/শতাংশ	রাসায়নিক সার সব সময় গুলে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। মাটি ও পানির অবস্থা অনুযায়ী সার প্রয়োগের মাত্রা কম/ বেশি হবে।খুব গরমের সময় জৈব সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।বৃষ্টির সময় অজৈব সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
পোনা মজুদের পর প্রতি মাসে	ক) গোবর খ) ইউরিয়া গ) টিএসপি	৪ কেজি/শতাংশ ১০০ গ্রাম/শতাংশ ৩৫ গ্রাম/শতাংশ	
পোনা মজুদের পর দৈনিক সার প্রয়োগ	ক) জৈব সার ঃ গোবর অথবা হাঁস/মুরগির বিষ্ঠা খ) অজৈব সার ঃ ইউরিয়া টিএসপি এসপি	 ১৫০–২০০ গ্রাম/শতাংশ ৯০–১৫০ গ্রাম/শতাংশ ৩–৫ গ্রাম/শতাংশ ১–২ গ্রাম/শতাংশ ০.৬–১ গ্রাম/শতাংশ	জৈব ও রাসায়নিক সার একত্রে একটি পাত্রে ৩ গুণ পানির মধ্যে ১২–১৫ ঘন্টা ভেজাতে হবে। অতঃপর মিশ্রণটিকে সকাল ৯–১০ টার মধ্যে তরলাকারে পানির উপরিভাগে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

ক) **প্রজাতি নির্বাচন ঃ** মাছ চাষের সাফল্য নির্ভর করে অনেকাংশে প্রজাতি নির্বাচনের ওপর।

পোনা মজুদের হার (মিশ্রচাষ)

মাছের প্রজাতি	সংখ্যা/শতাংশ	সংখ্যা/ একর
সিলভার কার্প	৭ – ১২	৭০০ – ১২০০
কাতলা/বিগহেড	৩ – ৪	৩০০ – ৪০০
রুই	৫ – ৮	৫০০ – ৮০০
মৃগেল/কালি বাউশ	৬ – ১০	৬০০ – ১০০
কার্প ও /মিরর কার্প	১ – ২	১০০ – ২০০
গ্রাস কার্প	২ – ৪	২০০ – ৪০০
মোট	২৪ – ৪০	২৪০০ – ৩১০০

পোনা মজুদের হার পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল।

পোনা মজুদের হার (মৌসুমী পুকুর)

প্রজাতি	সংখ্যা/শতাংশ	সংখ্যা/ একর
সরপুঁটি	১৫ – ২০	১৫০০ – ২০০০
সিলভার কার্প	৫ – ৬	৫০০ – ৬০০
গ্রাস কার্প	১ – ২	১০০ – ২০০
মিরর কার্প	৩ – ৪	৩০০ – ৪০০
মোট	২৪ – ৩২	২৪০০ – ৩২০০

সবল ও সুস্থ পোনা মজুদের বিষয়টি সাফল্যের চাবিকাঠি। বিগত বছরের পোনা স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করবে। বাইরের পানির সমতা এনে পোনাকে নতুন

পুকুরে চাষোপযোগী দেশী ও বিদেশী মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

প্রজাতি	দেশী/বিদেশী	প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য	খাদ্যাভ্যাস
কাতলা	দেশী	প্রাণিকণা	উপরিস্তর
সিলভার কার্প	বিদেশী	সবুজ কণা	-ঐ-
বিগহেড কার্প	বিদেশী	প্রাণি কণা	-ঐ-
গ্রাসকার্প	বিদেশী	জলজ উদ্ভিদ	উপরি/মধ্যস্তর
রুই	দেশী	প্রাণিকণা,পচা জৈব পদার্থ	মধ্যস্তর
মৃগেল	দেশী	প্রাণিকণা,পচা জৈব পদার্থ, ছোট ছোট কীট	নিম্নস্তর
কালিবাউশ	দেশী	প্রাণিকণা,পচা জৈব পদার্থ, ছোট ছোট কীট	-ঐ -
কার্প ও মিরর কার্প	দেশী	প্রাণিকণা, ছোট শামুক, ছোট কীট	-ঐ-

পুকুরে রুই জাতীয় মাছের চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত (ক) মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা, (খ) মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ও (গ) মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।

মুজদ - পূর্ব ব্যবস্থাপনা

(ক) পুকুর নির্বাচন

- মিশ্র চাষের জন্য অন্ততঃ ৮-১০ মাস পানি থাকে এরূপ ১০-২০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি জলায়তন বিশিষ্ট ৪-১০ ফুট গভীর পুকুর উপযোগী।
- মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষের জন্য ৩-৮ মাস পানি থাকে এরূপ ১-২ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি জলায়তন বিশিষ্ট ৪-৬ ফুট গভীর পুকুর উপযোগী।
- পুকুর পাড়ে পাতা ঝরে এ ধরনের বড় গাছ ও ঝোপ মুক্ত হতে হবে।

(খ) **পুকুর প্রস্তুতি ঃ** প্রতি ৩-৫ বছর পর পর সেচের মাধ্যমে পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে এবং বাজে মাছ অপসারণ করতে হবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রতি ৩০ সে.মি. গভীরতায় শতাংশ প্রতি ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করলে মাছ ও জলজ প্রাণী ধ্বংস হবে। রোটেননের বিষাক্ততার মেয়াদ ৭-১০ দিন স্থায়ী হয়।

(গ) **চুন প্রয়োগ ঃ** মাছ চাষে পুকুরে চুন প্রয়োগের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরে চুন ব্যবহারের পরিমান মাটির পিএইচ এবং চুনের ধরনের ওপর নির্ভরশীল। চুন ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণে মাটির পিএইচ পরীক্ষা করা উচিত।

চুন ব্যবহারের মাত্রা

পিএইচ মান	মাটির অবস্থা	মাটির রং	ব্যবহারের মাত্রা কিলো/শতাংশ
৪.০-৪.৫	উচ্চ অম্লীয়	লাল বাদামি	৪ কেজি/শতাংশ
৪.৫-৫.৫	মধ্যম অম্লীয়	ধূসর	২.৭৫ কেজি/শতাংশ
৫.৫-৬.৫	মৃদু অম্লীয়	বাদামি	২.০ কেজি/শতাংশ
৬.৫-৭.৫	প্রায় নিরপেক্ষ	বাদামি	০.৭৫-১.০ কেজি/শতাংশ

পুকুরে মাছ চাষ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপপরিচালক ও
মেছবাহ উদ্দীন আহমদ, উপপ্রধান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর আয়তনের ১৩ লক্ষ চাষোপযোগী পুকুর, দিঘি আছে। এ সমস্ত পুকুর/দিঘির অধিকাংশই হাটবাজার, বাড়িঘর নির্মাণ, সেচ ও খাবার পানি সরবরাহের জন্য খনন করা হয়। পুকুর/দিঘি যে কারণেই খনন হোক না কেন সঠিকভাবে মাছ চাষ করলে চাষীরা সমপরিমাণ আবাদি জমি অপেক্ষা অনেক বেশি লাভবান হতে পারেন। দেশের ক্রমবর্ধমান পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে পুকুরে মাছ চাষ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

মাছ চাষ পদ্ধতি

(ক) **একক চাষ পদ্ধতিঃ** এই পদ্ধতিতে এক জাতের প্রজাতি চাষাবাদ করা হয়, যেমন নাইলোটিকার চাষ, রাজপুঁটির চাষ।

(খ) **মিশ্রচাষ পদ্ধতি ঃ** বিভিন্ন প্রজাতির মাছ একত্রে পুকুরে চাষ করে পানির সকল স্তরে বিদ্যমান খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাকে মাছের মিশ্রচাষ বলে।

মাছ চাষে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

মাছ চাষে চার ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(ক) **ব্যাপক পদ্ধতি ঃ** রাক্ষুসে ও আগাছা সম্পূর্ণ দূর করা হয় না। খুব কম অথবা খুব বেশি মজুদ ঘনত্ব। পানিবদল ও অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। কদাচিৎ সার ব্যবহার করা হয়।

(খ) **উন্নত ব্যাপক পদ্ধতি ঃ** রাক্ষুসে ও আগাছা সম্পূর্ণ দূর করা হয়। মাঝারি ঘনত্বে পোনা মজুদ এবং ১-২ বার সার প্রয়োগ করা হয়। শর্করাসমৃদ্ধ খাবার প্রয়োগ করা হয় তবে পানিবদল ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা নেই। মাঝারি আয়তনের পুকুর, আংশিক মাছ ধরা হয়।

(গ) **আধানিবিড় পদ্ধতি ঃ** রাক্ষুসে ও বাজে মাছ সম্পূর্ণ দূর করা হয়। মধ্যম মজুদ ঘনত্ব, নিয়মিত সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, আংশিক মাছ ধরা এবং পোনা মজুদ, প্রয়োজনে পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালন করা হয়।

(ঘ) **নিবিড় পদ্ধতি ঃ** নিয়মিত পানি পরিবর্তন ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা, উন্নতমানের পরিপূর্ণ খাদ্য প্রয়োগ, উচ্চতর মজুদ ঘনত্ব অনুসরণ।

পুকুরে মাছ চাষের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণের বিষয়টি চাষীর কারিগরি দক্ষতা, আর্থিক সামর্থ, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

পুকুরে চাষোপযোগী প্রজাতির বৈশিষ্ট্য

- পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল।
- দ্রুত বর্ধনশীল।
- প্রাকৃতিক ও সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে সক্ষম রাক্ষুসে স্বভাবমুক্ত।
- খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগী নয়।
- সুস্বাদু এবং যথেষ্ট পুষ্টিমানসম্পন্ন।
- অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

করে তোলা যায়। এই পদ্ধতিতে মাছ চাষকে পেনে মাছ চাষ বলে। এতে বিভিন্ন প্রজাতির রুই জাতীয় মাছ নিয়ম মাফিক ৬/৭ মাস চাষ করে একজন কৃষক উক্ত সময়ে একরে ৫০ হাজার টাকার বেশি আয় করতে পারেন। যৌথভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচখালে পেনে মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এতে মাছ চাষের জন্য আপনার নিজস্ব জলাশয়ের প্রয়োজন হবেনা।

গলদা চিংড়ির গৃহাঙ্গণ হ্যাচারি

ভাবছেন হ্যাচারি-অনেক খরচ! না, আপনি এখন ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ করে দেশীয় উপকরণ ব্যবহারে অতি সাধারণ একটি গলদা চিংড়ির হ্যাচারি স্থাপন করতে পারেন। সারা দেশের মিঠাপানিতে গলদা চিংড়ি চাষের বিরাট সুযোগ থাকা সত্বেও মূলত পোনার অভাবে এর চাষ সম্প্রসারিত হতে পারছে না। গলদা চিংড়ি মিঠাপানিতে উৎপাদিত হলেও পোনা উৎপাদনে সামান্য লোনাপানির (৮-১০ পিপিটি) প্রয়োজন পড়ে। আপনি সমুদ্র হতে ব্রাইন বা লোনাপানি সংগ্রহ করে পুনঃসঞ্চালন (Re-circulation) পদ্ধতিতে একই পানি বায়োফিল্টারের মাধ্যমে পরিশোধন করে অবিরাম ব্যবহারে গলদার পোনা উৎপাদন করতে পারেন। একটি সিমেন্টের গরুর খড় খাওয়ার চাড়ি, একটি প্লাস্টিক ড্রামে স্থাপিত জৈব ফিল্টার ও একটি বিদ্যুৎ চালিত বাতাস উৎপাদন ও সঞ্চালনকারী যন্ত্র এই হলো উপকরণ। একজন কৃষক প্রজনন মৌসুমে ২টি জীবনচক্রে প্রায় লক্ষাধিক পোনা উৎপাদন করে লক্ষ টাকা আয় করতে পারেন। এভাবে বিশেষ বিশেষ এলাকায় চিংড়ি হ্যাচারি গ্রাম গড়ে উঠলে সারা দেশে গলদা চিংড়ির চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে ব্রাইন বিক্রিসহ নানা ধরনের পার্শ্ব ব্যবসা।

গলদা চিংড়ি ও রুই জাতীয় মাছের একত্রে চাষ খুব লাভজনক। এতে একরে ২ টন রুই জাতীয় মাছ এবং ৪০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা যায় যা মৎস্য চাষকে অধিক লাভজনক করে তোলে।

চৌবাচ্চায় উন্নত জাতের মাগুর চাষ

গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশীয় স্ত্রী মাগুর এবং আফ্রিকান পুরুষ মাগুরের সংকরায়নের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল এই সংকর মাগুর উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর অনেক গুণ। তিনমাসে পূর্ণাঙ্গ দেশী মাগুরের আকার প্রায় ১৫০-১৭৫ গ্রামে উন্নীত হয়। এই সংকরজাতের মাগুর দেখতে দেশী মাগুরের মত এবং খেতে সুস্বাদু। ২ বর্গমিটারের ২.৫-৩-০ গভীর চৌবাচ্চায় প্রতি বর্গমিটারে ৫-৬ ইঞ্চি সাইজের ৪০ টি মাগুরের পোনা ছাড়তে পারেন। ফিশমিল, ব্লাডমিল, খৈল, চালের কুঁড়া ও আটা মিশ্রিত খাবার দৈনিক ৫ ভাগ হারে প্রদান করে প্রতি বর্গমিটারে তিনমাসে প্রায় ৫০ কেজি মাগুর উৎপাদিত হতে পারে, অর্থনৈতিক দিক থেকে যা অনেক লাভজনক। শহর এলাকায় অনেকেই চৌবাচ্চায় স্বল্প ব্যয়ে সংকর জাতের মাগুর মাছের চাষ করে সহজেই আয়ের উৎস প্রসারিত করতে পারেন।

মাছের খাদ্য

মাছ জীবন্ত প্রাণী। পানি খেয়ে মাছ বড় হয় না। বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন সত্যি কিন্তু বড় হওয়ার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। পানিতে বিদ্যমান শ্যাঁওলা ও প্রাণিকণা খেয়ে এরা বড় হয়। আপনি পরিমাণমত সার, গোবর প্রয়োগ করে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মাতে পারেন। এতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে আপনি মাছের উৎপাদন আরো বেশি বাড়াতে পারেন। আমাদের দেশে অনেক কৃষিজ এবং প্রাণিজ উপজাত দ্রব্যাদি রয়েছে যার পুষ্টিমান ভাল, পাওয়াও যায় যথেষ্ট পরিমাণে। যেমন খৈল, কুঁড়া, ভুষি, জবাইকৃত পশুপাখির নাড়িভুঁড়ি, রক্ত, নানা প্রকার কচুরি পানা, কুটি পানা ইত্যাদি। এগুলোর সংমিশ্রণে আপনি নিজে খাদ্য তৈরি করে মাছকে খাওয়াতে পারেন অথবা কারখানায় তৈরি দানাদার বা পেলেট জাতীয় খাদ্যও ব্যবহার করতে পারেন। কখনো অতিমাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করবেন না, পুকুরে অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করবেন না। এতে পানি নষ্ট হয় এবং মাছের রোগ হয়। পানির সঠিক গুণাগুণ রক্ষার মাধ্যমে আপনি রোগ প্রতিরোধ করতে পারেন। মাছের রোগের চিকিৎসা আসলেই কঠিন। মাছের সাধারণ রোগ সম্পর্কে আপনি নিকটবর্তী মৎস্য অফিসার বা মৎস্য বিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

সার্বিক প্রভাব

ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য মৎস্য চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এতক্ষণ যে সকল তথ্য নিবেদন করা হলো, আমার বিশ্বাস তা আপনাদের উৎসাহিত না করে পারে না। খাদ্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল হিসেবে আপনাদেরকে ব্যাপকহারে মৎস্য চাষে এগিয়ে আসতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনায় অবস্থিত পুকুরে নারীসমাজও মাছ চাষে সম্পৃক্ত হতে পারে, আপনার আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এভাবে সকলে মিলে মাছ চাষ করলে ইনশাআল্লাহ যে সুযোগ এবং সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে তাতে পুষ্টির অভাব ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা কোনই কঠিন কাজ নয়।

ও কম খরচে স্বল্প এবং ঘোলা পানিতে চাষ করা যায়। এই মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতের পর প্রতি শতাংশে ৬-৮ গ্রাম ওজনের ৬০-৭৫টি পোনা ছাড়ুন। মজুদকৃত মাছের ওজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ হারে শুধুমাত্র চালের কুঁড়া খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করুন। সেই সাথে কুটিপানাও দিতে পারেন। তাছাড়া প্রতি ১৫ দিনে একবার শতাংশ প্রতি ৫-৬ কেজি গোবর প্রয়োগ করুন। এতে ৩-৪ মাসে একরপ্রতি রাজপুঁটি উৎপাদন হয় প্রায় ১ টন এবং তেলাপিয়া ১.৫ টন। খরচ বাদে একর প্রতি নীট মুনাফা রাজপুঁটির ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা এবং তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে ৩৮,০০০ টাকা। এতটুকুন এক পতিত ডোবা বা গর্ত যা এতদিন কোন কাজেই আসত না তা থেকে এত লাভ নিঃসন্দেহে প্রলুব্ধকর নয় কি!

সমন্বিত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ৭৫০ জনের বেশি লোক মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.১৯ হেক্টর। অতএব, কৃষকের জীবনধারণের জন্য সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ, মুরগি সবকিছু একই জমিতে উৎপাদন করে নিজের চাহিদা পূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনি সমন্বিত চাষ প্রক্রিয়ায় ধানের সাথে মাছের চাষ করে একরকম বিনা খরচেই মাছ উৎপাদন করে বাড়তি আয় করে নিতে পারেন। ধান চাষকালে ক্ষেতে প্রায় ৮-১২ ইঞ্চি পানি থাকে এমন বন্যামুক্ত ক্ষেতে ধান রোপণের ১৫ দিন পর একরে ১২০০ রাজপুঁটি, তেলাপিয়া অথবা মিরর কার্পের উপযুক্ত পোনা ছেড়ে দিন। ক্ষেত্র বিশেষে গলদা চিংড়িও দিতে পারেন। ধান আবাদের জন্য ক্ষেতে যে সার ও গোবর ব্যবহার করবেন তা মাছেরও কাজে লাগবে। মাছের জন্য কোন বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন নেই। ধান পাকার সময়ের মধ্যে আপনি একরে ১৫০-২০০ কেজি মাছ উৎপাদন করে নিতে পারেন যা থেকে প্রকৃত মুনাফা হবে ৫,০০০ টাকার ওপর। অথচ ধান (যা আপনার মূল ফসল) হতে আয় হবে মাছের আয়ের অর্ধেক। আরো লাভ আছে। মাছ দ্বারা ধানের পোকা দমন হয়, ধানের উৎপাদন শতকরা ১০-১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দেশে ১ কোটি মিলিয়ন হেক্টর ধান ক্ষেত রয়েছে যেখানে যুগপৎ অথবা পর্যায়ক্রমিকভাবে ধানের সাথে মাছ চাষ করা যেতে পারে। যদি একদশমাংশ জমিতেও মাছ চাষ করা যায় তাহলে অতিরিক্ত ২ লক্ষ টনের অধিক মাছ উৎপাদিত হতে পারে।

অন্য দিকে হাঁস-মুরগির সাথে মাছের চাষ করে বিনা খরচে একর প্রতি ২ টনের বেশি মাছ উৎপাদন করতে পারেন। এতে মাছকে কোন খাবার দিতে হয় না। হাঁস-মুরগির যে বিষ্ঠা পুকুরে পড়ে তা দিয়েই পুকুরে মাছের জন্য খাদ্য তৈরি হয়। এই প্রযুক্তিতে পুকুরের উপর ঘর তৈরি করে তাতে একর প্রতি ২০০ হাঁস অথবা মুরগি প্রতিপালন করা যায়। পুকুরের পানি পান ছাড়া সকল প্রকার গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করা যায়। ডিম পাড়া মুরগির সাথে অথবা ব্রয়লার বা মাংস উৎপাদনের মুরগির সাথেও মাছ চাষ করা যায়। ব্রয়লারের সাথে চাষে ২ মাস পর পর ব্রয়লার বিক্রয়যোগ্য হয়। ফলে ত্বরিৎ অর্থ ফেরত আসে।

পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ

বারোমাসী পুকুর থাকলে আপনি এ পদ্ধতিতে রুই, কাতলা জাতীয় মাছের চাষ করতে পারেন। পুকুর প্রস্তুতির পর রুই, কাতলা, সিলভারকার্প, গ্রাস কার্প এবং কমন কার্পের ৪-৫ ইঞ্চি সাইজের প্রতি একরে ২,৪০০ টি পোনা নির্দিষ্ট অনুপাতে মজুদ করবেন। এতে পুকুরের সকল স্তরের বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্য পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হবে। সপ্তাহে নির্দিষ্ট মাত্রায় সার ও গোবর প্রয়োগ করবেন। সেই সাথে মুজদকৃত মাছের ওজনের ২-৩ ভাগ হারে চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ করুন। এভাবে প্রতি একরে ৮-১০ মাসে ২ টন মাছ উৎপাদন করে খরচবাদে আপনি ৬০-৭০ হাজার টাকা আয় করে নিতে পারেন। পোনা ছাড়া কয়েক মাস পরেই টাকার দরকার হলে আপনি রুই জাতীয় মাছের সাথে কিছু রাজপুঁটি ও গলদা চিংড়ি ছাড়তে পারেন যা তিনমাস পর ধরে বিক্রি করতে পারবেন।

পুকুরে পাঙ্গাঁস মাছের চাষ

নদীর মাছ পাঙ্গাঁস এখন আপনি পুকুরে চাষ করতে পারেন। হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করতে পারেন। রুই জাতীয় মাছের সাথেও এর চাষ করা যায়, সহজে মরে না, বাড়েও দ্রুত এবং খেতেও সুস্বাদু। একক চাষে একরে ৬-৭ হাজার এবং মিশ্র চাষে পাঙ্গাস ২ হাজার এবং রুই জাতীয় ৩ হাজার পোনা ছাড়তে পারেন। চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, মৎস্য চূর্ণ ও আটা মিশ্রিত খাবার প্রয়োগে একক ও মিশ্র চাষে একরে যথাক্রমে ১ ও ২ টন উৎপাদন পাওয়া যায়। মিশ্রচাষ অধিক লাভজনক। এতে বছরে প্রায় ২ লক্ষ টাকার মুনাফা অর্জিত হয়।

পেনে মাছ চাষ

অভ্যন্তরীণ পতিত মুক্ত জলাশয় যেমন অসংখ্য পড়া-পতিত সেচ খালকে বাঁশের বানার সাহায্যে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে মাছের চাষ করে এগুলোকে উৎপাদনমুখী

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য স্বল্পব্যয়ী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি

ডঃ এম. এ. মজিদ, পরিচালক
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ

আপনি কেন মাছের চাষ করবেন ? আপনি মাছের চাষ করবেন এই জন্যে যে, মাছ আমাদের প্রিয় এবং অন্যতম পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু চাহিদার তুলনায় মাছের উৎপাদন প্রায় অর্ধেক। একারণে বাজারে মাছের প্রাপ্তি কম, মূল্য বেশি। অথচ মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে দেশে, রয়েছে বিস্তৃত জলাশয়, উপযোগী পরিবেশ। একটু মনোযোগী হলেই আপনি উন্নত পদ্ধতিতে মাছের চাষ করে পুষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে পারেন, দেশকে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। তাহলে আপনি কেন মাছের চাষ করবেন না!

অন্যদিকে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য ভান্ডার ক্রমান্বয়ে শূন্য হয়ে পড়ছে। অতএব, আপনার চাহিদা যে চাষ থেকেই মেটাতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আপনি ক্ষুদ্র চাষী, ভাবছেন কি করে মাছ চাষ করবেন ? কিচ্ছু ভাববেন না। মাছ চাষ এমন একটি কাজ যা অতি সহজে এবং বেশ কম খরচে করা যায়। আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই পুকুর আছে। না থাকলে আপনি অন্য কারো পুকুর বন্ধক নিতে পারেন। তাও যদি না হয় আপনি একক অথবা মিলিতভাবে রাস্তার পার্শ্বে পতিত ডোবা বা খালে মাছের চাষ করতে পারেন। আপনি মাঠে যেখানে শুধু ধানের আবাদ করেন সেখানে মাছের পোনা ছেড়ে অনায়াসে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। যথারীতি পুকুর প্রস্তুত করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছের চাষ শুরু করুন। দেখবেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার ছোট্ট মেয়েটিও কি করে মাছের যত্ন নেয়। সঙ্গতি থাকলে আপনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য খামার, হ্যাচারি অথবা নার্সারি গড়ে তুলতে পারেন। অতএব, আপনি ছোট কি বড় কৃষক মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে এটি কোন সমস্যাই নয়। নিম্নে কতিপয় স্বল্পব্যয়ী মৎস্য চাষ প্রযুক্তির বিবরণ দেয়া হলো। মিলিয়ে দেখুন আপনার আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে পড়ে কিনা এবং আপনি উৎসাহিত বোধ করেন কিনা।

রুই জাতীয় পোনামাছের উন্নত নার্সারি প্রযুক্তি

সাম্প্রতিককালে দেশে ব্যাপকভাবে রুই জাতীয় মাছ চাষের সম্প্রসারণ ঘটছে। বাড়ছে পোনার চাহিদা। আপনি গরীব চাষী। বারোমাসী চাষ প্রক্রিয়ায় ফসলের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা আপনার পক্ষে কষ্টকর, অথবা আপনার এ ধরনের পুকুর নেই। এ ক্ষেত্রে আপনি ছোট পুকুরে পোনা মাছের নার্সারি করতে পারেন। যথা নিয়মে পুকুর শুকিয়ে চুন–সার প্রয়োগ করে নার্সারি পুকুর তৈরি করুন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি শতাংশে ৫০–১০০ গ্রাম রেণু পোনা ছাড়ুন। ২১ দিন পর ধানি পোনায় রূপান্তরিত হওয়ার পর প্রতি শতাংশে ৩–৪ হাজার ঘনত্বে পাতলা করে দিন। এতে শতকরা ৮০ ভাগ পোনা বেঁচে থাকবে। মনে রাখবেন, ১ কেজি রেণুতে (মূল্য ৪,০০০ টাকা) ৪ লক্ষ পোনা হয়। যদি শতকরা ৫০ ভাগ পোনা বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং ২ মাস পর প্রতিটি পোনা এক টাকা করে বিক্রি করা যায়, তাহলে অনায়াসে ২ লক্ষ টাকা অর্জিত হতে পারে। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, পোনা উৎপাদনে ২ মাসে প্রতি শতাংশে নীট মুনাফা ১৬০ টাকা হারে একর প্রতি সর্বনিম্ন মুনাফা ১৬,০০০ টাকা যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লাভজনক।

মৌসুমী জলাশয়ে রাজপুঁটি ও তেলাপিয়ার চাষ

মৌসুমী জলাশয়ে (৩ থেকে ৫ মাস পানি থাকে এমন ডোবা বা গর্ত) এ দুটি মাছের চাষ করে আপনি সহজেই বাড়তি আয় ও পারিবারিক পুষ্টির ব্যবস্থা করতে পারেন। উল্লেখিত মাছ দুটির সুবিধা হলো যে, এরা ৩/৪ মাসেই খাওয়ার উপযোগী (৪/৫ টায় কেজি) হয় এবং অতি সহজে

gariepinus ♂) পিতা ও মাতা উভয় বংশের তুলনায় অধিক গুণাগুণ সম্পন্ন এবং যথার্থভাবে উৎপাদনশীল। অধিকন্তু, এই সংকর মাগুর মাছে ক্রোমোজম ম্যানিপুলেশন ঘটিয়ে কৌলিতাত্ত্বিক বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে এর লাভজনক ও সুষম উৎপাদনের লক্ষ্যে ট্রিপ্লয়েড মাছের ব্যবহার প্রবর্তনের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ট্রিপ্লয়েড জাতের সুবিধাজনক দিক হলো এর ক্রোমোজম বিন্যাসে অসমতা প্রাপ্ত হয় এবং ফলশ্রুতিতে এরা দ্রুত বর্ধনশীল হয় ও অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং পরিবেশের জন্য কখনও ক্ষতিকারক বা হুমকির কারণ হয় না। এ পর্যন্ত এই সংকর জাতে অনধিক ৭০% ট্রিপ্লয়েড উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সাধারণ হাইব্রিড মাছের তুলনায় এর ট্রিপ্লয়েড হাইব্রিড মাছে অধিক বর্ধনশীলতা প্রতীয়মান না হলেও ডিম্বাশয়ের ওজন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস বা বন্ধ্যাত্ব প্রমাণ করে বিধায় এর সুবিধাজনক দিকের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশা করা যায়।

৩. উন্নত জাতের তেলাপিয়া উৎপাদন

তেলাপিয়া মাছকে অনেকে বাজে মাছ মনে করলেও ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহুদেশে এই মাছ অলৌকিক চাষযোগ্য মাছ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশে লাল তেলাপিয়া ও নাইলোটিকা প্রজাতিদ্বয় বর্তমানে মাছ চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বিধায় এদের উন্নত জাত উদ্ভাবন নিঃসন্দেহে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও সম্ভাব্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

(ক) লাল তেলাপিয়াঃ বাংলাদেশে বর্তমানে জনপ্রিয় এই বিচিত্র লাল তেলাপিয়া মাছটি থাইল্যান্ড থেকে ১৯৮৮ সনে এদেশে আনা হয়। তেলাপিয়া মাছের নাইলোটিকা ও মোজাম্বিকা প্রজাতির সংকরায়নে এই লাল তেলাপিয়া মাছের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তাইওয়ানে। বাংলাদেশে এই মাছটি জনপ্রিয় হলেও এর প্রধান সমস্যা মাছটি বিশুদ্ধ প্রজনন করতে সক্ষম নয় এবং প্রত্যেক প্রজন্মে বিভিন্ন মাত্রায় কিছু কালো বা ব্লচ দাগযুক্ত মাছ জন্মায় যার বংশ পরম্পরায় গতিধারার কৌলিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুবই দুরূহ। তথাপি এই মাছের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের বংশ গতিধারার গবেষণা করে এই লাল বর্ণের সম্ভাব্য জোড়ালো প্রভাব (complete dominancy) অনুধাবন করা গেছে। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার মাধ্যমে সম্পূর্ণ লাল বর্ণের তেলাপিয়া মাছের উদ্ভব ঘটানো যাবে বলে আশা করা যায়। এর সম্ভাব্য সুফল হিসেবে উক্ত মাছের গুণগতমান উন্নয়ন তথা এর উৎপাদনে অধিক মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করবে।

(খ) উন্নত জাতের নাইলোটিকা (GIFT strain) উদ্ভাবনঃ বাংলাদেশে ১৯৭৪ সনে থাইল্যান্ড থেকে নাইলোটিকা মাছ প্রথম আমদানি করা হয়। মাছ চাষের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ১৯৮৭ সনে এই জাতটি পুনরায় থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়। এ পর্যন্ত এই মাছটি যথেষ্ট অবদান রেখেছে। তথাপি সঠিক কৌলিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ না করায় এবং মোজাম্বিক জাতীয় তেলাপিয়ার সঙ্গে এর প্রজনন ঘটিত মিশ্রণের ফলে এই মাছটির যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। যদিও সাম্প্রতিককালে অধিক উৎপাদনশীলতা এবং প্রজননঘটিত সমস্যা রোধকল্পে এক গবেষণায় বাংলাদেশে এই মাছের প্রজন্মকে androgen হরমোন প্রয়োগ পূর্বক শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ শুধুমাত্র পুরুষ মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি ICLARM কর্তৃক নাইলোটিকা মাছের আটটি বন্য জাতকে নিয়ে কয়েকটি প্রজন্ম পর্যন্ত নির্বাচন ও সংকরায়ন করে উদ্ভাবিত GIFT তেলাপিয়া নামক উচ্চ ফলনশীল নাইলোটিকার জাতটি বাংলাদেশে ১৯৯৪ সনে আমদানি পূর্বক এই মাছের ওপর গবেষণা কাজ শুরু করা হয়। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের আওতায় এই গবেষণা কার্যক্রমে ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রসহ সারা বাংলাদেশে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণের ফলাফলে জানা যায় যে, এই GIFT জাতটি সাধারণ নাইলোটিকা জাতের তুলনায় ৫০-৬০ ভাগ বেশী উৎপাদনশীল। উপরন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই GIFT তেলাপিয়া মাছের ওপর হরমোন প্রয়োগ করে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত পুরুষ প্রজন্ম উৎপাদন কৌশলটি এই জাতের আরও নূতন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মাৎস্য গবেষনা ইনষ্টিট্যুটের অধীনে গবেষণা কর্মসূচি ঃ বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন কতিপয় মাছের উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে চলমান গবেষণার পাশাপাশি ভবিষ্যতে পরীক্ষাধীনে যে সব গবেষণা কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো হলো ঃ ক) নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে কাংলা মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন; খ) নব্য পুরুষ জাত রাজপুঁটির সাথে সাধারণ স্ত্রী রাজপুঁটির ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে পরবর্তী জেনারেশনে সব স্ত্রী মাছ উৎপাদন; গ) গিফট্ তেলাপিয়াকে হরমোন সেবনের মাধ্যমে সব পুরুষ জাত উৎপাদন; ঘ) শিং ও মাগুর মাছের সংকরায়ন ঙ) মহা শোল মাছের জাত সংরক্ষণ ও পোনা উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন ইত্যাদি।

উল্লেখিত পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের মাছ চাষের আওতায় আনতে পারলে হ্যাচারি মালিক এবং মৎস্য চাষীগণ অধিক উৎপাদন করে মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা

(খ) একলিঙ্গ স্ত্রী রাজপুঁটি মাছ উৎপাদন

একলিঙ্গ স্ত্রী রাজপুঁটি মাছ উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ব করে এর প্রাথমিক কাজ হিসেবে নব্য পুরুষ (Neo-male) প্রজন্ম তৈরী করা হয়েছে যার সম্ভাব্য সুফল ২-৩ প্রজন্মেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের মতো রাজপুঁটির স্ত্রীজাত পুরুষজাতের তুলনায় অধিক ও দ্রুত বর্ধনশীল অর্থাৎ আকারে ও ওজনে বড় হওয়ায় শুধুমাত্র স্ত্রীজাতেয় মাছ উৎপাদন একটি উচ্চ ফলনশীল মাছ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। স্ত্রী জাতের মাছ উৎপাদন গাইনোজেনোসিস ও লিঙ্গান্তর কৌশল অবলম্বন করে সম্পন্ন করা যায়।

উল্লেখ্য যে, মাছের জন্মলগ্নের পরবর্তী ১-২ সপ্তাহের মধ্যেই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় সৃষ্টির মাধ্যমেই তার পুরুষ বা স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্নিত হয়। এই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় সৃষ্টির পূর্ব থেকে ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষ হরমোন প্রয়োগ করে লিঙ্গান্তর করা সম্ভব। কার্প জাতীয় মাছে xy পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ হয় বিধায় ক্রোমোজম ম্যানিপুলেশন করে গাইনোজেনোসিস পদ্ধতিতে উৎপাদিত এক প্রজন্মেই সব মাছই স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এই প্রজন্মের মাছের পোনাকে বিশেষ প্রকারের androgen হরমোন প্রয়োগ করে যে বিশেষ পুরুষ মাছ উৎপাদন করা হয় তাদের জেনোটাইপ xy না হয়ে xx হয় এবং তারা বাহ্যিকভাবে পুরুষ হলেও কৌলিতাত্ত্বিক দিক থেকে স্ত্রী হিসেবেই থাকে। এই বিশেষ পুরুষ মাছের শুক্র দ্বারা যখন যে কোন স্ত্রীমাছের ডিম নিষিক্ত করানো হয় তখন সেই প্রজন্মের সব মাছই স্ত্রীলিঙ্গের (xx) হয়ে যায়। উল্লেখিত নব্যপুরুষ (xx male) জাতের মাছ প্রতিষ্ঠার পর তা স্বাভাবিক প্রজনন কাজে ব্যবহার করে সব স্ত্রী মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে মাছটির উৎপাদন অনেক বাড়ানো সম্ভব হবে।

(গ) রুই মাছের উন্নত ক্লোন উৎপাদন

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে এক গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় রুই মাছের কৃত্রিম প্রজননে প্রাপ্ত ডিম অতি-বেগুনি রশ্মি প্রয়োগে বিকিরিত শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত করার পরপরই তাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডিমের নিউক্লিয়াসে কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রোমোজমের নতুন বিন্যাস ঘটিয়ে প্রথম প্রজন্মে ইনব্রেড লাইন এবং দ্বিতীয় প্রজন্মে জেনেটিক ক্লোন উদ্ভাবনে প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

মাছ প্রাকৃতিকভাবেই তার জীব-বৈশিষ্ট্যের ধারক 'জীন' এর ভিত্তিতে বংশ-পরম্পরায় জীবন ধারণ কাজে প্রয়োজনীয় মাত্রায় অসমসত্ত্ব (Hetrozygous) হয়ে থাকে। অপরিকল্পিত প্রজনন ও অন্তঃপ্রজনন প্রক্রিয়ায় বিশেষ মৎস্যকূল ক্রমান্বয়ে এই অসমসত্ত্বতা হারাতে থাকায় কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয়জনিত সমস্যায় পতিত হয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস করতে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পদক্ষেপ হিসেবে উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

প্রথম ধাপে কমপক্ষে দু'টি লাইনে 'জীন' এর পরম সমসত্ত্বায়ন এবং দ্বিতীয় ধাপে লাইন দু'টির মধ্যে নির্বাচিত সংকরায়ন করে পুনরায় 'জীন' এর অসমসত্ত্ব বিন্যাস ঘটিয়ে উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাত সৃষ্টি করা যায় বলে কৌলিতত্ত্ব বিদরা আশা পোষণ করেন। এক্ষেত্রে প্রথম ধাপের কাজ হিসেবে কমপক্ষে দু'টি লাইনে তাপ বা চাপ পদ্ধতিতে ক্রোমোজম ম্যানিপুলেশন ঘটিয়ে প্রথম প্রজন্মের মাইটোটিক গাইনোজেনস ব্রুড উৎপাদন করা হয় যা থেকে আবার দ্বিতীয় প্রজন্মের মাইওটিক গাইনোজেনস হিসেবে ক্লোন উৎপাদন করা হয়। তারপর নির্বাচিত ক্লোনাল ব্রুড ব্যবহার করে উন্নত জাতের আন্তঃক্লোনাল সংকর উৎপাদন করা সম্ভব।

২. উন্নত জাতের হাইব্রিড মাগুর উৎপাদন

মাগুর মাছের উৎপাদন উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে থাইল্যান্ড থেকে দ্রুত বর্ধনশীল ও অতিকায় মাগুর মাছ *Clarias gariepinus*, আমদানি করা হলেও এর চেহারা ও স্বাদ খুব বেশী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। অধিকন্তু রাক্ষুসে স্বভাবের জন্য এই মাছ চাষের প্রসারও তেমন ঘটেনি। অন্যপক্ষে, আকারে ছোট হলেও সুস্বাদ ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য চাহিদা প্রচুর বিধায় আমাদের দেশী মাগুরের *Clarias batrachus* উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে এর উন্নয়ন প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহস্থ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, দেশী স্ত্রী মাগুর এবং বিদেশী পুরুষ মাগুর মাছের সংকর জাত (*C. batrachus* ♀ + *C.*

উন্নত জাতের মৎস্য প্রজাতি উদ্ভাবন

ডঃ এম. জি. হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
মোঃ শাহিদুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত হ্যাচারি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব হ্যাচারিতে কারিগরি জ্ঞানের অভাবে পরিকল্পনাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবনতায় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইদানিং হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার অঙ্গজ বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস, অঙ্গসংস্থানগত বিকৃতি, রোগবালাই এবং ব্যাপক মৃত্যুহার সম্পর্কে তথ্য প্রায়ই পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে, ব্রুড বা প্রজননক্ষম মাছ বাছাইয়ে অসচেতনতা, অপরিকল্পিত সংকরায়ন ও অন্তঃপ্রজনন (inbreeding) জনিত সমস্যার ফলেই মাছের বংশগত গুণাবলীর মান ক্রমাগতভাবে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এই কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় জনিত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মাছের পোনা উৎপাদনে এই ভয়াবহ কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এখনই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে উন্নত প্রজাতির উদ্ভাবন না ঘটানো হলে তা অচিরেই আরো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাই ১৯৮৮ সাল থেকে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ময়মনসিংহ স্বাদুপানি কেন্দ্রে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে কৌশলগত উপায়ে মৎস্য প্রজাতির বর্তমান বংশগত বা কৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলীর উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নত মৎস্য প্রজাতি উদ্ভাবনের গবেষণা কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফল এবং ভবিষৎ গবেষণা পরিকল্পনার ওপর নিম্নে বিশদ আলোচনা করা হলো।

কার্প, তেলাপিয়া এবং মাগুর মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন

১. কার্প মাছের উন্নয়ন

(ক) নির্বাচিত লাইন প্রজনন পদ্ধতি (selective breeding and line crossing)

নির্বাচিত লাইন প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে মাছের উন্নত ও দ্রুত বর্ধনশীল জাত উৎপাদন করা সম্ভব। ইতোমধ্যেই এই গবেষণামূলক পদ্ধতিতে রাজপুঁটি মাছের উন্নয়নে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যাতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রজন্মের মাছ স্বাভাবিক মাছের চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেই আমরা এর পরবর্তী সম্ভাব্য সুফল পাবো আশা রাখি। এছাড়াও থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানিকৃত বন্যজাত এবং বর্তমানে হ্যাচারিতে সংরক্ষিত জাতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রজনন (diallele crossing) এর মাধ্যমে সম্ভাব্য জাতে উৎকৃষ্টতার মাত্রা নিরুপনের জন্য পরীক্ষামূলক কাজ চলছে।

তাছাড়া এই পদ্ধতিতে রুই ও কাতলা মাছের উন্নয়নের লক্ষ্যে হালদা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী থেকে এই মাছগুলোর বন্যজাত সংগ্রহ করে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। আগামী প্রজনন মৌসুমে এদের মধ্যে লাইন বিড্রিং প্রথম প্রজন্ম উদ্ভাবন করা হবে।

মুক্ত জলাশয় বা নদী উৎসসমূহ থেকে এই সকল মাছের কমপক্ষে দু'টি জাত সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে উৎপাদিত ব্রুড মাছের সাথে প্রজনন পূর্বক আলাদা দু'টি লাইন উৎপাদন করে প্রথম প্রজন্ম তৈরি করতে হয়। পরবর্তীতে আরও দু'টি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্ম উৎপাদন করার পর ব্রুড মাছে রূপান্তর ঘটিয়ে তৃতীয় প্রজন্মে দু'টি লাইনের মধ্যে ক্রস করে অতি সহজেই শতকরা ৪০-৫০ ভাগ বেশী উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবন করা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রজন্ম তৈরির সময় উৎকৃষ্ট গুণাগুণ সম্পন্ন (ভাল আকার, ভাল স্বাস্থ্য ও সবল) নির্বাচিত পর্যাপ্ত সংখ্যক (কমপক্ষে ৪০-৫০ জোড়া) ব্রুড মাছ ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিটি প্রজন্মের প্রতিটি লাইনের মধ্যে দু'টি উপ-লাইন ব্যবহার করে ভাইবোন প্রজনন তথা অন্তঃপ্রজনন এড়িয়ে চলতে হবে।

তথ্যের সত্যতা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। যদি অস্বাভাবিকতার সংখ্যা ও ধরন বাড়তে থাকে তাহলে উৎপাদনের ওপর তার প্রভাব এবং কারণ কী তা জানতে হবে। বেশির ভাগ লোকের ধারণা যে কোন অস্বাভাবিকতা জেনেটিক কারণেই হয়ে থাকে। অথচ অনেক অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আছে যার সাথে জেনেটিক কোন কারণের সম্পৃক্ততা নেই। যেমন ক্ষত বা আঘাত, রোগ, পুষ্টিহীনতা, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণেই অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হতে পারে। সুতরাং অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেই যে তা জেনেটিক বা অন্তঃপ্রজননের কারণে হয়েছে এমন ধরে নেয়া ঠিক হবে না।

মাছের ষ্টক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঠিকভাবে ব্রুড ষ্টক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। বিগত ১২/১৪ বছরে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য হ্যাচারি স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের জন্য ব্রুড মাছ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্রুড ব্যবস্থাপনার সঠিক জ্ঞান না থাকা এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন না করার জন্য সরকারি/বেসরকারি কোন পর্যায়েই সঠিক নীতিমালা বা কৌশল অনুসরণ করা হয় না। ফলে বর্তমানে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার গুণগত মান নেমে গেছে। এসব পোনার বৃদ্ধির হার অনেক কম বলে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। তদুপরি মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন, নদী, হাওর, বিল ও বন্যাপ্লাবিত এলাকায় হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা অবমুক্ত করা হচ্ছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এটি একটি অতীব প্রশংসনীয় পদক্ষেপ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেহেতু হ্যাচারি পোনার জৈবিক ক্ষমতা এবং জেনেটিক বৈসাদৃশ্য কমে যাচ্ছে সেহেতু এহেন পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে নিম্নমানের পোনার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির হার যে কম হবে তা বলাই বাহুল্য। সঠিক ব্রুড ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কেবল এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব। আমরা মনে করি এই পদক্ষেপ সরকারিভাবেই নেয়া উচিত। বিশেষ করে সরকার নিয়ন্ত্রিত যে সমস্ত মৎস্য হ্যাচারি আছে সেখান থেকে উচ্চ গুণসম্পন্ন পোনা তৈরি কর্মসূচি এখনি গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি ম্যানেজারদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই কর্মসূচি আমাদের মাছের বর্তমান ষ্টক ধ্বংস হওয়ার আগেই শুরু করা যুক্তিযুক্ত।

নিষ্ক্রিয়তা ও অন্তঃপ্রজনন সর্বনিম্নে রাখা যায়। এক্ষেত্রে প্রতি জেনারেশনে Ne এর মান হবে ৩৪৪। যে সমস্ত পপুলেশনের জিন সমষ্টি সংকুচিত সেগুলো কোন পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে সফল হতে পারে না। নদী, হাওর ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাশয়ের পরিবেশ খুবই পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই ধরনের জলাশয়ের জন্য এমন মাছ সংগ্রহ ও প্রজনন করাতে হবে যাদের জেনেটিক বৈসাদৃশ্য বেশি।

যে সকল হ্যাচারি ম্যানেজার ছোট আকারের হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা করে থাকেন তাদেরকে এলোপাতারি প্রজনন ঘটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এরূপ প্রজনন ঘটালে অন্তঃপ্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা রোধ করা যাবে না। Ne কম হওয়ার জন্য উৎপাদন কম হলে বা অন্য কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকট হলে সমস্ত ষ্টক বাতিল করে নতুন ষ্টক সংগ্রহ করতে হবে।

বড় Ne রক্ষণাবেক্ষণের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে বেশি বেশি মাছের প্রজনন করানো। যদি কারও এক লক্ষ চারা পোনা প্রয়োজন হয় তাহলে দশটি পরিবার থেকে দশ হাজার করে সংগ্রহ করার চাইতে এক শত পরিবার থেকে এক হাজার করে সংগ্রহ করাই ভাল। এটি করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পোনা উৎপাদন করতে হবে এবং প্রতিটি প্রজনন থেকে কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে বাকিগুলো বিক্রয় করতে হবে। হ্যাচারি ম্যানেজারেরা একে সময় ও শ্রমের অপচয় মনে করলেও সুপ্রজননের স্বার্থে এটি খুবই জরুরি। হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যই হচ্ছে কম মাছ প্রজনন করানো। জনশক্তি ও বাজেট ব্যবস্থাপনায় এটি সঠিক বিবেচিত হলেও ব্রুড ষ্টক ব্যবস্থাপনার জন্য তা খুবই ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর।

হ্যাচারির আকার ও বাজেট বরাদ্দ যদি ক্ষুদ্র প্রজনন পপুলেশন রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধ্য করে তাহলে সে ক্ষেত্রে এলোপাতারি প্রজনন পরিহার করে বংশতালিকা বা বংশ পরিচয় অনুসরণ করে প্রজনন ঘটিয়ে Ne বাড়ানো সম্ভব। অন্যভাবে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের অনুপাত ৫০ ঃ ৫০ এর কাছাকাছি নিয়ে এসে কম সংখ্যক মাছ ব্যবহার করে Ne বাড়ানো যায়। যদি প্রতিটি মাছ চিহ্নিত করা সম্ভব হয় তাহলে ক্ষুদ্রাকৃতির পপুলেশনেও পৃথক পৃথক বংশতালিকা সৃষ্টি করা এবং অন্তঃপ্রজনন রোধ সম্ভব।

প্রজনন কৌশল পরিবর্তন করে Ne মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যখন স্ট্রিপিং করা হয় তখন কয়েকটি পুরুষ মাছের শুক্রাণু একের পর এক একটি ব্যাচের ডিমে প্রয়োগ করে অথবা কয়েকটি মাছের শুক্রাণু ডিমে নিষিক্ত করার পূর্বে একত্রে মিশ্রিত করা ঠিক নয়। এতে প্রাপ্ত Ne এর মান কাঙ্খিত Ne এর চেয়ে কম হবে। কারণ বিভিন্ন মাছের শুক্রাণুর ডিম নিষিক্ত করার ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ফলে উৎপাদনও ব্যাহত হবে। Ne এর মান সর্বাধিক করার জন্য একটি ব্যাচের ডিমকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি ভাগ একটি ভিন্ন পুরুষ মাছ দ্বারা নিষিক্ত করতে হবে।

স্পার্ম ব্যাংক স্থাপনের ব্যাপারটি আজকাল ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এটি সম্ভব হলে অল্প পরিশ্রমে হাজার হাজার মাছের শুক্রাণু হ্যাচারিতে মজুদ রাখা সম্ভব। এর ফলে অল্প ব্যয়ে Ne এর মান বাড়ানো সম্ভব হবে।

Ne একটি কাঙ্খিত মাত্রায় রাখা প্রায়শই কঠিন বা অসম্ভব হয়ে থাকে। Ne এর মান কম হলেই যে একটি ষ্টক ব্যবহার অনুপযোগী হবে, সুতরাং তাকে ধ্বংস করতে হবে এমন কোন কথা নেই। একটি ষ্টক তখনই ধ্বংস বা বাতিল করতে হবে যখন ঐ ষ্টকের উৎপাদন (দৈহিক বৃদ্ধি), ডিম উৎপাদন ক্ষমতা এবং বেঁচে থাকার হার কমে যাবে।

ব্রুড ষ্টক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি জেনারেশন থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই সমস্ত তথ্য ব্রুড ষ্টক ব্যবস্থাপনায় করণীয় কী তা আগাম জানতে ও পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়ক হবে। কোন ষ্টকের যে কোন জেনারেশনের বর্ধনহার, বেঁচে থাকার হার, রোগের প্রাদুর্ভাব, খাদ্য রূপান্তর, কেজি প্রতি ডিমের উৎপাদন ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। ঐ ষ্টকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপাত্তের গড়, ষ্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD), কোয়েফিসেন্ট অব ভ্যারিয়েশন (CV) এবং রেঞ্জ (range) জানতে হবে।

SD ও CV কোন পপুলেশনের বর্তমান জেনেটিক বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে। এতে বোঝা যাবে যে ঐ পপুলেশন ব্যবহার করে নির্বাচিত প্রজনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব কি না। ঐ পপুলেশনের গুণগত বৈশিষ্ট্যও জানতে হবে। যেমন অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ও উপস্থিতির হার, অস্বাভাবিকতার সংখ্যা ও উপস্থিতির হার, ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই সংখ্যা কমছে না বাড়ছে তা এসব তথ্য থেকে জানা যাবে। মাছ সম্বন্ধীয় অন্যান্য গল্পের মতই যতবার বলা হয় ততই অস্বাভাবিকতার মাত্রা বাড়তে থাকে। কাজেই ঐ সব

করা অসম্ভব। তবে ভবিষ্যতে এ শিল্পের বিকাশ হলে এ অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও সাধারণ ব্যবসায়ীদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে এবং সার জাতীয় পণ্যের মত মৎস্য খাদ্যকেও ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিকট পৌছে দিতে হবে।

৪. পুঁজি বিনিয়োগ ঃ একথা সত্য যে, উন্নত পদ্ধতিতে চাষের জন্যে পুঁজি একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মোটামুটিভাবে একটি বড় অংকের পুঁজির যোগান না হলে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ প্রকল্প পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে না। আবার, মোট খরচের শতকরা ৫০–৬০ ভাগ প্রয়োজন হয় সম্পূরক খাদ্য সংগ্রহে। এর অর্থ হচ্ছে, মৎস্যখাদ্য ব্যবহারে অর্থনৈতিক বাধা একটি বড় বিষয়। মৎস্য অনুকূলে চাষীদের পুঁজির প্রবাহ নিশ্চিত হলেই কেবল এ প্রতিবন্ধকতা দূর হতে পারে।

৫. পৃষ্ঠপোষকতা ঃ দেশে মৎস্যচাষ ব্যবস্থার উন্নতি হলেই কেবলমাত্র মৎস্যখাদ্য শিল্পের উন্নতি সম্ভব এবং এ শিল্পের সকল বাধা অপসারিত হবে। কারণ, মৎস্য খাদ্য হচ্ছে মৎস্য শিল্পের একটি সম্পূরক উপাদান মাত্র। সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত এ শিল্পের বিকাশ এবং উৎকর্ষ অসম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, বেকার সমস্যার সমাধান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সর্বোপরি অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের দ্রুত প্রসার ঘটছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে (১৯৮০–১৯৮৫) মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৬.৪৬ লক্ষ টন থেকে ৭.৭৪ লক্ষ টনে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে (১৯৮৫–১৯৯০) ৭.৭৪ লক্ষ টন থেকে ৮.৫৬ লক্ষ টন এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে (১৯৯০–১৯৯৫) বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ৮.৫৬ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৭০ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪.২৪ ভাগ। অগ্রগতির এই ধারায় মৎস্য উন্নয়নের পাশাপাশি সহায়ক শিল্পগুলোরও বিকাশ একান্তভাবে প্রয়োজন। এক রিপোর্টে জানা যায়, বর্তমান শতকের শেষ নাগাদ মৎস্যখাদ্যের বাৎসরিক চাহিদা দাঁড়াবে ১,৯৪,০০০ মেট্রিক টন। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে মৎস্যখাদ্য উৎপাদন এবং এ শিল্পের বিকাশের জন্য এ মুহূর্ত থেকেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ প্রয়োজন।

মাছ চাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
তথ্য অফিসার (মৎস্য)
মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর, ঢাকা

মাছের জীবন ধারণের মাধ্যম বা আবাসস্থল মাত্র একটি– সেটি হলো পুকুর বা জলাশয়। আবার কোন জলাশয়ের পানি ধারণের আধার হলো মাটি। মাটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদান পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কোন জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে ঐ জলাশয়ের মাটির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ

দোআঁশ মাটির পুকুর মাছচাষের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা খুবই কম এবং কাদা মাটির পুকুরের পানিতে অত্যাধিক ঘোলাত্বের সষ্টি হয়। এজন্য বেলে মাটি ও কাদা মাটিতে খনন করা পুকুর মাছ চাষের জন্য ততটা উপযোগী হয় না।

মাছ চাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা ও উৎকর্ষতা মাটির কয়েকটি সূচকের ওপর নির্ভর করে। যথা–পি এইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, কার্বন–ডাই–অক্সাইড, জৈব পদার্থ ইত্যাদি। নীচে এসব সূচক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. পিএইচ (pH) ঃ মাটির পিএইচ ৬.৫ – ৮.০ এর মধ্যে হলে তা মাছ চাষের জন্য উত্তম।

২. ফসফরাস ঃ ফসফরাস মাটিতে ক্যালসিয়াম, আয়রণ ও এ্যালুমিনিয়ামের ফসফেট হিসেবে অবস্থান করে। পিএইচ (pH) এর উঠানামা এবং পরিমিত জৈব পদার্থের উপস্থিতিই প্রাপ্তিযোগ্য বা সহজপ্রাপ্য (available) ফসফরাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখে। মাছ চাষের জন্য প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ১০–১৫ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য ফসফেট থাকা উচিৎ।

৩. নাইট্রোজেন ঃ ১০০ গ্রাম মাটিতে ৮–১০ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য নাইট্রোজেন থাকা দরকার। পরিমিত নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে উদ্ভিদ কণার সালোকসংশ্লেষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গজ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। ফলে অধিক উদ্ভিদকণা উৎপন্ন হয় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৪. জৈব পদার্থ ঃ মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ যে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য উপাদান। জৈব পদার্থ ফসফাস ও নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। জলজ পরিবেশে জৈব পদার্থ আবহাওয়া থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন ধারণ করে। অতিরিক্ত মাত্রায় জৈব পদার্থ পানির পিএইচ (pH) কমিয়ে দিয়ে পানি দূষিত করে। আবার কখনও পানির দূষণ দূর করতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। পুকুর বা জলাশয়ের মাটিতে সাধারণভাবে শতকরা ১.০ – ২.০ ভাগ জৈব কার্বন থাকলে জলাশয়ের পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মাছের জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম পানি। এজন্য পানির ভৌত–রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণ মাছের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে মাছের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাছের খাদ্য গ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এসব ভৌত রাসায়নিক গুণাবলীর একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে।

পানির ভৌত গুণাগুণ

পানির ভৌত অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পানির ভৌত গুণাগুণসমুহ নিম্নরূপ ঃ

১। **বর্ণ ঃ** পানির বর্ণ হালকা সবুজ হলে তা পুকুরে অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। পানির বর্ণ হলুদাভ হলে ঐ পানিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কম হয়। ফসফরাসের পরিমাণ কমে গেলে পানি কালচে বর্ণ ধারণ করে। ধুসর বর্ণের পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম থাকে।

২। **গভীরতা ঃ** পুকুরে পানির গভীরতা কমপক্ষে ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। দুই মিটার গভীরতা মাছ চাষের জন্য উত্তম।

৩। **পানির স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব ঃ** পানির স্বচ্ছতা ২৫ সেন্টিমিটার হলে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়। পানির ঘোলাত্ব মাছের খাদ্য চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

৪। **তাপমাত্রা ঃ** কার্প জাতীয় মাছ ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খাদ্য গ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়। রুই জাতীয় মাছ চাষের জন্য ২৫°-৩৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা উত্তম। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পানির তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর নিচে গেলে কার্প জাতীয় মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ৩০-৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কার্পজাতীয় মাছের খাদ্য চাহিদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নত হয়। তাপমাত্রা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে। তাপমাত্রা কমলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে।

৫। **সূর্যালোক ঃ** সূর্যের আলো পুকুরের স্বাভাবিক খাদ্য উৎপাদনকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সুর্যালোকের ওপর পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা তথা, উদ্ভিদ প্লাংটনের উৎপাদন নির্ভর করে। পুকুরের পানিতে আলো প্রবেশ বাধা পেলে প্রাথমিক উৎপাদন কম হয়। ফলে মাছের উৎপাদনও কম হয়।

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

১। **দ্রবীভূত অক্সিজেন** (DO) ঃ ফাইটোপ্লাংটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন উৎপাদন করে তা পানিতে দ্রবীভূত হয়। ইহাই পানিতে O_2 এর প্রধান উৎস। বাতাস থেকে কিছু অক্সিজেন সরাসরি পানিতে মিশে। প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলিগ্রামের কম অক্সিজেন থাকলে রুই জাতীয় মাছ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। পুকুরের পানিতে ৮ নিযুতাংশ (ppm) হারে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকলে মাছের বৃদ্ধির হার বেশি হয়। মাছ চাষের জন্য অক্সিজেনের পরিমাণ ৫.০ পিপিএম. (৫.০ নিযুতাংশ) বা এর চেয়ে বেশী হওয়া উচিত।

২। **দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ঃ** পানিতে ১-২ নিযুতাংশ হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকলে মাছের উৎপাদন ভাল হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে। পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ হ্রাস পেলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলে পানির অম্লত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

৩। **পিএইচ** (pH) ঃ অপেক্ষাকৃত ক্ষারধর্মী পানি মাছ চাষের জন্য ভাল (পিএইচ ৬.৫-৮.৫)। পিএইচ মাত্রা ৯.৫ এর বেশি হলে পানিতে মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকতে পারে না। ফলে পানিতে উদ্ভিদ প্লাংটনের উৎপাদন তথা প্রাথমিক উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পানির পিএইচ যদি ১১.০ এ উন্নিত হয়, তাহলে মাছ মারা যায়। পক্ষান্তরে অম্ল পানিও মাছ চাষের জন্য ভাল নয়। কারণ, এতে মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায়, বৃদ্ধি কমে যায় এবং বিষাক্ত পদার্থের সহ্য ক্ষমতা ও কমে যায়। অম্ল পানিতে মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। পনির পিএইচ মাছের খাদ্য চাহিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

৪। **মোট ক্ষারত্ব ঃ** ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের কার্বনেট এবং বাইকার্বনেটের উপস্থিতির দরুণ প্রাকৃতিক পানিতে অম্লের চাহিদাই ক্ষারত্ব। মাছ চাষের জন্য পানির মোট ক্ষারত্বের উপযুক্ত মাত্রা ১০০-২০০ নিযুতাংশ।

৫। **ফসফরাস ঃ** প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ ফইটোপ্লাংটন জন্মায়। পুকুরের পানিতে ০.২ নিযুতাংশ ফসফরাস থাকা প্রয়োজন।

৬। **দ্রবীভুত নাইট্রোজেন ঃ** নাইট্রোজেন জলজ উদ্ভিদের মৌল পুষ্টি উপাদান। প্রকৃতি প্রদত্ত নাইট্রোজেন কোন জলাশয়ের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। পানিতে ০.২ নিযুতাংশ নাইট্রোজেন মাত্রা মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

চিংড়ি চাষে অগ্রযাত্রা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ডঃ আফতাবুজ্জামান, সভাপতি
বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতি, ঢাকা

বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সকল প্রকার প্রাকৃতিক আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদানের মধ্যে চিংড়ি হচ্ছে একটি মূল্যবান উপাদেয় খাদ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রতিবছর মাথাপিছু চিংড়ি ভক্ষণের পরিমাণ হচ্ছে ২.৫ পাউন্ড। একইভাবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এই ধারাটি প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং এটি নিশ্চিত যে, অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে এই উচ্চমূল্যমান সম্পন্ন খাদ্যের বর্ধিত চাহিদা কমার কোন সম্ভাবনা নেই। বিলম্বে হলেও বিশ্বের চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য যে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম স্থানে। এদেশের সুদীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং এটিই হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির বিশেষতঃ বাগদা চিংড়ির প্রাকৃতিক আবাস স্থান। শতাব্দী ধরে সাতক্ষীরা-খুলনা অঞ্চলে ধান চাষের সঙ্গে বাগদা এবং মিঠাপানির গলদা চিংড়ি পর্যায়ক্রমিকভাবে "ভেড়ী চাষ" পদ্ধতিতে চাষ করা হতো। স্বাধীনতার পরে অর্থাৎ সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রকৃতপক্ষে আমরা চিংড়ির ওপর গুরুত্বারোপ করা শুরু করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে চাষ পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ সনাতনী ধারায়। কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে উন্নত সনাতন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় এবং এতে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ৭৫-১০০ কিলোগ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০-৩০০ কিলোগ্রামে দাঁড়ায়। নব্বই দশকের শুরুতে গুটি কয়েক উদ্যোক্তা কক্সবাজার এলাকায়, খুলনার কয়রায় ও সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ শুরু করেন এবং ৩,০০০-৫,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত চিংড়ি উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে সমগ্র এলাকার প্রায় ১৩০ হেক্টর জমি চিংড়ি চাষের আওতায় আনা হয়। ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক উপায়ে পোনা মজুদের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে হঠাৎ করে নদ-নদীর মোহনায় পোনা প্রাপ্তি ক্রমাগত হারে হ্রাস পায়। যার ফলশ্রুতিতে থাইল্যান্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা এদেশে আনয়ন করা হয়। এছাড়াও সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পোনা আনা হতো। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি হাজার বাগদা চিংড়ির মূল্য ছিল প্রায় ৫০-৮০ টাকা এবং ১৯৯৫ সালের প্রারম্ভে অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বাগদা চিংড়ি পোনার মূল্য বেড়ে গিয়ে ৩,৫০০-৪,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বিশ্বের অপরাপর চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশগুলো যেমনঃ তাইওয়ান, চীন, থাইল্যান্ড যা করছে সে ব্যাপারে আমরা কোন আগ্রহ প্রদর্শন করিনা। এমনকি সরকারী প্রতিনিধিরাও এ ব্যাপারে সচেতন হতে পারেননি। আমরা তাইওয়ানের প্রযুক্তি অনুসরণ করে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতভাবে পরিবেশ দূষণ করছি। যার কারণে প্রকৃতি বিরূপ আচরণ শুরু করেছে। আমাদের দেশের জলবায়ু, জৈবিক এবং পরিবেশগত অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে নিবিড়/আধানিবিড়/উন্নত সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটেনি অথচ অন্যান্য এশীয় দেশগুলো থেকে এসব চাষ পদ্ধতি আনয়ন করা হয়েছে এদের উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখে। কিন্তু রোগবালাই এর মারাত্মক ঝুঁকির কথা বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়নি যা অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশগুলোতে ইতোমধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

বিগত বছরগুলোতে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনায় চিংড়ির ব্যাপক মৃত্যু পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ উদঘাটিত হয়নি এবং এ ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ কোন সমীক্ষা করা হয়নি। কিন্তু ১৯৯৪ সালে কক্সবাজার এলাকায় চিংড়ির ব্যাপক মড়ক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বাংলাদেশ সরকার এই সমস্যার কারণ অনুসন্ধান এবং সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে।

মিঃ পিটার ই. লারকিন্সের নেতৃত্বে দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞের দলটি কক্সবাজার, সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাটে ঘেরে চিংড়ি চাষ সম্পর্কিত ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। তারা পানি, মাটি, জীবিত ও মৃত চিংড়ি (বাগদা এবং গলদা উভয়ই), পোনা ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করেন। তারা স্থানীয় মৎসচাষী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কয়েক দফায় আলোচনা করেন। সংগৃহীত নমুনাসমূহ সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়। শুধু তাই নয়, কারণসূচক রোগজীবাণু চিহ্নিতকরণের জন্য কিছু নমুনা বিদেশ পাঠানো হয়। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে তারা সুপারিশমালাসহ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন যা সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. প্রধান রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান সনাক্তকরণ

ক) 'চীনা ভাইরাস' (সিভি)–যাকে বলা হয় ও SEMBV অর্থাৎ সিষ্টেমেটিক এক্টোডারমাল এবং মেসোডারমাল ব্যাকিউলো ভাইরাস, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় WPD ভাইরাস যা চিংড়ির গায়ে হোয়াইট স্পট বা সাদা দাগের কারণ (৪০%)

খ) মনোডন ব্যাকিউলো ভাইরাস – M.B. (২৮%)

গ) C টাইপ ব্যাকিউলো ভাইরাস – C.B.V. ২০%

ঘ) থাইল্যান্ড থেকে আনীত বাগদা পোনা–যার ৯০% ভাগই সেপটিক H.P. (২৮%) এর M.B. ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত ছিল।

ঙ) স্থানীয় প্রাকৃতিক মজুদকৃত পোনাসমূহ যেগুলোতে রোগ সংক্রমনের লক্ষণ ছিল, কিন্তু কোন রোগজীবাণুজনিত ভাইরাস ছিলনা।

চ) *M. rosenbergii* তে তাৎপর্যপূর্ণ কোন রোগ–জীবাণু খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও এগুলোতে রোগ সংক্রমণের লক্ষণ স্পষ্ট ছিল।

২. রোগ বিস্তার এবং ব্যাপক মৃত্যুর কারণ নির্ণায়কসমূহ

ক) সংক্রামিত/ রোগাক্রান্ত পোনা আনয়ন।

খ) পুকুর তৈরীর দুর্বল পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা।

গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং পানি দূষণ।

ঘ) দুর্বল এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে আবর্জনা অপসারণ।

ঙ) অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত চুন ব্যবহার যা কিনা $_{p}H$ এর ব্যাপক তারতম্য ঘটায়।

বিস্তারিত এই প্রতিবেদনটি রোগবালাই সমস্যা সম্পর্কে আমাদেরকে এক অন্তদৃষ্টি প্রদান করে এবং দীর্ঘ মেয়াদী উপায় গ্রহণের সুপারিশ করে কিন্তু এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সম্ভবত আমরা মনে করি যে, আপনা থেকেই এ সমস্যা দূরীভূত হবে অথবা এ সমস্যা সনাতনী/উন্নত সনাতনী পুকুর চাষ ব্যবস্থাকে (যা আমাদের চিংড়ি চাষভূক্ত ৯৯% ভাগ এলাকার অন্তর্ভুক্ত) প্রভাবিত করবেনা।

১৯৯৫ সালের মার্চ–আগষ্ট মাসে কক্সবাজার এবং সাতক্ষীরা–খুলনা এলাকায় চিংড়ির ব্যাপক মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বর/অক্টোবর থেকে বেশ কিছু চাষী উদ্বেগজনক তথ্য দিতে শুরু করেন। প্রথমে সমস্যাটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ ছিল আধানিবিড়/নিবিড় চাষভুক্ত এলাকার মধ্যে কিন্তু এ সময়ে আধানিবিড় এবং সম্প্রসারিত/উন্নত সম্প্রসারিত উভয় চাষভূক্ত সকল এলাকাতে সমান এবং মারাত্মক ভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কক্সবাজার ও সাতক্ষীরা/খুলনা এলাকার চিংড়ি খামারগুলোর প্রায় ৭৫%–৪০% ভাগই রোগাক্রান্ত হয় এবং সকল মজুদকৃত চিংড়ি মারা যায়। আরো উল্লেখযোগ্য যে, গত কয়েক বছর ধরে বিশেষত বৃহত্তর খুলনা এলাকার চাষীরা অক্টোবর/নভেম্বর থেকে পোনা মজুদ করা শুরু করে পরবর্তী মার্চ/এপ্রিল/মে মাসে প্রথম ফসল পাওয়ার জন্য এবং সে অঞ্চলে এটিই প্রধান ফসল হিসেবে বিবেচিত। ফলস্বরূপ, এই ব্যাপক রোগ বিস্তার চিংড়ি চাষীদের মাঝে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ ব্যাপারে মাৎস্য অধিদপ্তরকে অবগত করা হয়। ফলে তারা বিশেষজ্ঞ/পরামর্শদাতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খুলনার পাইকগাছায় গিয়ে বৃহত্তর খুলনা এলাকার চিংড়ি উৎপাদনকারী সকল থানা থেকে আগত চাষীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা এবং তথ্যের আদান–প্রদান করেন। মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা আক্রান্ত পুকুর থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো ষ্টার্লিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কিছু নমুনা মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক–এর কাছে পাঠানো হয়। তিনি এগুলো NACA–এর মাধ্যমে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ডের আক্যুয়াটিক এ্যানিমেল হেলথ্ রিসার্চ ইন্সটিট্যুটে (AAHRI) প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে আমি NACA থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পেয়ে যাই এবং ষ্টার্লিং

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৎস্য অধিদপ্তর তাদের ফলাফল পেয়ে যায়। প্রতিবেদনগুলো খুবই আশঙ্কাজনক।

AAHRI হতে মিঃ হাসানাই কংকিও, NACA কোঅর্ডিনেটরের প্রেরনকৃত প্রতিবেদন ঃ AAHRI নমুনাগুলো বিশ্লেষণ করেছে এবং 'সাদা দাগ রোগ' সংক্রান্ত সমস্যাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এ রোগটি এশিয়ার অনেক দেশে দেখা দিয়েছে এবং সম্প্রসারিত/আধানিবিড় ও নিবিড় চাষ পদ্ধতির খামারগুলোতে আক্রান্ত হয়েছে এবং আপনাদের সমস্যার পেছনে এ কারণটি কিছুটা দায়ী (হলুদ মাথা বিশিষ্ট ভাইরাস নয়)।

যুক্তরাজ্যের ষ্টার্লিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জেমস ফে. টার্নবুল এর প্রতিবেদন ঃ "সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল হচ্ছে যে, এটি নিশ্চিতভাবে SEMBV (সিষ্টেমেটিক এষ্টোডারমাল এবং মেসোডারমাল ব্যাকিউলো ভাইরাস, হোয়াইট স্পট, সাদা দাগ বা চীনা ভাইরাস"

উপরোক্ত দুটো আলাদা প্রতিবেদন থেকে এটি স্পষ্ট যে, 'সাদা দাগ রোগ' ব্যাপক মৃত্যু এবং বহুল ক্ষতির কারণ যদিও দেখা গেছে যে, সাদা দাগ রোগের জন্য ভাইরাসই দায়ী এবং ব্যাপকহারে মৃত্যুর জন্য প্রাথমিক রোগজীবাণু দায়ী। অন্যান্য রোগ জীবাণু যেমন ঃ M.B.V. (মনোডন ব্যাকিউলো ভাইরাস), S.V. (সিষ্টেমেটিক ভিব্রিওসিস), H.E. (হেমোসাইটিক এন্টারাইটিস) প্রোটজোয়া এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামকও এর সাথে সংযুক্ত । ধরে নেয়া হয় যে, যখন চিংড়ি সাদা দাগ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন অন্যান্য রোগজীবাণুগুলো চিংড়িকে আক্রমন করার সুযোগ পায়, যার কারণে পরিশেষে দ্রুত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে মৎস্য অধিদপ্তর রোগবালাই বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশমালাসহ একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে। পুস্তিকাটিতে মৎস্যচাষী এবং সরকারী প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসরণ করার জন্য কিছু স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী "করণীয়" এবং "করনীয় নয়" সুপারিশমালা রয়েছে। কিন্তু কম সংখ্যক চাষীই এ সুপারিশগুলো অনুসরণ করেছেন। উপরন্তু, সে সময়ে রোগবালাই সমস্যা উদ্বেগজনক ছিলনা এবং আমাদের দেশে ভাইরাল রোগ বিস্তারের প্রকৃত জীবাণু সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম না। তাই, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে যখন গোটা উপকূলীয় অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গা থেকে চিংড়ির ব্যাপক মৃত্যুর খবর আসতে থাকলো তখন আমরা এ ব্যাপারে সজাগ হলাম। আমরা তখন সমস্যাটিকে সম্যকভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম। উৎপাদনে এ সমস্যার নেতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে মৎস্য বিভাগ ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। এই টাস্কফোর্সের দায়িত্ব হচ্ছে-সমস্যাটি সম্যকরূপে মূল্যায়ন করা, নতুন তথ্য প্রকাশ করা, জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র এবং টিভিতে নির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রকাশ করা। এর উদ্দেশ্য ছিল যতটা সম্ভব ক্ষতির পরিমাণ কমানো এবং ইতিমধ্যে যে সকল চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের দ্বিতীয় দফায় ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা। টাস্কফোর্স এরকম কাজই করেছিল। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত অন্তত এ বছরের জন্য রোগবালাই সমস্যা কিছুটা কমেছে। কিন্তু জুলাই এর শেষের দিকে বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা ও কক্সবাজারের বেশ কিছু জায়গা হতে আশঙ্কাজনক কিছু তথ্য আসছে।

গত পাঁচ বছরে চিংড়ি উৎপাদিত আওতাধীন এলাকা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমাদের দেশে বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি সেক্টর স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৫ সাল থেকে ক্রমান্বয়িক এবং টেকসই বৃদ্ধি থেমে গেছে। যদি একে রোধ করা না যায় তাহলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, ১৯৯৬ সালের সম্পূর্ণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হবে।

বছর ওয়ারী চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ

বছর	মাথাসহ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস (%)
১৯৯১-৯২	২১৭৯২	-
১৯৯২-৯৩	২৫০৪২	১৪.৯১
১৯৯৩-৯৪	২৮৭৩০	১৪.৭২
১৯৯৪-৯৫	৩৪২৩১	১৯.১৪
১৯৯৫-৯৬	৩২৮৬০	(-৪.০০)
১৯৯৬-৯৭	-	সম্ভবত উৎপাদন হ্রাস পাবে

আমাদের সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং একটি দীর্ঘ উপকূলীয় সীমারেখা যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে চিংড়ি পাওয়া যায়। আমাদের অর্থনীতির একটি শক্ত খুঁটি হিসেবে এই সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন সাধন করতে পারি। রোগবালাই সমস্যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চিংড়ি চাষের সম্প্রসারিত/আধানিবিড় বা নিবিড় পদ্ধতিতেও প্রাদুর্ভূত হয়েছে। আজকের দিনের এই উন্মুক্ত এবং গণযোগাযোগের আবর্তে আমরা একে এড়িয়ে যেতে পারিনা, কিন্তু এই নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে এবং টেকসই পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে সীমিত গন্ডিতে রোগবালাই সমস্যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

রোগবিস্তার এবং ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণ নির্ণায়কসমূহ

১. উপকূলীয় এলাকা এবং পানির বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিকগত পরিবেশ রক্ষার্থে সুনির্দিষ্ট আইন এবং ব্যবস্থাপনার অভাব।

২. অপরিকল্পিতভাবে চাষভূক্ত এলাকার সম্প্রসারণ।

৩. অধিক মজুদের ঘনত্ব যা ঘেরের/পুকুরের বহন ক্ষমতার জন্য চাপ সৃষ্টি স্বরূপ।

৪. মুনাফাতাড়িত উদ্যোক্তাদের লোভী মনোভাব।

৫. রাসায়নিক সার এবং খাদ্যের অবাধ অপব্যবহার রোধকল্পে কার্যকরী আইনের অভাব।

৬. ঘেরের সক্রিয়তা এবং পরিবেশগত দিক থেকে অনুকূল উৎপাদন পদ্ধতির ওপর গবেষণার অভাব।

৭. উপকূলীয় পানির দূষণ এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির ধ্বংস সাধন।

টেকসই উৎপাদনের জন্য করণীয়

১. সকল চিংড়ি খামারসমূহকে অবশ্যই মৎস্য অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রিভূক্ত হতে হবে।

২. একটি নির্দিষ্ট চিংড়ি খামারের ৩০% ভাগ জমি পানি সংরক্ষণে ব্যবহার করতে হবে।

৩. পর্যায়ক্রমিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জৈবিক ব্যবস্থাপনা করা। উদাহরণ স্বরূপ চিংড়ি চাষের পর আমন ধান চাষ করা। প্রথম ফসল চিংড়ি, দ্বিতীয় ফসল লবণাক্ততা সহ্যকারী মাছ চাষ। প্রথম বছর চিংড়ি, দ্বিতীয় বছর মাছ তারপর আবার চিংড়ি এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্যান্য ভিন্ন ধরনের ফসল ইত্যাদি।

৪. সহজে এবং দ্রুত পরীক্ষা করার জন্য একটি জাতীয় পরীক্ষাগার স্থাপন করা। বাজারজাতকরণের অনুমতি প্রদানের পূর্বে রোগবালাই চিহ্নিত করা, বিশ্লেষণ করা এবং সকল প্রকারের চিংড়ি খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি পরীক্ষা করা।

৫. মৎস্য অধিদপ্তরের উপযুক্ত ব্যক্তির সরাসরি তত্বাবধান ব্যতিরেকে রোগবালাই অধ্যুষিত ঘের হতে পানি অপসারণ নিষিদ্ধ করা।

৬. চিংড়ি পোনা এবং খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংক্রামিত রোগ প্রতিরোধার্থক কার্যক্রম জোরদার করা এবং দ্রুত পরীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা।

৭. রোগমুক্ত এবং টেকসই স্থানীয় ব্রুডষ্টকের উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত জরুরী। সেই সাথে আমাদের হ্যাচারিগুলোতে প্রজননের পূর্বে প্রাকৃতিক রোগমুক্ত ব্রুডষ্টক মজুদ করা।

৮. প্রাকৃতিক উপায়ে পোনা চাষ এবং কোন প্রকার ভাইরাসজনিত সংক্রামক দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কিনা তা সময়ে সময়ে পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত নিয়মনীতি প্রণয়ন করা।

৯. প্রধান চিংড়ি চাষভূক্ত এলাকার থানা/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্য বিভাগের কর্মী নিয়োগ করা।

১০. স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে চাষীদের সংগঠন তৈরিতে অনুপ্রাণিত করা। এই সংগঠনের মাধ্যমে আন্তরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং চিংড়ি সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া ও মূল্যায়ন করা।

১১. ম্যানগ্রোভ বনভূমির ধ্বংসকে থামানো এবং উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের জন্য দ্রুত শ্রমসাধ্য কার্যক্রম হাতে নেয়া।

১২. উপকূলীয় এবং নদ-নদী এলাকায় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থাপনাপূর্ণ উপায় গ্রহণ করা।

১৩. চিংড়ি চাষভূক্ত এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ করা যেমন ঃ বাঁধ, রাস্তা, বিদ্যুৎ, স্লুইস গেট এবং খাল খনন/পুনঃখনন ইত্যাদি।

১৪. জরুরী ভিত্তিতে চিংড়ি চাষ ও ব্যবসার সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করে জাতীয় চিংড়ি উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা।

(মূল ইংরেজী থেকে ভাষান্তরিত)

বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার

মোঃ মাসুদুর রহমান, পরিচালক (সামুদ্রিক)
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। এর মাঝে খুলনা অঞ্চলে প্রায় ১,১০,০০০ হেক্টর ও কক্সবাজার অঞ্চলে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ চালু রয়েছে। প্রায় ৩০% জমিতে বর্তমানে সারা বছর চিংড়ি চাষ করা হয়। বাকি জমিতে চিংড়ির একটি ফসল উৎপাদিত হয়। কক্সবাজার অঞ্চলে লবণের সাথে চিংড়ি এবং খুলনা অঞ্চলে চিংড়ির সাথে ধানের চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে কক্সবাজার অঞ্চলে লবণ এবং খুলনা অঞ্চলে ধান প্রধান ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। সাধারনভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে চিংড়ির একক চাষ এবং অন্য ফসলের সাথে পর্যায়ক্রমিক চাষ প্রচলিত।

পৃথিবীর চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশ সমুহের হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদনের হার বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। সে সকল দেশে চাষের নিবিড়তা এবং সে সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চাষীরা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ এবং রোগ সংক্রমণ জাতীয় নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশে তাদের পরিবেশ, স্থান, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির আলোকে চিংড়ি চাষের প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগের বিষয়টিও বিবেচিত হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে এ প্রবণতা তেমন ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সকল চিংড়ি (বাগদা) চাষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেগুলোকে ঃ চাষ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, মজুদহার ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-(ক) প্রচলিত (Extensive) (খ) উন্নত প্রচলিত (Improved Extensive) ও (গ) আধানিবিড় (Semi-Intensive)।

প্রচলিত চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ এ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত চিংড়ি চাষের পুকুর পরিকল্পিত উপায়ে নির্মিত হয় না। এ ধরনের খামারে পুকুরের আয়তন প্রায় ক্ষেত্রেই ২০ হেক্টরের বেশি হয়ে থাকে। এসব পুকুরে পানি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি বা পানি ব্যবস্থাপনার তেমন কোন সুব্যবস্থা থাকে না। এ পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি ছাড়াও অন্যান্য মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি একত্রে আবাদ করা হয়। এক্ষেত্রে চাষ চলাকালে কোন বাড়তি খাবার ব্যবহার করা হয় না। সাধারনত প্রতি বর্গ মিটারে ১-২ টি পোনা মজুদ করা হয়। প্রতি হেক্টরে ২০০-৩০০ কেজি বাগদা চিংড়ি উৎপাদিত হয়।

উন্নত প্রচলিত চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ এ জাতীয় চাষ পদ্ধতিতে খামারের জন্য নির্দিষ্ট নক্সা প্রণয়ন করে চাষের জন্য পুকুর, পানি নিষ্কাশনের জন্য খাল ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত সুবিধাসহ প্রয়োজনে পাম্প ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন সহায়ক ব্যবস্থাসহ সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রতি বর্গমিটারে ৩-৫ টি পোনা মজুদ করে বছরে দুইটি ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হলে এ জাতীয় চাষের মাধ্যমে প্রতি ফসলে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়।

আধানিবিড় চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ দেশে এই জাতীয় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হলেও পরিবেশ দূষণ ও রোগের কারণে অনেক উদ্যোক্তা এ ধরনের চাষে বর্তমানে পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এ চাষ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন চিংড়ি উৎপাদন করা যায়। এ জন্য প্রতি বর্গ মিটারে ২০-২৫ টি পোনা মজুদ করে উন্নতমানের পিলেট খাদ্য সরবরাহ, উন্নত

পানি ব্যবস্থাপনা এবং এরেটর ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন করা যায়। উপযুক্ত পরিবেশে বা স্থানে এ জাতীয় খামার স্থাপন করা না গেলে ফসলহানির সম্ভাবনাই বেশি থাকে। বর্তমানে বিশেষ করে কক্সবাজার অঞ্চলে যে সকল আধানিবিড় খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দূষণমুক্ত এলাকায় করা হয়নি।

চিংড়ি চাষের সাধারণ ব্যবস্থাপনা

বাগদা চিংড়ি চাষের সফলতা, ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, স্থান, দক্ষতা, পুঁজি, অবকাঠামোগত সুবিধা, উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে আধুনিক চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনাকে নিম্নোক্ত ধাপে ভাগ করা যায় যা পর্যায়ক্রমে চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন–

চিংড়ি চাষের উপযুক্ত স্থানে খামার নির্মাণ করা গেলে চাষ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনে সফলতা লাভ করা যায়।

খামারের সঠিক নক্সার মাধ্যমে খামারে নিম্নোক্ত অবকাঠামোসমূহ নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন– বেষ্টনী বাঁধ, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল, নার্সারি ও পালন পুকুর, পানি উত্তোলন ও নিষ্কাশন গেট ইত্যাদি।

পুকুরে চাষের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, এতে অনাহুত প্রাণী নিয়ন্ত্রণ ও রোধ, মাটি শোধন ইত্যাদি অন্যতম।

সুস্থ সবল রোগমুক্ত পোনা নার্সারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পালন পুকুরে মজুদকরণ।

পানির উর্বরতা বৃদ্ধি, গুণাগুণ সংরক্ষণ ও পানি সঞ্চালনের মাধ্যমে পুকুরে উপযুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণ। পানি ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে পানিতে উপযুক্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন যা চিংড়ির খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পুকুরে পানির গুণাগুণ রক্ষায় সাহায্য করে।

সঠিক মাত্রায় চাহিদানুযায়ী উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ। চিংড়ি খামারের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক, এ জন্য খামারের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের যথেষ্ট দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হয়।

চিংড়ির স্বাস্থ্য পরিচর্যা, রোগনির্ণয় পূর্বক তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা।

উপযুক্ত সময়ে চিংড়ি আহরণ এবং উপযুক্ত মূল্যে বাজারজাতকরণ।

লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

উল্লেখিত সকল বিষয় একটি খামারের পক্ষে অনেক সময় সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিংড়ি চাষে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ ও চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে অনেকগুলো সমস্যা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (১) জমি মালিকানায় স্বচ্ছলতার অভাব, (২) সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুপস্থিতি (৩) সঠিক গুনগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও উপকরণ সরবরাহের নিশ্চয়তা (৪) ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের সততা ও দক্ষতা ইত্যাদি। বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থা, চাষের জমির স্বচ্ছতা, একই জমিতে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ফসল উৎপাদন ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশে প্রচলিত চাষ পদ্ধতি হুবহু আমাদের দেশে প্রয়োগ সম্ভব নয়। এছাড়া যে কোন প্রযুক্তি অবলম্বনের পূর্বে স্থানীয় পরিবেশে তার উপযোগিতা যাচাই করাও প্রয়োজন। অত্যন্ত সত্য কথা এই যে, আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বাস্তব কোন পরীক্ষা–নিরীক্ষা বা গবেষণা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কোন লাগসই প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে দেশে কোন খামার গড়ে ওঠেনি। বরং একে অপরের দেখাদেখি বিভিন্নভাবে খামারের প্রসার ঘটেছে। অন্যান্য উন্নত দেশের উন্নত ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে কতিপয় প্রযুক্তিও বাংলাদেশে প্রয়োগ করা যায়। বাংলাদেশের প্রচলিত চাষ পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য নিম্নে কতিপয় প্রযুক্তির উল্লেখ করা হলো যা ইতোমধ্যে দেশের অনেক খামারে প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

চিংড়ির পোনা সরবরাহ ও মজুদ

দেশে বর্তমানে হ্যাচারিতে যে পরিপক্ক পোনা উৎপাদিত হয় তা প্রকৃত চাহিদার মাত্র ৫ শতাংশ। প্রায় সকল খামারই প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনার ওপর নির্ভরশীল। এ সমস্ত পোনা সঠিকভাবে সংগ্রহ, পরিবহণ ও সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে পুকুরে মজুদকালে অথবা মজুদ পরবর্তী সময়ে এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। দেশে সংগৃহীত পোনার মাত্র ১৯ শতাংশ আহরণযোগ্য সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

এ অবস্থা উন্নয়নের জন্য পোনা আহরণ এলাকায় নার্সারি স্থাপন করা যায়, এ সমস্ত নার্সারিতে পোনা আহরণকারী স্বল্পতম সময়ে ধৃত পোনা সরবরাহ করতে পারেন। নার্সারিতে পোনা পরিচর্যার পর অক্সিজেন ব্যাগে করে খামারে সরবরাহ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন করা যায়। উল্লেখ্য বর্তমানে এ পদ্ধতি কেবলমাত্র আধানিবিড় চিংড়ি খামারে এবং বিদেশ থেকে পোনা আমদানির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। বর্তমানে অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়িতে অস্বাস্থ্যকর ও পীড়নমূলক পরিবেশে যেভাবে পোনা পরিবহণ করা হয় তা ক্রমান্বয়ে অপসারিত হলে চিংড়ি পোনার মৃত্যুহার হ্রাস করে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে আশা করা যায়। সুস্থ সবল পোনা খামারে মজুদ করা প্রত্যাশিত ফসল উৎপাদনের একটি পূর্বশর্ত। এ ব্যবস্থা প্রচলিত হলে প্রকৃতিক চিংড়ি পোনা ধরার হার কমবে এবং সে চিংড়ি পোনার সাথে অন্যান্য ক্ষুদ্র জলজ জীবও বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

পোনা পরিবহণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি প্রচলনের জন্য বাড়তি যে খরচ অর্থাৎ অক্সিজেন সিলিন্ডার, পলিথিন ব্যাগ, পোনা সাময়িক পালনের জন্য সিমেন্ট ট্যাংক, পাম্প ইত্যাদি জন্য যে খরচ হবে তা পোনার মৃত্যুহার রোধ করে পুষিয়ে নেয়া যায়। পোনা সমেত পলিথিন ব্যাগ যে সমস্ত তাপ নিরোধক পাত্রে পরিবহণ করা হবে তার আকৃতি বা ধারণ ক্ষমতা এমন হবে যে, একজন শ্রমিক পোনাসমেত পাত্রটি অতি সহজেই খামার এলাকায় নিয়ে যেতে পারেন। এ জাতীয় পরিবহণ পাত্রের প্রচলন ইতোমধ্যে অনেক এলাকায় শুরু হয়েছে। এখন কারিগরি সহায়তা ও ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে মাঠ পর্যায়ে এ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো যায়।

খামার ব্যবস্থাপনা

প্রচলিত চাষ পদ্ধতির খামারে বর্তমানে হেক্টর প্রতি ১৫–২০ হাজার পোনা মজুদ করা হয়। চিংড়ি আহরণের পর দেখা যায় যে, মজুদকৃত পোনার মাত্র ৩০% থেকে ৩৫% চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী অর্থাৎ ৫ থেকে ৭ হাজার চিংড়ি খামার থেকে আহরণ করা যায়। বাকি চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে খামারেই মারা যায়। এ জন্য প্রচলিত চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নে নিম্নোক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায়

পোনা মজুদ ঃ খামার এলাকায় নার্সারিতে প্রতিপালিত চিংড়ি মূল চাষ এলাকায় মজুদ করতে হবে। নার্সারিতে ৩–৫ গ্রাম পর্যন্ত পোনা প্রতিপালন করে মূল চাষ এলাকায় পোনা মজুদ করা গেলে চাষকালীন মৃত্যু ঝুঁকি কমানো সম্ভব। ইতোমধ্যে অনেক খামার নার্সারি প্রতিপালিত চিংড়ি পোনা মজুদ করে চাষকালীন মৃত্যুহার ৫০–৫৫% পর্যন্ত কমাতে সক্ষম হয়েছে।

চাষ এলাকার পানির গভীরতা বৃদ্ধিকরণ ঃ বর্তমান প্রচলিত চাষ পদ্ধতির বেশির ভাগ খামারে চাষ উপযোগী পানির গভীরতা কম অর্থাৎ এতে ১ মিটার পানি ধারণ করা যায় না। প্রায় খামারে পুকুরের বাঁধ দুর্বলভাবে নির্মিত হওয়ায় এবং বাঁধের উচ্চতা ১.৫ মিটার উঁচু না থাকার ফলে চাহিদা অনুযায়ী পানির গভীরতা রক্ষা করা যায় না। এছাড়া অনেক খামারে জমির উচ্চতা বেশি হওয়ায় এবং পানি উত্তোলন গেইটের পানি প্রবাহ ক্ষমতা কম থাকায় অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খামারে উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। খামারে বাঁধের উচ্চতাসহ একে মজবুত করা বাঞ্ছনীয়। চাষ এলাকার জমির উচ্চতা সর্বত্র এক রকম থাকেনা, এ ক্ষেত্রে জমির উচ্চতার ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণ করে প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। পাশাপাশি খামারের পানি উত্তোলন গেইটের আয়তন ও সংখ্যা বাড়িয়ে বেশি পানি উত্তোলনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কমপক্ষে এক জোয়ারে খামারের পানির ৩০% পানি পরিবর্তন করা যায় সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর্থিক বিশ্লেষণে লাভজনক বিবেচিত হলে খামারে পাম্পের সাহায্যেও পানির প্রবেশ করানো যায়।

খামারে পানির গভীরতা ও পরিমাণ বেশি থাকলে দ্রবীভূত অক্সিজেনও বেশি থাকে, এবং খামারে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। পানির গভীরতা বেশি রাখা গেলে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পি এইচ ইত্যাদি হঠাৎ পরিবর্তন হতে পারেনা। অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণও পানিতে নিয়ন্ত্রিত থাকে। এ জন্য চিংড়ি বড় হবার সাথে সাথে আনুপাতিক হারে খামারে পানির পরিমাণও বেশি রাখতে হবে।

পানি থিতিয়ে রাখা ঃ নদী বা খালের পানি সরাসরি চাষ এলাকায় সরবরাহ না করে মধ্যবর্তী একটি থিতানো পুকুরে পানির ভাসমান জৈব ও অজৈব পদার্থ থিতিয়ে নিয়ে পুকুরে প্রবেশ করানো গেলে ভালো হয়। এ জন্য খামারের এলাকা নষ্ট হলেও বাড়তি চিংড়ি উৎপাদনের মাধ্যমে তা পুষিয়ে নেয়া যায় এবং চিংড়ির স্বাস্থ্য পরিচর্যায় যথেষ্ট সহায়ক হয়।

পানির উর্বরতা বৃদ্ধিকরণ ঃ পানিতে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে কিনা এ বিষয়ে চাষীদের অনেকেরই ধারণা নাই। আবার অনেকে পুকুরে সার ও চুন প্রয়োগ করেই মনে করেন পুকুরে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন লবণাক্ত পানি পুকুরে ঢুকলে এমনিতেই প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হবে। পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত প্লাঙ্কটন রয়েছে কিনা তা পানির রং এবং স্বচ্ছতা দেখেই প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যায়। প্লাংকটনের একটি উর্বর পুকুরে পানির রং সবুজাভ হলুদ হয়ে থাকে। প্লাংকটন পুকুরে চিংড়ির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকারক শ্যাওলা জন্মাতে বাধা দেয়। পানিতে প্লাঙ্কটন উৎপাদন, রক্ষা বা বৃদ্ধির জন্য পানির পিএইচ, অ্যালকালিনিটি এবং সারবস্তু (nutrients) চাহিদানুযায়ী থাকা বাঞ্ছনীয়। একজন সাধারণ চাষীর পক্ষে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য পুকুর প্রস্তুতির সময় হেক্টর প্রতি ২৫০-৩০০ কেজি চুন ব্যবহারপূর্বক জোয়ারের পানি খামারে তুলে হেক্টর প্রতি ১৫-২০ কেজি ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১ঃ১ অনুপাতে প্রতিবার পানি পরিবর্তনের পর ব্যবহার করা যায়। পানির স্বচ্ছতা কমে গেলে বা প্লাঙ্কটনের অধিক উৎপাদন হলে অর্থাৎ পানি যদি বেশি সবুজ হয়ে যায়, তবে সার ব্যবহার করা উচিত নয়। খামারে জৈব সার ব্যবহার করা ভালো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জৈব সার সংগ্রহ ও সরবরাহ সম্ভব হয় না।

চাষ এলাকার অনাহুত প্রাণী নিয়ন্ত্রণ ঃ চাষ এলাকায় অনেক জলজ রাক্ষুসে প্রাণী চিংড়িকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে মজুদকৃত চিংড়ির সংখ্যা কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি চাষ এলাকায় প্রবেশ করে পালিত চিংড়ির খাদ্য ও বাসস্থানে ভাগ বসিয়ে প্রত্যাশিত উৎপাদন কমিয়ে দেয়। রাক্ষুসে প্রাণী দমন বা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি খামারে নেবার সময় ছেঁকে নেয়াই উত্তম। এ জন্য প্রতি ইঞ্চিতে ২৪টি ছিদ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫৭৬টি ছিদ্রযুক্ত নেট দ্বারা পানি ছেঁকে নেয়া যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ ছিদ্রযুক্ত নেট মূল পানি উত্তোলন গেটে স্থাপন করা হলে পানি উত্তোলনের হার অনেক কমে যায়। এ জন্য থিতান পুকুর থেকে পানি থিতিয়ে নিয়ে মূল চাষ এলাকায় নেটের মাধ্যমে ছেঁকে নেয়া গেলে খামারে অনাহুত প্রাণী অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রাক্ষুসে বা অনাহুত প্রাণী নিয়ন্ত্রণের জন্য টি সীড কেক বা অন্যান্য জৈব রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রচলিত চাষ পদ্ধতির খামারে ব্যবহার আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়। খামারে মাঝে মাঝে জালের সাহায্যে অনাহুত চিংড়ি ও মাছ ধরে ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমানো যায়। চিংড়ি খামারে টানা বেড় জালের প্রচলন নেই বল্লেই চলে, কম গভীর পুকুরে এ জাল ব্যবহার করা বেশ কষ্টকর। পানির গভীরতা ১ মিটার রেখে মাঝে মাঝে এ জাতীয় টানা জালের সাহায্যে পুকুরের অনাহুত চিংড়ি ও মাছ ধরে তা বাজারজাত করা হলে খামারে একটি বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হয়। বাগদা চিংড়ির সাথে হরিণা/লাইল্যা, চাকা ইত্যাদি চিংড়ি মজুদ না করা হলেও জোয়ারের পানিতে এ সমস্ত চিংড়ি খামারে প্রবেশ করে এবং অল্প সময়ে এ সমস্ত চিংড়ি বড় হয়ে যায়। এ সমস্ত চিংড়ি প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর ধরে ফেলতে হয়। নতুবা এরা স্বাভাবিকভাবে পুকুরে মারা যায়। সঠিক সময় ধরা গেলে খামারের মোট আয়ের প্রায় ১০% এ সমস্ত চিংড়ি থেকে পাওয়া সম্ভব।

পোনা মজুদকালে খাপ খাইয়ে সুস্থ সবল পোনা মজুদকরণ ঃ বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, খামারের পুকুরে পোনা এনে সরাসরি ছেড়ে দেয়া হয় ফলে মজুদকৃত পোনা পরিবেশগত তারতম্যের কারণে দুর্বল হয়ে মারা যায় অথবা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতি অথবা হ্যাচারিতে উৎপাদিত চিংড়ি পোনার বিচরণ ক্ষেত্রে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী চাষ এলাকার পানির চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে বা কিছুটা তারতম্য থাকে। যেমন তাপমাত্রা, পিএইচ, লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদির তারতম্য প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। পোনা পুকুরে মজুদের পূর্বে দীর্ঘ সময় (অন্তত ১-২ ঘন্টা) পর্যন্ত পুকুরের পানির সাথে পরিবহণকৃত পানির আস্তে আস্তে সংযোজন ও অপসারণপূর্বক খাপ খাইয়ে মজুদ করা উচিত। চিংড়ি পোনা কতটা সবল ও সুস্থ তাও মজুদের সময় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ জন্য পোনার দেহের রং, চলাচল ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা উচিত। আতস কাঁচের সাহায্যে চিংড়ি পোনার দেহে আঘাত বা পরজীবীর সংক্রমণ রয়েছে কিনা তা দেখা যায়। পাশাপাশি পুকুরে পোনা মজুদের সময় একটি হাপায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পোনা (১০০০) রেখে ২৪ ঘন্টা পর এর বেঁচে থাকার হার নির্ণয় করা যায়।

মজুদকৃত চিংড়ি কি পরিমাণ বেঁচে আছে তা ধারণা করা না গেলে পুকুরে ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা যায় না এবং কাম্য ফসলের উৎপাদনের বিষয়েও ধারণা নেয়া যায় না। পোনার বাঁচার হার জানা গেলে খামারে পোনা পুনঃ মজুদ করা প্রয়োজন হলে তা মজুদ করা যায়, এতে খামারের উৎপাদন সম্পর্কে চাষী নিশ্চিত হতে পারেন।

পরিবর্তিত পরিবেশে পোনা কতটা সহনশীল তা নিরূপণের জন্য ১০০ পোনা একটি পাত্রে নিয়ে পানির লবণাক্ততা হঠাৎ কমিয়ে তার প্রতিক্রিয়া পোনার ওপরে কিরূপ তা লক্ষ করা যায়। পাত্রে স্রোত সৃষ্টির মাধ্যমেও পোনার চলাফেরা লক্ষ করে এর সুস্থতা যাচাই করা যায়। চিংড়ি পোনার ধর্ম স্রোতের বিপরীতে চলা, তাই পাত্রে সৃষ্ট স্রোতের বিপরীতে যদি পোনা সাতার কাঁটে এবং মাঝে দলা না বাঁধে তবে অনুমান করা যায় যে পোনা যথেষ্ট সুস্থ ও সবল।

উপযুক্ত সময়ে চাষ

আমরা জানি বাগদা চিংড়ি ১০ থেকে ২০ পিপিটি লবণাক্ততা, ২৭-৩০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা এবং ৭.৫ থেকে ৮.৫ পিএইচ মাত্রাযুক্ত পানিতে ভালোভাবে বাস করতে পারে এবং উর্বর খাদ্যযুক্ত পানিতে এর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় সে সময় পানির লবণাক্ততাও উপযোগী পর্যায়ে থাকে। এ সময় থেকে জুন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ অনবরত বৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত চিংড়ি চাষ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে। যদি প্রাকৃতিক পোনার স্বল্পতার কারণে চাষ শুরু করা না যায় তবে হ্যাচারি বা নার্সারিতে মজুদকৃত পোনা সংগ্রহ করে চাষ শুরু করা উচিত। যে সময় প্রাকৃতিক পরিবেশ বৃষ্টিপাতের কারণে হঠাৎ পরিবর্তিত হয় সে সময় চিংড়ি চাষ করা উচিৎ নয়। আধানিবিড় বা উন্নত সনাতন চাষ পদ্ধতির খামারে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে দুইটি ফসল উৎপাদন করা গেলেও প্রচলিত খামারে দুইটি ফসল উৎপাদন প্রায়ই সম্ভব হয়না। এ জন্য চিংড়ি চাষের অনুপযুক্ত সময়ে এলাকা ভিত্তিতে অন্য ফসল যেমন ধান বা মাছের চাষ করা যায়। অন্য ফসলের চাষের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন ছাড়াও আর্থিকভাবে বেশি লাভজনক হওয়া যায়। লবণাক্ততা প্রতিরোধে সক্ষম ধান ও মাছ চাষ করে উপকৃত হবার বেশ কিছু উদাহরণ ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সারা বছর চাষ করে যে পরিমাণ চিংড়ি উৎপাদন করা যায় তা একটি ফসলে ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব।

রোগ নিয়ন্ত্রণে চিংড়ির সাথে অন্য মাছের চাষ

খামারের পুকুরে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে পুকুরে পানির গুণাগুণ হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে চিংড়ির রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। চাষকালীন সময়ে আধানিবিড় খামারে জৈব পদার্থে বায়ু সঞ্চালনের জন্য এরেটর ব্যবহৃত হয়। উন্নত চাষ পদ্ধতি বা প্রচলিত চাষ পদ্ধতির খামারে এরেটর ব্যবহৃত হয় না। এ সমস্ত খামারে লবণাক্ত পানির তৃণভোজী মাছ যেমন পাঙ্গে/বাটা বা ভাঙ্গন জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করা যায় তবে এ সমস্ত মাছ পুকুরে জৈব পদার্থ কমাতে ব্যাপক সাহায্য করে। এ সমস্ত মাছের দ্রুত চলাচলের ফলে পুকুরের বিষাক্ত পদার্থ সহজে বায়বীয় হতে পারে। এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিতে এ জাতীয় মাছের পোনা পাওয়া যাচ্ছে এবং চাষ এবং চাহিদা বৃদ্ধি পেলে হ্যাচারিতে এ সমস্ত মাছের পোনা উৎপাদন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের বিভিন্ন চাষ পদ্ধতির খামারে ইতোমধ্যে উপরিবর্ণিত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে উৎপাদনে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। এ সমস্ত প্রযুক্তি খুব সহজে একটি খামারে প্রয়োগ করা যায় এবং চাষীর নিজস্ব দক্ষতা ও জ্ঞানই খামার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট। নিবিড় চাষ প্রযুক্তি আমাদের দেশের জন্য কতটা উপযোগী তা এখনো বিতর্কিত। বাংলাদেশে ১,৪০,০০০ হেক্টর জমির প্রায় ১,২০,০০০ হেক্টর জমিতে প্রচলিত চাষ পদ্ধতি চালু রয়েছে। এ সমস্ত খামারে সহজে গ্রহণযোগ্য চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে হেক্টর প্রতি যদি ৫০ কেজি চিংড়িও বেশি উৎপাদন করা যায় তবে দেশে প্রায় ৬০০০ মেট্রিক টন অধিক চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ জন্য অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন বা অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের তেমন প্রয়োজন হবে না। বাংলাদেশের পরিবেশ, জমি এবং জনশক্তি বিবেচনায় অনেক বিজ্ঞানী ধারণা করছেন যে, বাংলাদেশ বর্তমান উৎপাদনের কয়েক গুণ বেশি চিংড়ি উৎপাদন করতে পারবে, তবে এ জন্য প্রয়োজন এমন প্রযুক্তি যা আমাদের চাষ ক্ষেত্রে সহজে প্রয়োগ করা যায়। বর্তমানে যে প্রযুক্তি উপযুক্ত বলে বিবেচিত আগামী দিনে তা অনুপযুক্ত হয়ে নতুন প্রযুক্তির প্রসার ঘটতে পারে।

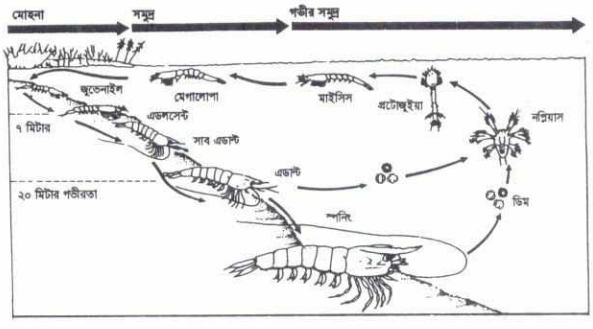

পরিবেশ সহনীয় বাগদা চিংড়ি চাষ

ডঃ এম. এ. হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
নাহিদ সুলতানা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, কক্সবাজার

বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে হিমায়িত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রায় ৯শত কোটি টাকার হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৩ শত কোটি টাকা। সদ্য সমাপ্ত আর্থিক বছরে এর পরিমাণ বিগত অর্থবছরের রেকর্ড পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সিংহভাগই আসে মাথা ছাড়ানো হিমায়িত চিংড়ির লেজ রপ্তানি করে। অবশ্য রপ্তানিকৃত চিংড়ির মাঝে যদিও গলদা ও বাগদা চিংড়ি অন্তর্ভূক্ত তবুও তুলনামূলক বিচারে বাগদা চিংড়ির পরিমাণ অনেক বেশি।

আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এমনকি মৎস্য সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট কারো কারো মতে বছরে বাংলাদেশ কয়েক বিলিয়ন ডলারের চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানিতে সক্ষম। এ জাতীয় হিসেবের উৎস হচ্ছে আমাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণের সাথে সম্ভাব্য একক খামারে আধানিবিড় চাষের মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদনকে গুণ করে নেয়া। এটি হলো মুদ্রার এক পিঠ, যার সাথে বাস্তব অবস্থার কোন মিলই নেই। মুদ্রার অপর পিঠ হচ্ছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমুদয় চিংড়ি চাষই তাইওয়ান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বিপন্ন হয়ে যেতে পারে এর আলামত দেখা গেছে ১৯৯৪ সাল থেকে, যার বিস্তার ঘটছে দিনের পর দিন। একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে সম্ভাব্যতা এবং সামর্থ এক কথা নয় এবং উভয়েরই বহুমাত্রিক দিক আছে। উপকূলীয় সব জমিতে আধানিবিড় চিংড়ি চাষ করা গেলে এবং উচ্চ হারে নীরোগ চিংড়ি উৎপাদন করা গেলে উদ্বেগের কারণ ছিলনা। বাস্তব প্রেক্ষাপট কিন্তু অনেক ভিন্ন। আজ আমাদের দেশে শুধুমাত্র আধানিবিড় চিংড়ি চাষই নয় বরং সনাতন পদ্ধতি এবং উন্নত সনাতন পদ্ধতির চাষও হুমকির সম্মুখীন।

চিংড়ি চাষ আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ক্ষুদ্রাংশ মাত্র যোগান দিলেও রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাগদা চিংড়ি চাষকে আমরা তৈরি পোষাক শিল্পের পরই পুরোপুরি রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। বাগদা চিংড়ি চাষ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ছাড়াও অন্যান্য জলজ প্রাণীর চাষের মতোই দরিদ্র জনগণের আয়ের উৎস ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে এবং বিদ্যুৎকে উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্গম স্থানেও পৌঁছে দেয়। কিন্তু বাগদা চিংড়ি চাষের প্রভাবে বহু ধরনের পরিবেশগত, বাস্তুসংস্থানগত এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়। এসব থেকে পরিত্রাণের জন্য অথবা এসবের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও দক্ষ পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে তা প্রতিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমগ্র বাংলাদেশ একটি বিশাল ব-দ্বীপ যার মোট ভূমির পরিমাণ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ হেক্টর। এর মাঝে মোটামুটি ভাবে ১৭% ভূমিকে উপকূলীয় অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চল বলতে এখানে আমরা সমুদ্রের পানির সংযোগ আছে অথবা মৃদু লবণাক্ত (৫পিপিটি পর্যন্ত) পানি পাওয়া যায় সেসব স্থানকেই বোঝাতে চাই। বর্তমানে আমাদের যতটুকু চাষযোগ্য উপকূলীয় ভূমি আছে তার ৫% মাত্র চিংড়ি চাষের অধীনে। বাংলাদেশে একর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। অবশ্য সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত বাংলাদেশের চিংড়ির

গুণগতমান তুলানমূলকভাবে ভাল। আমাদের উৎপাদিত বাগদা চিংড়ির বেশির ভাগই আসে সনাতনী বা উন্নত সনাতনী খামার থেকে। এই পদ্ধতির উৎপাদন ব্যবস্থায় খুব অল্প ঘনত্বে বাগদা চিংড়ির পোনা ছাড়া হয় এবং চিংড়ি মূলত প্রাকৃতিক খাবারের ওপরই নির্ভরশীল থাকে। অবশ্য উন্নত সনাতনী চাষ ব্যবস্থায় কিছু পরিমাণে কৃত্রিম খাবার প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থায় মূলত কৃত্রিম খাবার অপেক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো হয়। উন্নততর ব্যবস্থাপনার মাঝে এই পদ্ধতিতে রাক্ষুসে মাছ দমন, সুষম প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া প্রভৃতিই প্রধান।

সনাতনী এবং উন্নত সনাতনী চাষ ব্যবস্থায় একর প্রতি উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক কম তবে এসব পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগত মান বিশেষ করে সাইজ, রং, মাংসপেশীর দৃঢ়তা প্রভৃতি দিক দিয়ে (প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতুল্য প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় বিধায়) উন্নততর হয়ে থাকে সনাতনী ও উন্নত সনাতনী চাষ প্রক্রিয়ায় মূলধনের জন্য বিনিয়োগ কম, সর্বোপরি পরিবেশের ক্ষতিসাধন কম হয় এবং পানিদূষণের সম্ভাবনাও কম থাকে।

সমস্যার দিক হলো, ভূমিস্বল্প বাংলাদেশে সনাতনী বা উন্নত সনাতনী চাষ ব্যবস্থা বিস্তারের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন বাড়ানো কষ্টকর, যদিও এই পদ্ধতির চাষে খরচ ও পানিদূষণের সম্ভাবনা কম। এইসব পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দরকার চাষের আনুভূমিক বিস্তার। ঘনবসতিসম্পন্ন বাংলাদেশে কম উৎপাদনশীল চাষ ব্যবস্থার আনুভূমিক বিস্তার কাম্য নয়। উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ইতোমধ্যেই বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, বিশেষত উপকূলীয় বনভূমি উজাড় করে যেসব স্থানে চাষের প্রসার ঘটানো হয়েছে অথবা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় লোনাপানির জলাবদ্ধতার মাধ্যমে যেখানে চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটানো হয়েছে।

চিংড়ি উৎপাদনে উল্লম্ব বিস্তারের জন্য সঙ্গত কারণেই আধানিবিড় বা নিবিড় চাষের প্রসার ঘটানো সবারই কাম্য, কিন্তু এসব পদ্ধতিতে দেশজ এবং আমদানিকৃত সম্পদের বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যধিক ব্যয়সাধ্য এবং পরিবেশের ওপর দারুণভাবে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। আধানিবিড় চাষে পরিবেশ এবং ইকোলজিক্যাল যেসব পরিবর্তন ঘটে পরবর্তীতে তা চিংড়ি চাষকেই হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। তাই চিংড়ি চাষ প্রসারের ক্ষেত্রে অথবা চলমান চাষ প্রক্রিয়াকে চালু রাখার স্বার্থে উল্লম্ব বিস্তারের ব্যাপারে আমাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে চাষব্যবস্থা পরিবেশগত দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা যায়। মনে রাখতে হবে একটি বা দুটি ফসল সার্থক ভাবে উৎপাদন নয়, দীর্ঘ মেয়াদি ভাল ফলন ঘরে তুলতে না পারলে উচ্চ বিনিয়োগ প্রধান চাষব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়।

শুরুতে যে উপাত্ত দেয়া হয়েছে তার আলোকে মনে হতে পারে আমাদের দেশে চিংড়ি চাষাধীন ভূমির পরিমাণ বেশি নয়। অর্থাৎ বর্তমানে যে পরিমাণ লোনাপানির বাগদা চাষযোগ্য ভূমি আছে তার মাত্র ৫% চাষাধীন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো উপকূলীয় কোন ভূমিই কিন্তু পতিত অবস্থায় নেই। বর্তমানের তুলনায় অতিরিক্ত ভূমি বাগদা চিংড়ির চাষাধীনে আনার অর্থ হলো–কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি, জন মানুষের বসতি অথবা উপকূলীয় বনাঞ্চল ধ্বংস না করে এর প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। বিগত কয়েক বছরে বাগদা চিংড়ি চাষীদের মাঝে একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা হলো, সনাতনী বা উন্নত সনাতনী চাষব্যবস্থা থেকেই এক লাফে নিবিড় চাষাধীনে চলে যাওয়া, এ ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া হয়নি তা হলো নিবিড় চিংড়ি চাষ চালু করা এবং চাষপ্রক্রিয়া গতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদি, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। আমরা প্রায়শই ভুলে যাই আধানিবিড় বা নিবিড় চাষ শুধুমাত্র একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং এমন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, তাই একে শুধুমাত্র একটি গতানুগতিক শিল্প ইউনিট হিসেবে বিচার করে বিনিয়োগ করলে ভুল হবে– বরং বিচার করতে হবে একটি জীবন্ত শিল্প ইউনিট হিসেবে।

একক একটি জলাশয় থেকে অধিক হারে চিংড়ি উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ঐ পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন। আমাদের ভাগ্যের কথা যে, বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ির জন্য ব্যবহৃত মোট জমির একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র নিবিড় বা আধানিবিড় চাষের অধীনে আছে (মোট বাগদা চিংড়ি চাষাধীন জমির ১% এর কম), নতুবা বর্তমানে চিংড়ি ভাইরাস রোগের যে প্রকোপ শুরু হয়েছে তাতে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যেত।

আধানিবিড় বাগদা চিংড়ির প্রসার বাংলাদেশে ঘটাতে হবে, প্রয়োজনে ধীর গতিতে। প্রাথমিক ভাবে সনাতনী বা উন্নত সনাতনী চাষের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রতি বর্গ মিটারে পোনার ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন যথাযথভাবে বাড়াতে হবে। এই

পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠলেই আধানিবিড় চাষে যাওয়া যুক্তিযুক্ত। এছাড়াও একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূমি আধানিবিড় চাষের উপযুক্ত কিনা তা চাষ শুরুর পূর্বে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে নির্ধারণ করাও কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। ধীরে ধীরে অল্প ঘনত্বের চাষ থেকে অধিক ঘনত্বের চাষে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হলে অসুবিধার দিকগুলো বেরিয়ে আসে, এতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উন্নত সনাতনী চাষ ব্যবস্থায় যেখানে প্রতি বর্গমিটারে ৪-৫টি চিংড়ি পোনা ছাড়া হয় তা থেকে সরাসরি ২০-২৫ বর্গ মিটারে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। প্রাথমিক অবস্থায় কম ঘনত্বের আধানিবিড় চাষ, যথা প্রতিবর্গ মিটারে ৯-১২টি ছেড়ে, আধানিবিড় প্রযুক্তি সেই অনুপাতে প্রয়োগ করে ২/৩টি ফসলের লাভ লোকসান দেখে পুরোপুরি আধানিবিড় চাষে যাওয়া যেতে পারে। এতে যে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হবে তার আলোকে আধানিবিড় চাষকে দীর্ঘ মেয়াদি লাভজনক ব্যবস্থায় যেমন উন্নয়ন ঘটানো যাবে, তেমনি ভাবে নতুন নতুন আধানিবিড় খামারের সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এইভাবেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে, আধানিবিড় চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত ও কাঠামোগত ব্যবস্থাদির প্রসার ঘটবে, উৎপাদন বাড়বে এবং চিংড়ি চাষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথা কৃত্রিম খাবার, পোনা, চুন-জাতীয় পদার্থ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি এতে চিংড়ি চাষের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, পরিবেশগত পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে মনিটরিং সুষ্ঠু ও সন্তোষজনকভাবে করা সম্ভব হবে। আর এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পরিবেশ সহনীয় টেকসই বাগদা চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটানো সম্ভবপর।

একদিক দিয়ে আমরা ভাগ্যবান, যেহেতু মড়ক আকারে বাগদা চিংড়ির রোগ বিস্তার পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলোতে আমাদের পূর্বেই শুরু হয়েছে। পরিণামে ব্যাপকহারে আধানিবিড় চাষ আমাদের দেশে শুরু করার পূর্বে চাষীরা দ্বিধান্বিত ছিলেন। আমাদের প্রতিবেশীদের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে বাগদা চিংড়ি চাষে তাদের বিপর্যয় আমাদের জন্যও সতর্কতার ঘন্টা হিসেবে কাজ করেছে। নতুবা আমরাও ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতাম। অবশ্য বর্তমানে ভাইরাস রোগে আমাদের যে ক্ষতি হচ্ছে একে খাটো করার জন্য এ বক্তব্যের অবতারণা নয়। আমাদের নিকট এবং দূর প্রতিবেশীর দুর্ভাগ্যের আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ বাগদা চিংড়ির চাষ পরিকল্পনা এখনই প্রণয়ন করতে হবে।

একটি ব্যাপারে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, তাহলো কোন কৃষিজ উৎপাদনই ক্রমাগত সুফল দেয়না, যদি না তা লাগসই প্রযুক্তি অনুসরণ করে। টেকসই বা লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে তখনই তা স্বীকৃতি পাবে যখন ঐ প্রযুক্তি একটি দেশের বা বিশেষ একটি অঞ্চলের পরিবেশগত, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, ইকোলজিক্যাল এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে সুবিধাজনক মনে হবে। একটি দেশে বা বিশেষ একটি অঞ্চলে একটি প্রযুক্তি তা জীবতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনাগত অথবা যান্ত্রিক যাই হোক না কেন, সুফল বয়ে আনলে স্বতঃসিদ্ধভাবে তা অন্য অঞ্চলেও অনুরূপ ফলাফল দেবে তার নিশ্চয়তা থাকে না। তাই বিদেশে উদ্ভাবিত একটা প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে বিচার না করলে বাংলাদেশে হুবহু এর প্রতিস্থাপন সুফল বয়ে আনতে নাও পারে। উদারহণ স্বরূপ বলা যায় তাইওয়ানে বা চীনে উদ্ভাবিত আধানিবিড় চাষপ্রক্রিয়া ঐসব দেশের জন্য উপযোগী হলেও এর অবিকৃত প্রতিস্থাপন আমাদের জন্য উপযোগী নাও হতে পারে। এজন্য আমদানিকৃত প্রযুক্তির কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হতে পারে। তাই আমদানিকৃত চিংড়ি চাষপ্রযুক্তি বাংলাদেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে সুবিধাজনক অবস্থানে নেয়ার জন্য এর কিছুটা পরিবর্তন বা প্রমিতায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

জড় প্রযুক্তি ছাড়াও জীবতাত্ত্বিক প্রযুক্তিকেও অবশ্যই পরিবেশ সহনীয় বা বন্ধু-ভাবাপন্ন হতে হবে। জীবতাত্ত্বিক প্রযুক্তি যদি পরিবেশের সাথে মিথোজীবী নাও হয় তবে অবশ্যই তাকে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো বা পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে থাকতে হবে। জীবতাত্ত্বিক কোন প্রযুক্তি যদি পরিবেশের সাথে মিথোজীবী প্রমাণিত হয় তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তা কম লাভজনক হলেও তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক এতে সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাওয়া যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নগর জীবনে উৎপন্ন জৈববর্জ্য যদি কৃষি কাজে ব্যবহার করে শস্য এবং শাক-সবজি উৎপাদন কর যায় তবে তা হবে মিথোজীবীত্বের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে চিংড়ি উৎপাদনেও বিশেষ করে আধানিবিড় চিংড়ি চাষে উৎপাদিত জৈববর্জ্য যদি মাছ চাষে ব্যবহার অথবা ফসলচক্র ভিত্তিক চিংড়িমাছ চাষ প্রক্রিয়া চালু করা যায়, তবে তা হবে উৎকৃষ্ট পরিবেশ সহনীয় আধানিবিড় চিংড়ি মাছ চাষ। এর ফলে শুধু প্রয়োজীয় আমিষ, তা রপ্তানির জন্যই হোক বা অভ্যন্তরীণ চাহিদা

পূরণের জন্যই হোক, উৎপন্নই হবে না বরং পরিবেশের ক্ষতিকারক দূষণও বহুলাংশে দূরীভূত হবে।

উপকূলীয় লোনাপানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ মোটামুটিভাবে ভূমির প্রাপ্যতার আলোকে প্রায় শেষ সীমায় উপনীত। এমতাবস্থায় নূতন নূতন জমি চাষের অধীনে না এনে চাষাধীন জমিতে চাষ প্রক্রিয়া উন্নততর করা জরুরি। এছাড়া উপকূলীয় ভূমি ছাড়াও সাংবাৎসরিক বা ঋতুভিত্তিক অভ্যন্তরীণ যেসব জলাশয় আছে এতে গলদার চাষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বাদুপানিতে বাগদার চাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। সামান্যতম লবণাক্ততার ছোঁয়া আছে এমন পানিতেও বাগদার চাষ সম্ভব।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের দেশে চিংড়ি চাষ ঈপ্সিত উল্লম্বিকভাবে না হয়ে আনুভূমিক হারে বিস্তার লাভ করছে, যা কাম্য নয়। এতে প্রতি বছর চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও যে হারে ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই অনুপাতে উৎপাদন বাড়ছে না। ১৯৯৬ সালে মড়ক আকারে চিংড়ি মৃত্যুর ফলে চাষপ্রক্রিয়া যেহারে বিঘ্নিত হয়েছে এতে ১৯৯৭ সালে বর্তমান উৎপাদনের ধারা বজায় রাখা কষ্টকর হতে পারে। আনুভূমিক চিংড়ি চাষ বিস্তারের ফলে মূলত কম ঘনত্বে চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটছে তা পরিবেশের জন্য তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর। কিন্তু অতি উচ্চ ঘনত্বে (প্রতিবর্গ মিটারে ২৫ বা ততোধিক) আধানিবিড় চাষ তা যত কম জমিতেই করা হোক না কেন, ইতোমধ্যেই পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তা বাস্তুসংস্থানগত বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

তাই আজ প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা, পরিবেশের বিনাশ করে না এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ফসলচক্র ব্যবহার, বিভিন্ন প্রজাতির চাষ এবং পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনার আরেক চাষ, এতেই দীর্ঘ মেয়াদি পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ উদ্ভাবন করা যেতে পারে। অপরাপর জলজ সম্পদের চাষের মতো চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা নির্ভর একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তবে অন্য কোন খামার ব্যবস্থাই চিংড়ি চাষের মতো এতো পরিবেশ সংস্পৃক্ত নয়। আধানিবিড় চিংড়ি চাষের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাবো, চিংড়ি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি উচ্চ ঘনত্বে প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম খাবার নির্ভর এবং তুলনামূলকভাবে দূষিত পানিতে অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় থাকে। তাই আধানিবিড় বা উচ্চ ঘনত্বের চিংড়ি চাষে পরিবেশকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে এরা তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছন্দে, কম দূষিত পানিতে এবং কম পীড়নের মাঝে থাকতে পারে। পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ বলতে আমরা শুধুমাত্র পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে এর চাষকে বোঝাতে চাইনা বরং চিংড়ি চাষের ফলে যাতে আশে পাশের পরিবেশের বা বাস্তুসংস্থানগত অবস্থারও দ্রুত এবং অসহনীয় পরিবর্তন না ঘটে তাও বোঝাতে চাই। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, মাছ ও চিংড়ি চাষের মাঝে একটি পরিবেশগত পার্থক্য আছে। অধিকাংশ মাছই পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু চিংড়ি বেশির ভাগ সময়ই খামারের বা পুকুরের তলদেশের মাটিতে অবস্থান করে। তাই শুধুমাত্র পানির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে রাখলেই চলবেনা, বরং পুকুরে তলদেশের পরিবেশও চিংড়ির সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে।

বাগদা চিংড়ি চাষের সময় পানি যত কম পরিবর্তন করে এর গুণগতমান ধরে রাখা যায় ততই উত্তম। আধানিবিড় চাষে পর্যাপ্ত প্যাভেল হুইল ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনীয় মাত্রায় নিয়মিত ক্যালসিয়াম কার্বনেট ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট ব্যবহারে পানির পিএইচ এবং ক্ষারকত্ব স্থিতিশীল থাকে, তলায় পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থ নিষ্ক্রিয় হয়, তাই পৌনঃপুনিক পানি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিতে বাষ্পীভূত এবং চোঁয়ানোর ফলে যে পরিমাণ পানি খামার থেকে কমে যায় তা বাইরের উৎস অথবা খামারের রিজার্ভার বা সরবরাহ নালা থেকে পূরণ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে অবশ্য খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ ছাড়াও খামারের পাড় উঁচু করে পানির উচ্চতা ১.৫–২.০ মিটার রাখা হলে প্রতি হেক্টরে পানির ধারণক্ষমতা ১৫,০০০–২০,০০০ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে। এর সুফল হিসেবে পানির তাপমাত্রা স্থিতিশীল, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি, দূষণের হার হ্রাস, সামগ্রিকভাবে বেশি প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন, সূর্যরশ্মি পুকুরের তলা পর্যন্ত পৌছানো বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতেও লবণাক্ততার দ্রুত হ্রাস রোধ হতে পারে। এতে পানি পরিবর্তনের প্রয়োজনও কমে যাবে। আধানিবিড় চাষে পানির উচ্চতা বৃদ্ধিতে শুধুমাত্র প্যাডেল হুইলের মাধ্যমে ফিডিং জোন পরিষ্কার করার কাজ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে ২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মটরের প্যাডেল হুইল ব্যবহার করে এক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে।

মাড ক্র্যাব চাষের সম্ভাবনা

সালেহ উদ্দিন আহম্মেদ, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাধুরী রাণী সাহা ও প্রবীর কুমার রায়, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, পাইকগাছা, খুলনা

বাংলাদেশের ৪৮০ কিলোমিটার উপকূলীয় রেখার প্রায় ৬,২৮,৭৮০ হেক্টর জায়গায় কাঁকড়া (মাড ক্র্যাব) ধরা হয়। উপকূলীয় এলাকার সেন্ট মার্টিন ব্যতীত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা ও নোয়াখালীর উপকূলীয় নদী এবং মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সন্দীপ হাতিয়া এবং দুবলার চর এলাকায় কাঁকড়ার বিস্তৃতি। যদিও কাঁকড়া মোহনাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অঞ্চল পছন্দ করে কিন্তু বঙ্গোপসাগরের তট ও অধিতট আন্তঃজোয়ার ভাটা অঞ্চল হতে ৪০–৫০ কিলোমিটার অভ্যন্তরের মোহনাঞ্চলের নদীনালা, খালবিলের লবণাক্ত পানিতে কাঁকড়া প্রবেশ করে মানুষের চাষের আওতায় পৌঁছেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের লোনাপানিতে বাগদা চিংড়ির সাথে কাঁকড়া উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ির খামারে অবাঞ্ছিত প্রাণী হিসেবে কাঁকড়া উৎপাদন হতে শুরু করলেও চিংড়ির ন্যায় কাঁকড়া তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিদেশে রপ্তানি শুরু হওয়াতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত কাঁকড়া পরিকল্পিতভাবে চাষ করার প্রেরণা যোগায়। বাংলাদেশে কাঁকড়া উৎপাদন সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও প্রাথমিক হিসেবে সারাদেশে বছরে কাঁকড়ার গড় উৎপাদন আনুমানিক ৯,০০০– ১০,০০০ টন যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। বর্তমানে রপ্তানিযোগ্য হিমায়িত খাদ্যের মধ্যে চিংড়ির পর কাঁকড়ার স্থান দ্বিতীয় হলেও কাঁকড়ার সঠিক উৎপাদন নিরূপণ সম্ভব হলে কাঁকড়ার স্থান সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। হংকং, মালয়শিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের কাঁকড়ার প্রধান ক্রেতা। ১৯৮২–৮৩ সালে অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে বাংলাদেশের কয়েকজন রপ্তানিকারকের নিজস্ব উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা দেখে স্বল্প মাত্রায় কাঁকড়ার রপ্তানি শুরু হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের কাঁকড়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে চিংড়ি চাষীগণ ক্রমান্বয়ে আগ্রহভরে কাঁকড়া আহরণ করে বিক্রি করতে শুরু করেন।

কাঁকড়া চাষের প্রধান সুবিধাগুলো নিম্নরূপ

- বাগদা চিংড়ির একই পরিবেশে কাঁকড়া (মাড ক্র্যাব) চাষ সম্ভব।
- প্রাকৃতিকভাবে কাঁকড়ার পোনা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং চিংড়ির সাথে একটি বাড়তি আয় হিসেবে কাঁকড়া উৎপাদিত হয়।
- বিদেশে কাঁকড়ার চাহিদা খুব বেশি।
- বছরের প্রায় সকল মাসেই কাঁকড়া পাওয়া যায় এবং বছরে ৬–৮ মাস কাঁকড়া চাষ সম্ভব।
- কাঁকড়ার খাবার স্বল্পমূল্যে সহজে পাওয়া যায়। বাগদা চিংড়ির খামারে কাঁকড়ার খাবারের অভাব হয় না।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় কাঁকড়া সম্পদকে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে কাঁকড়া চাষের কলাকৌশল উদ্ভাবন অতীব জরুরি। কাঁকড়া চাষের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ।

পরিচিতি ও জীবনচক্র

এদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে মাড ক্র্যাব (Scylla serrata) হল বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাঁকড়া। স্থানীয় ভাষায় এই কাঁকড়াকে শিল কাঁকড়া বা হাব্বা কাঁকড়া বলা হয়ে থাকে। মাড ক্র্যাব নামক কাঁকড়াটি আকারে ও ওজনে সবচেয়ে বড় হয়। মোহনা উপকূলীয় জোয়ার ভাটা বিধৌত ম্যানগ্রোভ এলাকায় এদের মূল

আবাস স্থল হলেও পরিপক্ক স্ত্রী কাঁকড়া ডিম ছাড়ার জন্যে গভীর সমুদ্রে চলে যায়। ডিম হতে বাচ্চা হওয়ার পর জোয়া ও মেগালোপা পর্যায় সমুদ্রের অগভীর এলাকা অতিবাহিত করে জুভেনাইল পর্যায়ে অগভীর সমুদ্র হতে ধীরে ধীরে পুনরায় ম্যানগ্রোভ এলাকায় চলে আসে। ম্যানগ্রোভ এলাকা ও মোহনাঞ্চলে পরিপক্ক হওয়ার পর পুনরায় স্ত্রী কাঁকড়া ডিম ছাড়ার জন্য গভীর সমুদ্রে চলে যায়। কাঁকড়ার চিমটা পা ও বুকের ফ্ল্যাপ দেখে স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া সহজে চেনা যায়। স্ত্রী কাঁকড়ার বুকের ফ্লাপটি অর্ধগোলাকার অপর দিকে পুরুষ কাঁকড়ার ফ্ল্যাপটি অপেক্ষাকৃত সরু ও ইংরেজি ইউ বা ভি আকৃতির। পুরুষ কাঁকড়ার চিমটা পা একই বয়সের স্ত্রী কাঁকড়া হতে বড় ও ধারালো। একটি স্ত্রী মাড ক্র্যাব সর্বোচ্চ ৮ কেজি ও একটি পুরুষ সর্বোচ্চ ৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের হতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডিমওয়ালা স্ত্রী কাঁকড়ার দাম পুরুষ কাঁকড়ার প্রায় ৪ গুণ।

কাঁকড়ার চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে বছরের জানুয়ারি মাস হতে কাঁকড়ার পোনা দেখা যায়। এ মাস হতে আগষ্ট মাসে সর্বাধিক কাঁকড়া ধরা পড়ে। কাঁকড়া চাষের জন্য ১৫–৩০ পিপিটি লবণাক্ততা ও ২২–২৬ সেঃ তাপমাত্রা সর্বোত্তম। কাঁকড়া চাষ কাল ৩–৪ মাস। যে সমস্ত এলাকায় লবণাক্ততা বেশি থাকে সেখানে দু'টি ফসল করা সম্ভব। দোফসলি এলাকা জানুয়ারি মাসে কাঁকড়া মজুদ করা যায়। যে সমস্ত এলাকায় লবণাক্ততা কম থাকে সেখানে মার্চ মাসে কাঁকড়া মজুদ করার উপযুক্ত সময়। কাঁকড়া মজুদ করার পূর্বে সঠিক নিয়মে পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে।

ক) **পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি ঃ** কাঁকড়া চাষের জন্য বেলে–দোআঁশ মাটি হতে কাদা মাটি ভাল। গবেষণায় দেখা যায় কাঁকড়া চাষের জন্য পুকুরের আকার ও অবস্থান লক্ষ্যমাত্রার কাঁকড়ার উৎপাদনের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাঁকড়া পুকুর ০.২ হতে ১.০ হেক্টরের মধ্যে হলে ভাল হয়। চাষের পুকুরে কাঁকড়ার গোনাড বাড়তে শুরু করলে কাঁকড়া বেশি সক্রিয় হয়ে স্রোতে সাঁতার কাটতে পছন্দ করে। এই সুযোগ না পেলে কাঁকড়া পুকুর হতে বের হয়ে যেতে চাইবে এবং এই অভ্যাসের/পছন্দের পরিবেশ না পেলে কাঁকড়া মারাও যেতে পারে। পুকুর ০.২ হেক্টরের নিচে হলে কাঁকড়া এই সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। এ দিকে ব্যবস্থাপনার দিক বিবেচনায় এনে আকার ১.০ হেক্টরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাঁকড়ার পুকুর লোনাপানির নদী বা সমুদ্রের সাথে সরাসরি সংযুক্ত বা নিকটে হতে হবে যাতে জোয়ার ভাটায় পানি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। পুকুর শুকানোর পর পুকুরের পাড় ভাল করে মেরামত করে নিতে হবে। পুকুরে পানি প্রবেশ ও নির্গমণের জন্য পৃথক কাঠের গেইট বা কল থাকলে ভাল হয়। বাবলা কাঠের তৈরি ১৭ ফিট দৈর্ঘ্যের ২৪ ইঞ্চি চওড়া ও ২৮ ইঞ্চি উচ্চতার কাঠের কল পানি প্রবেশ ও নির্গমণের জন্য সর্বোত্তম। কল সিমেন্টে পাকা করে নিতে পারলে আরও ভাল। পুকুর শুকানোর পর ফেব্রুয়ারি মাসে পুকুরের তলা ভাল করে চাষ দিয়ে ওপরের মাটি ঝুরঝুরে করে ফেলতে হবে যাতে পুকুরে কমপক্ষে ৪ ইঞ্চি পরিমাণ কাদা থাকে। কাঁকড়ার পলায়ন স্বভাব রোধ করার জন্য প্রায় ১.৫ মিটার উচ্চতার বাঁশের বানা দিয়ে পুকুরের চারদিকে বেড়া দিতে হবে। বানার এক চটা হতে অন্য চটার দূরত্ব ০.৫ সে. মি. এর বেশি হবে না। বানা ০.৫ মিটার মাটির নিচে খুব শক্ত করে পুঁতে দিতে হবে যাতে কাঁকড়া গর্ত করে নিচ দিয়েও পালাতে না পারে। চাষ দেওয়া পুকুরে সামান্য পানি ওঠাতে হবে যতে মাটি ভিজে কাদা হয়। মাটির পিএইচ এর ওপর ভিত্তি করে ভিজা মাটিতে পাথুরে চুন ফুটিয়ে পাউডার করে ছিটিয়ে দিতে হবে। মাটির পিএইচ ৭ – ৭.৫ এর মধ্যে হলে প্রতি হেক্টরে ১২৫ কেজি চুন দিতে হবে। চুন প্রয়োগের ১ দিনের মধ্যেই পানি তুলতে হবে এবং ৭ দিন পর হেক্টরে ২৫ কেজি ইউরিয়া ও ১৫ কেজি টি.এস.পি সার ছিটিয়ে দিতে হবে। অজৈব সার দেওয়ার ৩ দিন পর হেক্টরে ৭৫০ কেজি গোবর সার ছিটিয়ে দিতে হবে। গোবর দেয়ার ৩ দিন পর পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা মজুদ

আমাদের দেশে নদী হতে বাগদা চিংড়ির পোনা ধরার সময় প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়ার পোনা পাওয়া যায়। কাঁকড়া পানি ছাড়া বাতাসে ৪–৫ দিন সহজে বেঁচে থাকতে পারে বলে কাঁকড়ার পোনা পরিবহণে কোন সমস্যা নেই। প্রাপ্ত পোনা হতে সবল ও সুস্থ পোনার স্ত্রী ও পুরুষ বাছাই করে সঠিক অনুপাতে পুকুরে ছাড়তে হবে। ২৫–৩০ গ্রাম গড় ওজনের কাঁকড়ার পোনা চাষের জন্য মজুদ করতে হবে। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট এর লোনাপানি কেন্দ্রে স্ত্রী পুরুষের ভিন্ন অনুপাত ও বিভিন্ন ঘনত্বের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, স্ত্রীঃপুরুষ কাঁকড়া ৯ঃ১ অনুপাতে প্রতি হেক্টরে ১০,০০০ টি (প্রতিটি ২৫–৩০ গ্রাম ওজনের) কাঁকড়া মজুদ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কাঁকড়া ছাড়ার সময় খেয়াল রাখতে

হবে যেন কাঁকড়ার পোনা মোটামুটি একই আকারের হয় অন্যথায় একে অন্যকে খেয়ে ফেলবে।

কাঁকড়ার খাবার প্রয়োগ ও বাসস্থান নির্মাণ

কাঁকড়া অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিচরণ করে শিকার ধরে খায়। কাঁকড়া চিংড়ির ন্যায় নিশাচর প্রাণী তবে জোয়ারের সময় দিনেও সাঁতার কেটে খাদ্য শিকার করে। শৈশব অবস্থায় কাঁকড়া ডায়াটম, রটিফার, আর্টিমিয়া ইত্যাদি খেলেও চাষের পুকুরে মজুদকৃত ২৫ গ্রাম বা তদুর্ধ ওজনের কাঁকড়ার জন্য এই খাবার প্রয়োজন নেই। এই সময় কাঁকড়া তার চিমটা পা দিয়ে জীবিত খাদ্য শিকার করে খেতে পছন্দ করে। কাঁকড়ার খাদ্যের চাহিদা দেহের ওজনের ৮–১০%। শামুক ও ঝিনুকের নরম মাংসল অংশ, ট্র্যাশ ফিশ, চিংড়ি ও চিংড়ির মাথা কাঁকড়ার প্রিয় খাদ্য। লোনাপানি কেন্দ্রের গবেষণা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কাঁকড়ার খাদ্যের হারের একটি সারণি নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি- ১। কাঁকড়ার (মাড ক্র্যাব) খাদ্য হার।

দিন	সময়	খাদ্যোপাদান	দৈনিক পরিমাণ
অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পর	১৮০০ঃ ২০ঃ০০	ট্র্যাশ ফিশ	দেহের ওজনের ৮%
৫ম দিন হতে ১১ তম দিন পর্যন্ত ৭ দিন	০৫০০ঃ০৬ঃ০০	আটা	দেহের ওজনের ১%
		চালের কুঁড়া	,,
অমাবস্যা বা পূর্ণিমার ১২ তম দিন হতে	১৮০০ঃ২০ঃ০০	চিংড়ির মাথা	দেহের ওজনের ৮%
অমাবস্যা বা পূর্ণিমার ৪র্থ দিন পর্যন্ত ৭ দিন	০৫০ঃ০৬০০	আটা	দেহের ওজনের ১%
		চালের কুঁড়া	দেহের ওজনের ১%

খাবার সরবরাহের সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে খাবারের পরিমাণ কম না হয়। খাবার কম হলে এরা একে অন্যকে খেয়ে ফেলে।

খোলস জাতীয় প্রাণী বিধায় খোলস পাল্টিয়ে কাঁকড়ার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে। খোলস পাল্টানোর পর কাঁকড়ার দেহ নরম থাকে। এই সময় কাঁকড়ার গতি খুব মন্থর থাকে বলে অন্য কাঁকড়া ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। প্রধানত দুটি কারণে কাঁকড়ার আশ্রয় অতীব জরুরি। ১) খোলস পাল্টানোর পর আশ্রয় ও ২) অতি রৌদ্রের হাত থেকে রক্ষা । কাঁকড়ার আশ্রয় বিভিন্নভাবে দেয়া যায় যেমনঃ ১) পুকুরের বিভিন্ন জায়গায় বাঁশ দিয়ে ঘিরে বাঁশের ও বাবলা গাছের ডালপালা দিয়ে আশ্রয় তৈরী করে ২) পুকুরের তলায় পুকুর তৈরীর সময় মাটির ছোট ছোট পাহাড় তৈরি করে রাখা। ৩) বাঁশের তৈরি ডোঙ্গা বা সিমেন্টের পাইপ পুকুরের তলায় আশ্রয় হিসেবে দেয়া হলে এই প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভব।

পানি ব্যবস্থাপনা

যে সমস্ত পুকুরে জোয়ার ভাটা বেশি প্রবাহিত হবে সেখানেই কাঁকড়ার বৃদ্ধি বেশি হয়। তাছাড়া কাঁকড়ার পুকুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাণির মাংসালো খাবার সরবরাহ করতে হয় বলে কাঁকড়া পুকুরে পানি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কাঁকড়ার পুকুরে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় ৪–৭ দিন পানি পরিবর্তন করতে হবে। লোনাপানি কেন্দ্রের গবেষণায় দেখা যায় যে কাঁকড়া চাষের পুকুরে পানির ভৌত–রাসায়নিক গুণাগুণ নিম্ন বর্ণনা মোতাবেক হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

সারণি- ২। কাঁকড়ার পুকুরে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ।

গভীরতা	তাপমাত্রা	লবণাক্ততা	অক্সিজেন	পিএইচ
০.৮–১.০ মিটার	২২-৩০°সে	১০–২৫পিপিটি	৩-৮ পিপিএম	৭.৫-৮.৫

কাঁকড়া আহরণ ও বাজারজাতকরণ

কাঁকড়া মজুদের ৩–৪ মাস পর আহরণ করতে হবে। কাঁকড়া আহরণের জন্য স্থানীয়ভাবে 'থোপা' (লাঠির মধ্যে মাছ, ব্যাং বা গরু ছাগলের চামড়া) দিয়ে কাঁকড়াকে প্রলুব্ধ করে স্কুপ নেট দিয়ে ধরা হয়। ঝাঁকি জাল, বাঁশের ঝুড়ি, আয়রন হুক, ডন ও বাঁশের ফাঁদ দিয়ে পুকুরে কাঁকড়ার আংশিক আহরণ করা হয়। সম্পূর্ণ আহরণের জন্য পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হয়।

কাঁকড়া ধরার সাথে সাথে বিশেষ নিয়মে বেঁধে ফেলতে হয়। ধৃত কাঁকড়াসমূহ সংগ্রহকারী/ফরিয়াদের মাধ্যমে প্রথমত কাঁকড়া ডিপোতে আসে। সেখানে গ্রেডিং এর মাধ্যমে বাছাই করে কাঁকড়ার মালিককে মূল্য প্রদান করা হয়।

উপসংহার

কাঁকড়া চাষ নিঃসন্দেহে একটি লাভজনক খাত হলেও নানাবিধ কারণে বাস্তবে কাঁকড়ার চাষ অনেক সময়ই লোকসানের সম্মুখীন হয়। লোনাপানি কেন্দ্রে গবেষণার ভিত্তিতে কাঁকড়া চাষের লোকসানের সম্ভাব্য নিম্নলিখিত কারণগুলো সনাক্ত করা হয়।

১। পুকুরের আয়তন ঃ কাকড়া চাষের পুকুর সঠিক ব্যবস্থাপনা সীমার মধ্যে রেখে যত বড় হবে ততই কাঁকড়া বেশী বড় হবে।

২। পলায়ন রোধ ঃ কাঁকড়ার পলায়ন রোধ করতে না পারলে কাঁকড়া চাষ সর্বদাই লোকসানের সম্মুখীন হবে। তাছাড়া কাঁকড়ার আশ্রয়স্থল নির্মাণ করে দিতে হবে, নয়তো কাঁকড়া খোলস পাল্টানোর সময় একে অপরকে খেয়ে ফেলা এবং গর্ত করে পালানো রোধ করা যাবে না।

৩। খাবার ঃ কাঁকড়াকে সময়মত খাবার দিতে হবে। কাঁকড়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাবার প্রয়োজন। ট্র্যাশ ফিশের বিকল্প হিসেবে কম দামের খাবার প্রদানের ব্যবস্থা হলে খাবারের মূল্য কমে আসবে। শামুক ও ঝিনুকের নরম অংশ কাঁকড়া খুব পছন্দ করে এবং বৃদ্ধিও ভাল হয়। তাছাড়া কম খরচের গরু–ছাগলের নাড়িভুঁড়ি খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪। পানি ব্যবস্থাপনা ঃ নিয়মিত পানি পরিবর্তন কাঁকড়ার বৃদ্ধির জন্য খুবই সহায়ক। বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারগুলোতে সেই ব্যবস্থা নেই।

৫। কাঁকড়ার সঠিক বাজার ঃ ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে কাঁকড়া আহরণ ও বাজারজাতে তারতম্য বেশি হয় বিধায় কাঁকড়ার দামের তারতম্য অতি বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে। এমন সময় কাঁকড়ার মজুদ ও আহরণ করতে হবে যেন কাঁকড়ার চড়া মূল্যের বাজার পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় কাঁকড়া সম্পদকে লাভজনক শিল্পে পরিণত করা গেলে তা জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক হবে।

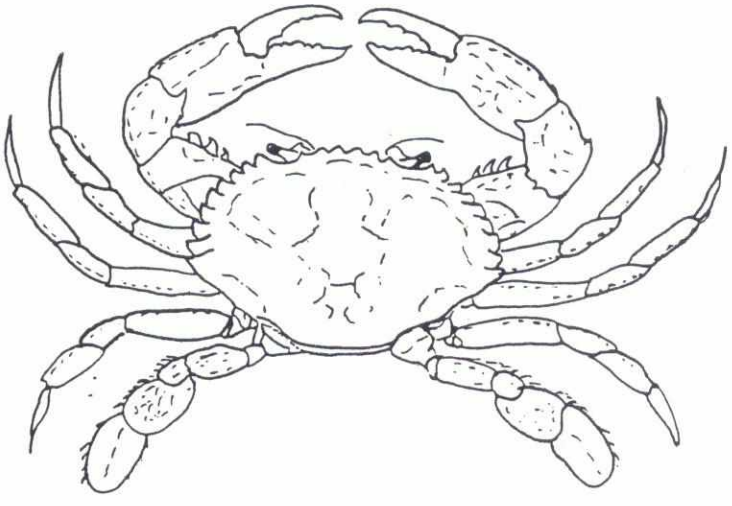

গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা

হাবিবুর রহমান খন্দকার
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৯,০০০ হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ির *(Macrobrachium rosenbergii)* একক চাষ করা হচ্ছে এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে, চাষ এলাকাও ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া বেশির ভাগ রুই কাতলা চাষের পুকুরেও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। গলদা চিংড়ি পোনার অভাবে এতদিন এর চাষের প্রসার ততটা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬ হাজার মেট্রিক টন হিমায়িত গলদা চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। গলদা চিংড়ি উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। বিশ্ব বাজার ছাড়াও স্থানীয় বাজারে গলদা চিংড়ির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

যে কোন চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রথম শর্ত সুস্থ, সবল পোনা সরবরাহ। এতদিন পর্যন্ত গলদা চিংড়ি পোনার জন্য চাষীগণ উপকূলীয় এলাকার নদী ও খালের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় সময় চাহিদামত পোনা সংগ্রহ প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়না। এছাড়া ছোট অবস্থায় গলদা চিংড়ির পোনাকে স্বাদু পানির অন্য চিংড়ি সাথে পৃথক করা প্রায় ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না। এজন্য চাষীগণ অনেক সময় সাফল্যজনকভাবে গলদা চিংড়ির চাষ করতে পারেন না। দেশে গলদা চিংড়ি পোনার স্বল্পতার কারণে ১৯৯৫ সনে থাইল্যান্ড ও ভারত থেকে প্রচুর পোনা আমদানি করা হয়েছে। এ সমস্ত পোনার মান ভালো নয় বলে চাষীগণের অভিযোগ রয়েছে।

গলদা চিংড়ির সুস্থ সবল পোনা হ্যাচারিতে উপযুক্ত মা চিংড়ি থেকে উৎপাদনের প্রযুক্তি ইতোমধ্যে দেশে চালু হয়েছে, প্রায় ২০ টি ছোট বড় গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে বর্তমানে পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। এ সমস্ত হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। গলদা চিংড়ির হ্যাচারি দেশের অভ্যন্তরেও পোনার চাহিদানুযায়ী স্থাপন করা যায়। হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা। গলদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনকে আরো জনপ্রিয় এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার নিবন্ধটি উপস্থাপন করা হলো।

ক) গলদা হ্যাচারির স্থান নির্বাচন

গলদা চিংড়ির লার্ভা (পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির রূপ ধারণের আগের পর্যায়সমূহ) উৎপাদন ও পালনের জন্য ১০-১৫ পিপিটি লবণাক্ত পানি প্রয়োজন। উপযুক্ত লবণাক্ত পানি এবং স্বাদুপানি সরবরাহ করা গেলে যে কোন স্থানে গলদার পোনা উৎপাদন সম্ভব। তবে বাণিজ্যিকভাবে পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারির স্থান নির্বাচনে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, যেমন –

লবণাক্ত পানির সরবরাহ ঃ সরাসরি সমুদ্র থেকে অথবা দূষণমুক্ত উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত পানির নদী বা খাল থেকে লবণাক্ত পানি সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া লবণ চাষের মাঠ থেকে ৬০-৭০ পিপিটি লবণাক্ত পানি সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় স্বাদুপানির সাথে মিশ্রিত করেও ব্যবহার করা যায়। যেহেতু হ্যাচারিতে নিয়মিত লবণাক্ত পানির প্রয়োজন তাই স্বাস্থ্যসম্মত লবণ পানি সহজে এবং কম খরচে সংগ্রহ করা যায় এরূপ স্থানে হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত। হ্যাচারিতে ব্যবহারকালে লবণাক্ত পানির গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গুণাগুণ	উপযুক্ত পরিমাণ
তাপমাত্রা	২৮- ৩২ সে.
লবণাক্ততা	১২-১৫ পিপিটি

গুণাগুণ	উপযুক্ত পরিমাণ
পিএইচ	৭–৮.৫
দ্রবণীয় অক্সিজেন	›৪.০ পিপিএম
আনআয়োনাইজড অ্যামোনিয়া	‹০.০১ ,,
নাইট্রেট নাইট্রোজেন	‹০.১২ ,,
হাইড্রোজেন সালফাইড	‹০.১০ ,,
লৌহ পদার্থ	‹১.০ ,,
আর্সেনিক	‹০.০৩ ,,
হার্ডনেস ($CaCo_3$)	৪০–১০০ ,,
ভারি ধাতু	‹০.০১ ,,

পানি কীটনাশক মুক্ত থাকতে হবে।

স্বাদুপানি সরবরাহ ঃ লবণাক্ত পানি মিশ্রিত করে ১২–১৫ পিপিটি লবনাক্ত লার্ভা প্রতিপালন এবং হ্যাচারির যন্ত্রপাতি, পাত্র ইত্যাদি ধৌতের জন্য স্বাদুপানির প্রয়োজন। দূষণমুক্ত হলে নদী, খাল অথবা ভূগর্ভস্থ স্বাদুপানি শোধনপূর্বক ব্যবহার করা যায়। স্বাদুপানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ পূর্বোক্ত (লবণাক্ত পানির) মাত্রায় (লবণাক্ততা ছাড়া) থাকা বাঞ্ছনীয়।

ডিমওয়ালা চিংড়ির উৎস

ডিমওয়ালা (ব্রুড) চিংড়ি সহজে সংগ্রহ করা যায় ঐরূপ স্থানে হ্যাচারি স্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে অনেক হ্যাচারি ডিমওয়ালা চিংড়ির জন্য নিজস্ব পুকুরে গলদা চিংড়ি প্রতিপালন করে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত ডিমওয়ালা চিংড়ির ডিম সংখ্যা (fecundity) বেশি থাকে এবং চিংড়ি থেকে উৎপাদিত পোনা তুলনামূলকভাবে মজবুত ও বলবান হয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ হ্যাচারিতে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা রাখতে হয়। এজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে এরূপ স্থানে হ্যাচারি স্থাপন করতে হয়।

যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা ঃ সড়ক পথে মালামাল (উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত) ও উৎপাদিত পোষ্ট লার্ভা পরিবহণের জন্য সারা বছর গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা থাকতে হবে।

পোনা বিক্রির সুবিধা ঃ উৎপাদিত পোনা যেন সহজে বিক্রি করা যায় এরূপ জায়গায় হ্যাচারি স্থাপন করে পোনার সঠিক মূল্য পাওয়া যায় এবং পোনা যথাসময়ে বিক্রি করা যায়।

দক্ষ জনশক্তি ঃ হ্যাচারি পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। দক্ষ পরিচালক ও শ্রমিক পাওয়া না গেলে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন অসম্ভব এবং প্রায় ক্ষেত্রে অলাভজনক।

প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত এলাকা ঃ বন্যা, প্লাবন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির সম্ভাবনা কম এরূপ স্থান হ্যাচারি স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

খ) হ্যাচারির ধরণ ও কর্ম পদ্ধতি

উৎপাদন ক্ষমতা, বিনিয়োগ ইত্যাদির ভিত্তিতে হ্যাচারিকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায় যেমন, (ক) ক্ষুদ্রায়তন, (খ) মধ্যয়তন ও (গ) বৃহদায়তন। এছাড়া হ্যাচারির পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেও হ্যাচারিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন (ক) পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতি (recirculatory system), এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত পানি কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত শোধন ট্যাংক এবং ফিল্টারের মাধ্যমে পুনরায় হ্যাচারিতে ব্যবহৃত হয়। (খ) আবদ্ধ পদ্ধতি (Closed System), লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের সাথে স্থাপিত ফিল্টারের মাধ্যমে অনবরত পানি সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ পানি নিষ্কাশন করা হয় না। (গ) প্রবাহ পদ্ধতি (flow through system), এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশন করে পুনরায় শোধিত ও পরিশ্রুত পানি সরবরাহ করা হয়।

গ) হ্যাচারির নক্সা প্রণয়ন ও নির্মাণ

হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা, পরিচালনা পদ্ধতি, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক হ্যাচারির নক্সা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। একটি হ্যাচারিতে যে সমস্ত অবকাঠামো থাকা প্রয়োজন তা স্বল্প খরচে উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ এবং স্বচ্ছন্দে তা ব্যবহারের জন্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নক্সা প্রস্তুত করতে হয়। এজন্য প্রথমেই হ্যাচারির ধরন, পদ্ধতি ও উৎপাদন মাত্রা ইত্যাদি ঠিক করে তদনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয়। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ওপর লার্ভা ও পোষ্টলার্ভা ট্যাংকর আয়তন, আকার এবং অন্যান্য ট্যাংকের আয়তন নির্ভরশীল। পানি সঞ্চালন পদ্ধতি হ্যাচারি গৃহ অভ্যন্তরে বা খোলা জায়গায় অস্থায়ী ঢাকনা ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত ইত্যাদি বিষয়সমূহ হ্যাচারির নক্সা প্রণয়ণের পূর্বেই ঠিক

করা উচিত। নির্মাণের ত্রুটি হ্যাচারির উৎপাদনকে দারুনভাবে ব্যাহত করতে পারে।

ঘ) হ্যাচারির প্রয়োজনীয় সুবিধাদি

ডিমওয়ালা চিংড়ি পালন ট্যাংক ঃ এই ট্যাংকে প্রকৃতি বা চাষ এলাকা থেকে সংগৃহীত ডিমওয়ালা চিংড়ি, লার্ভা ছাড়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত রাখা হয়। মজুদ চিংড়ির সংখ্যার ওপর এর আয়তন নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে লার্ভা ট্যাংকেও ডিমওয়ালা চিংড়ি সাময়িকভাবে পালন করা যায়। পালন ট্যাংকে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন সুবিধা থাকতে হবে এবং এই ট্যাংকের উচ্চতা ১.০ মিটার থেকে ১.৩ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত এ ট্যাংক গোলাকার, আয়তাকার বা বর্গাকার হয়ে থাকে, ৪ থেকে ৬ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক ডিমওয়ালা চিংড়ি পালনের জন্য উপযুক্ত। ছোট হ্যাচারিতে এ সুবিধা ছাড়াও সরাসরি ডিমওয়ালা চিংড়ি ব্যবহার করা যায়।

লার্ভা হ্যাচিং ট্যাংক ঃ লার্ভা ছাড়ার পূর্বেই উপযুক্ত ডিমওয়ালা চিংড়িকে লার্ভা হ্যাচিং ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হয়। এ ট্যাংকে লার্ভা ছাড়ার পর তা সংগ্রহ করে লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। অনেক হ্যাচারিতে এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে সরাসরি লার্ভা ট্যাংকেই লার্ভা হ্যাচিং করা হয়। সবল ও সুস্থ লার্ভার জন্য হ্যাচিং ট্যাংক হ্যাচারিতে থাকা উচিত। পরিশ্রুত লবণাক্ত পানির সরবরাহ ব্যবস্থাসহ এ ট্যাংক স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে। এ ট্যাংকে সাধারণত ৩০-৪০ সে. মি. গভীরতায় পানি রাখা হয়। ট্যাংকে আলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ঢাকনা ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে।

লার্ভা পালন ট্যাংক ঃ প্রতিটি লার্ভা জীবনচক্রের ১১ টি পর্যায় অতিক্রম করে পোষ্ট-লার্ভা পর্যায়ে উপনীত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ ট্যাংকে লার্ভা প্রতিপালন করা হয়। প্রতিদিন এই ট্যাংকে খাদ্য সরবরাহ, পানি ব্যবস্থাপনা ও লার্ভার স্বাস্থ্য পরিচর্যা করা হয়। ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা ৪-৬ টন হলে পরিচর্যায় সুবিধা হয়, এ সমস্ত ট্যাংকের গভীরতা ১.০ থেকে ১.২ মিটার হলে চলে। ছোট হ্যাচারির জন্য ১-২ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফাইবার গ্লাস বা প্লাষ্টিক ট্যাংকও ব্যবহার করা যায়। উল্লেখিত প্রতিটি ট্যাংকের দেয়াল অত্যন্ত মসৃন হতে হবে এবং সম্ভব হতে এপোক্সি দ্বারা রং করে নিতে হবে। অমসৃন ট্যাংকে রোগ সংক্রমণ বেশি হয় এবং পানি স্বাস্থ্যসম্মত রাখা যায় না।

আর্টিমিয়া হ্যাচিং ট্যাংক ঃ লার্ভাকে প্রতিদিন আর্টিমিয়া নাউপ্লি খাওয়াতে হয় তাই চাহিদানুযায়ী আর্টিমিয়া নউপ্লি হ্যাচিং এর জন্য আর্টিমিয়া ট্যাংক ব্যবহৃত হয়; এ জাতীয় ট্যাংক ফাইবার গ্লাস বা প্লাষ্টিকের হলে পরিস্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে সুবিধা হয়। ২৫০ লি. থেকে ১ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিমিয়া ট্যাংক সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছোট হ্যাচারিতে কাঁচের জার, অ্যাকুরিয়াম, বালতি ইত্যাদিতেও আর্টিমিয়া হ্যাচিং করানো যায়।

পানি মজুদ ও শোধন ট্যাংক ঃ সংগৃহীত লবণ পানি এবং স্বাদু পানি শোধন ও মজুদের জন্য হ্যাচারিতে এ ট্যাংক ব্যবহৃত হয়। হ্যাচারির পানির সরবরাহ ও চাহিদানুযায়ী ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা ভিন্ন হতে পারে। সাধারণতঃ ১০-২০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধাজনক। ট্যাংকে পর্যাপ্ত বাতাস সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ সমস্ত ট্যাংক ১.৫ মিটার থেকে ২. মিটার গভীর এবং অন্য ট্যাংকের চেয়ে উঁচু স্থানে নির্মাণ করা গেলে পানি সরবরাহ সহজতর হয়।

মিশ্রণ ট্যাংক ঃ লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে চাহিদানুযায়ী মিশ্রিত লবণ পানি সরবরাহের জন্য লবণ পানি ও স্বাদুপানি এ ট্যাংকে মিশ্রিত করা হয়। অনেক সময় প্রয়োজনে পানি মিশ্রনের পর তা শোধন করা হয়। এ ট্যাংকের আয়তন হ্যাচারির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপনা সুবিধার জন্য ১০-২০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংকই উপযোগী। ছোট হ্যাচারিতে একটি ট্যাংক বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়, স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক ট্যাংক পৃথক পৃথক কাজে ব্যবহার করাই উত্তম।

ফিল্টার ঃ হ্যাচারিতে পরিশ্রুত পানি সরবরাহের জন্য ফিল্টার স্থাপন করা হয়। হ্যাচারি ট্যাংক নির্মাণপূর্বক তাতে বালু, কাঁকর ও অন্যান্য ফিল্টারেট দিয়ে ফিল্টার নির্মাণ করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানী নির্মিত প্রেসার স্যান্ড ফিল্টারও ব্যবহার করা যায়। ফিল্টারের সংখ্যা এবং ক্ষমতা হাচারিতে পানি সরবরাহ চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। সমুদ্র, নদী বা খাল থেকে পানি সংগ্রহ করে তা থিতানোর পর ফিল্টার করতে হয়। পানি, রাসায়নিক শোধনের পরও ফিল্টারে ব্যবহৃত হয়।

পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন সুবিধা ঃ স্থানীয় পিভিসি পাইপের সাহায্যে পরিশ্রুত পানি মজুদ ট্যাংক থেকে সরাসরি লার্ভা টাংকে গ্র্যাভিটির মাধ্যমে অথবা পাম্পের সাহায্যে সরবরাহ করা যায়। পানি সরবরাহকালে

কোনভাবে পানি যেন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত না হয় এরূপভাবে পাইপসমূহ স্থাপন ও সংরক্ষণ করতে হয়।

পানি নিষ্কাশন সাধারণত ড্রেনের মাধ্যমে করা হয়। প্রতিটি ট্যাংক এবং ড্রেন এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন ট্যাংক থেকে সহজে পানি ড্রেনের মাধ্যমে হ্যাচারি এলাকা থেকে বের হয়ে যেতে পারে। ব্যবহৃত পানি একটি পুকুর বা ট্যাংকে রেখে সেখান থেকে পুনরায় শোধনপূর্বক হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যায়।

পাম্প ঃ হ্যাচারিতে বিভিন্ন ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকার পাম্প ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত সেন্টিফিউগাল ও সাবমারসিবল পাম্প হ্যাচারিতে ব্যবহৃত হয়। বড় হ্যাচারিতে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প বেশি ব্যবহৃত হয়। অনেক হ্যাচারিতে এক ট্যাংক থেকে অন্য ট্যাংকে পানি নেবার জন্য সাবমারসিবল পাম্প ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লবণাক্ত পানিতে ব্যবহারযোগ্য ও কম বিদ্যুৎ খরচের পাম্প ব্যবহারে উৎপাদন খরচ কমানো যায়। বড় হ্যাচারিতে ট্যাংকসমূহ যথোপযুক্ত উচ্চতায় স্থানে করে পাম্প ব্যবহার সীমিত রাখা যায়।

বাতাস সরবরাহ

লার্ভা প্রতিপালন, পানি শোধন, আর্টিমিয়া হ্যাচিং ইত্যাদি কাজে হ্যাচারিতে অনবরত বাতাস সরবরাহ ব্যবস্থা রাখতে হয়। পাইপের সাহায্যে সরবরাহকৃত বাতাসের পরিমাণ হ্যাচারির মোট ব্যবহৃত পানি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাতাস সরবরাহের জন্য রুট্স ব্লোয়ার ঘূর্ণায়ন ব্লোয়ার ও কমপ্রেসার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সকল পানির ট্যাংক ও আর্টিমিয়া ট্যাংকে পানি রেখে বাতাস সরবরাহ পূর্বক ব্লোয়ারের ক্ষমতা পরীক্ষা করো বাতাস সরবরাহ পদ্ধতি ও ব্লোয়ার বাছাই করতে হয়। প্রতি হ্যাচারিতে একটি অতিরিক্ত ব্লোয়ার রাখা উচিত। ব্লোয়ার হ্যাচারির শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত।

জেনারেটর ঃ দুর্যোগ ও আপদকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে হ্যাচারির পাম্প ও ব্লোয়ার চালু রাখার জন্য ব্লোয়ার ও পাম্পের চাহিদানুযায়ী জেনারেটর রাখা প্রয়োজন। ছোট হ্যাচারিতে অনেক সময় আর্থিক কারণে জেনারেটর সংগ্রহ উপযুক্ত নাও হতে পারে।

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিবিধ দ্রব্যাদি ঃ হ্যাচারি পরিচালনাকালে যে সমস্ত ছোটখাট দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় তা নিম্নরূপ ঃ

- বিভিন্ন প্রকারের বালতি।
- ওজন মাপার যন্ত্র (১ কেজি, ২০ কেজি)
- বিভিন্ন প্রকার নেট।
- ফিল্টার নেট (৫, ১০০, ১৫০, ২৫০ মাইক্রন)
- বিভিন্ন ব্যাসের টিউব।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাংশ।
- পিভিসি পাইপ মেরামতি দ্রব্যাদি ও খুচরা অংশ।
- এপোক্সি রেজিন রং।
- ফাইবারগ্লাস মেরামতের দ্রব্যাদি।
- টুলস সমেত বাক্স।
- বিভিন্ন প্রকার ব্রাশ।
- পোনা পরিবহণের ব্যাগ, গ্যাস সিলিন্ডার ইত্যাদি।
- রোগ প্রতিরোধের ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি।
- খাদ্য পাকের সরঞ্জামাদি।
- পোনা দেখার সাদা ডিস্ক ইত্যাদি।

ঙ) হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের ধাপসমূহ

হ্যাচারিতে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া ও ধাপ অনুযায়ী পোনা উৎপাদনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহঃ গলদা চিংড়ির বক্ষ অঞ্চলে নিষিক্ত ডিম প্রথম অবস্থায় হলুদ থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তা খয়েরি ও সবুজাভ ধুসর রং ধারণ করে, এ অবস্থায় ডিম থেকে লার্ভা বের হয়ে এলে মা চিংড়ি তা পানিতে ছেড়ে দেয়। হ্যাচারিতে, নিষিক্ত ও শেষ পর্যায়ের ডিম বহনকারী ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহ করাই উত্তম। সংগৃহীত চিংড়ি হ্যাচারিতে আনার পর তা ২০ পিপি এম ফরমালিনে শোধন করে হ্যাচিং ট্যাংকে বা সরাসরি লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে ১২-১৫ পিপিটি লবণাক্ততার ২০-৩০ সে. মি. পানিতে রাখা হয়। এ সময় পর্যাপ্ত বাতাস সরবরাহপূর্বক ট্যাংক নিরিবিলি অবস্থায় রাখতে হয়। এ অবস্থায় চিংড়ির কোন খাদ্য প্রয়োজন হয় না। অপরিপক্ক ডিমওয়ালা চিংড়ি অন্য ট্যাংকে রেখে পরিচর্যার মাধ্যমে তা পরিপক্ক করে নেয়া যায়। ২০ থেকে ৩০ গ্রাম ওজনের মা চিংড়ি থেকে ২০ হাজার লার্ভা পাওয়া যায়। এ হিসেবে ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতানুযায়ী লার্ভা উৎপাদনের জন্য মা চিংড়ি সংগ্রহ করতে হয়।

লার্ভা বাছাই ঃ লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে প্রতি লিটারে ৩০-৫০ টি লার্ভা মজুদ করতে হয়। এজন্য হ্যাচিং ট্যাংক

থেকে সুস্থ সবল লার্ভা বাছাই পূর্বক লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে মজুদ করতে হয়। হ্যাচিং ট্যাংকে আলো আকর্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সবল পোনা বাছাই করা হয়। সরাসরি লার্ভা ট্যাংকে ফুটানো লার্ভার চলাফেরা এবং মাইক্রোস্কোপে লার্ভা পরীক্ষা করে এর সবলতা ও সুস্থতা সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়। দুর্বল, রোগাক্রান্ত লার্ভা প্রতিপালন করে ভালো ফল পাওয়া যায় না, তাই এ জাতীয় লার্ভা ফেলে দেয়াই ভাল।

লার্ভা প্রতিপালন ঃ সে. মি. পানি রেখে লার্ভা মজুদ করতে হয়। লার্ভা ট্যাংক পরিষ্কারকালীন সময় ছাড়া অন্য সকল সময় অনবরত বাতাস সরবরাহ করতে হবে। লার্ভার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির গভীরতা বৃদ্ধি করে ০.৮০ থেকে ১ মিটার পর্যন্ত পানি লার্ভা পালন ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়।

লার্ভা ফুটে বের হবার প্রথম দুইদিন কোন খাবার দেবার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় দিন থেকে পরবর্তী ১০–১২ দিন আর্টিমিয়া নউপ্লি পরিমিত পরিমাণে প্রদান করতে হয়। এ সময় পানির গভীরতা কম রেখে খাদ্যের সাশ্রয় করা যায়। আর্টিমিয়া ব্যবহারকালে পানির গুণাগুণ সাধারণত ব্যাপক পরিবর্তন হয় না। এজন্য এ সময় স্বল্প পানি পরিবর্তন অথবা কেবল পানির সংযোজন করে পানির গভীরতা বৃদ্ধি করলেই চলে। ট্যাংকের তলার মৃত আর্টিমিয়া, ময়লা, লার্ভার খোলস সহ অন্যান্য আবর্জনা সাইফুন পদ্ধতিতে অপসারণ করতে হবে।

লার্ভার বয়স ১২ দিন হলে আর্টিমিয়ার পাশাপাশি প্রস্তুতকৃত কাস্টার্ড ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত সন্ধ্যায় বা রাতে আর্টিমিয়া এবং দিনে ৩ থেকে ৪ বার পরিমিত তৈরি খাবার, ট্যাংকের সমগ্র পানির ওপরে ছিটিয়ে দিতে হয়। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, ট্যাংকে যেন অব্যবহৃত খাদ্য তলায় পড়ে না থাকে। পরিমিত খাবার দিলে তা তলায় জমা হবার সম্ভাবনা থাকে না। ট্যাংকের যে স্থানে আলো বেশি থাকে সেখানে লার্ভার উপস্থিতি বেশি হয় বিধায় এ এলাকায় খাবার বেশি দিতে হবে।

বদ্ধ পানি সঞ্চালন পদ্ধতিতে ট্যাংকের তলার পানি ছাকনির মাধ্যমে বাতাস সঞ্চালনের সাহায্যে ফিল্টারে সরবরাহ করে তা পুনরায় লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে সরবরাহ করা হয়। অন্য পদ্ধতিতে, শোধন পুকুরে পানি শোধনের পর ফিল্টারের মাধ্যমে পানি মজুদ ট্যাংকে সংরক্ষণ করে লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে সরবরাহ করা হয়।

লার্ভা ট্যাংকের পানির গুণগুণ নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার, যেমন পানির তাপমাত্রা, আন–আয়োনাইজড অ্যামোনিয়া, পিএইচ ইত্যাদি, পাশাপাশি পানি সরবরাহকালে পানিতে ক্লোরিনের মাত্রা এবং পানির লবণাক্ততা পরীক্ষা করতে হয়। ক্লোরিন থাকলে তা মুক্ত করে লার্ভা ট্যাংকে সরবরাহ করতে হয়। লার্ভা বড় হবার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে পানির লবণাক্ততা কমিয়ে আনা যায়। অধুনা লবণাক্ত পানির ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য লার্ভা ট্যাংকে ১৫ দিন লার্ভা পালনের পরে লবণাক্ত ৮–১০ পিপিটি পর্যন্ত নামিয়ে রাখা হয়। এক্ষেত্রে লার্ভার চলাফেরা এবং স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে, আর্টিমিয়া নউপ্লি খুব অল্প সময়ে মারা যায় কিনা তাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পোষ্ট লার্ভা পরিচর্যা

লার্ভা মোট ১১টি পর্যায় অতিক্রম করে পোষ্ট লার্ভা পর্যায়ে উপনীত হতে প্রায় ২৫–৩০ দিন সময় লাগে। তাপমাত্রা, খাদ্য ও পানির গুণাগুণের সাথে এ সময়ের তারতম্য ঘটে থাকে। লার্ভা, পোষ্ট লার্ভায় উপনীত হবার পাশাপাশি ট্যাংকের পানির লবণাক্ততা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে বাজারজাতকরণের পূর্বেই সম্পূর্ণ স্বাদুপানিতে রূপান্তরিত করতে হয়। পোষ্ট লার্ভাকে আর্টিমিয়া না দিয়ে কেবল তৈরিকৃত কাস্টার্ড অথবা স্টার্টার পিলেট খাদ্য দেয়া যায়। স্বাদুপানিতে সাধারণত আর্টিমিয়া নউপ্লি বাঁচে না, এ অবস্থায় ময়না বা অন্য স্বাদুপানির জুপ্লাঙ্কটন পোনাকে খাওয়ানো যায়। পানির গুণাগুণ ঠিক রাখা এবং ক্ষতিকর শ্যাওলা যেন ট্যাংকে জন্মাতে না পারে সেজন্য লার্ভা ও পোষ্ট লার্ভা ট্যাংক ঢেকে আলো নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

পানি শোধন পদ্ধতি

ফিল্টারকৃত মিশ্রিত পানি এবং স্বাদু পানি ৩০ পিপিএম ব্লিচিং পাউডার দ্বারা শোধন করা হয়। পানিতে ক্লোরিনের পরিমাণ শূন্য করার জন্য ক্লোরিন প্রদানের পর পর্যাপ্ত বাতাস সরবরাহের মাধ্যমে পানির ক্লোরিন অপসারিত করতে হয়। কোন কারণে পানিতে ক্লোরিন থেকে গেলে তা সোডিয়াম থায়োসালফেটের দ্বারা ($Na_2S_2O_3, 5H_20$) ক্লোরিন মুক্ত করা যায়। পর্যাপ্ত বাতাস এবং আলো থাকলে এমনিতেই পানির ক্লোরিন ২–৩ দিনে চলে যায়। শোধনকৃত পানি পুনরায় ফিল্টারের মাধ্যমে পানি মজুদ ট্যাংকে রেখে ব্যবহার করা হয়। লার্ভা ট্যাংকে পানি সরবরাহের সময় ৫ মাইক্রোন প্রপাইলিন ব্যাগে ছেঁকে নিলে পানি প্রটোজোয়া মুক্ত করা যায়।

ছ) খাদ্য সরবরাহ

গলদা চিংড়ির লার্ভা এবং পোষ্ট লার্ভাকে জীবন্ত খাবার এবং তৈরি খাবার প্রদান করা যায়। যে সমস্ত খাবার অতি সহজে পানির তলে যায় সে সমস্ত খাবার ব্যবহার করা উচিত নয়। গলদা হ্যচারিতে আর্টিমিয়া নউপ্লি এবং কাস্টার্ড ব্যবহৃত হয়।

আর্টিমিয়া ঃ উন্নতমানের এবং ভালোভাবে সংরক্ষিত আর্টিমিয়া সিস্ট ক্যানের গায়ে লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী হ্যাচিং করা হয়। হ্যাচিং পাত্রে আর্টিমিয়া সিস্ট দেবার পূর্বে তা ক্লোরিন পানিতে ধুয়ে, পুনরায় পর্যাপ্ত স্বাদুপানিতে ধুয়ে নিলে সিস্ট থেকে সংক্রমণ রোধ করা যায়। আর্টিমিয়ার হ্যাচিং এর জন্য লবণাক্ত পানি, ২০-৩০ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত বাতাস সরবরাহ এবং আলোর ব্যবস্থা রাখতে হয়। আর্টিমিয়া নউপ্লি সাধারণত ২০-২৪ ঘন্টা পরই সংগ্রহ করা যায়, সংগৃহীত নউপ্লি ব্যবহারের পূর্বে ১০ পিপিএম ফরমালিনে শোধনপূর্বক স্বাদুপানিতে ভালেভাবে ধুয়ে লার্ভার ট্যাংকে সরবরাহ করলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে।

তৈরি খাদ্য, কাস্টার্ড ঃ চিংড়ির লার্ভা এবং পোষ্ট লার্ভা উভয়ের জন্য কাস্টার্ড ব্যবহৃত হয়। পূর্বে কাস্টার্ড তৈরির জন্য বিভিন্ন উপাদান যেমন মাছ, ঝিনুকের মাংস, ভিটামিন, তেল, কাস্টার্ড পাউডার, ডিম, দুধ ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। এ সমস্ত উপাদান পানির গুণাগুণ সংরক্ষণের স্বার্থে ব্যবহার না করাই ভালো। বর্তমানে শুধু ডিম ও দুধ ১ঃ১ ব্লাইন্ডারে মিশিয়ে পর্যাপ্ত বাষ্পে সিদ্ধ করে তা ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয় (১ দিনের জন্য)। তৈরি কাস্টার্ড ২৫০ মাইক্রন নেটের সাহায্যে ছোট ছোট কণায় (সহজে পানিতে ভাসে) ভেঙ্গে বেশ কয়েক বার পানিতে ধৌত করতে হয় যেন দুধ ও ডিমের কোন অংশ পানিতে দ্রবীভূত হতে না পারে। অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টিবাইওটিক্স মিশিয়ে খাদ্য দেয়া হয় এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও মিনারেল অনেকে ব্যবহার করেন। সাধারণত লার্ভা প্রতিপালনে যত কম ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় উৎপাদিত পোনা ততবেশি সবল থাকে।

জ) লার্ভার ট্যাংক পরিষ্কার রাখা

পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য লার্ভার ট্যাংক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। যে সমস্ত খাদ্য দেয়া হয় তার অব্যবহৃত অংশ নিয়মিত সাইফুন করে তুলে ফেলা প্রয়োজন, কারণ এর পচনে পানিদূষণ হতে পারে। অনেক সময় ট্যাংকের দেয়ালে আর্টিমিয়া সিস্ট লেগে থাকে, এ সমস্ত সিস্ট স্পঞ্জের সাহায্যে তুলে ফেলতে হয়। সাইফনের সাহায্যে অবশিষ্ট খাদ্য কণা ও ময়লা বের করার সময় পানির সাথে লার্ভা চলে আসে। এ সমস্ত লার্ভা ময়লা থেকে পৃথক করে পুনরায় লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে ফেরত রাখা যায়।

ঝ) পানির গুণাগুণ পরীক্ষা

লার্ভা ট্যাংকের পানির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, আন-অ্যানাইজড অ্যামোনিয়া, নাইট্রেইট, পিএইচ ইত্যাদি পরীক্ষা করা উচিত। পানি সরবরাহের পূর্বে পানিতে ক্লোরিনের মাত্রা বা উপস্থিতি এবং লবণাক্ততা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় পানি পরিবর্তন ও ট্যাংক নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রেখে পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ করা যায়। ট্যাংকে প্রতিপালিত লার্ভার চলাফেরা, খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা ও স্বাভাবিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও পানির উপযুক্ততা বিষয়ে সাধারণ ধারণা নেয়া যায়।

ঞ) রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণ

হ্যাচারিতে প্রতিদিনকার তৎপরতা, পানির গুণাগুণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ট্যাংক ভিত্তিতে লার্ভার অবস্থা, সংখ্যা, গৃহীত ব্যবস্থাদি ইত্যাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ সংরক্ষণ আকারে করা গেলে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়। হ্যাচারির ধরন ও আকার অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহ ছক হ্যাচারি পরিচালকগণ নিজ নিজ সুবিধা মত তৈরি করে নিতে পারেন।

ট) রোগ সংক্রমণ রোধ

গলদা হ্যাচারিতে মুলত পানি, সরবারহকৃত খাদ্য, ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির মাধ্যমে রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে। এজন্য এ সমস্ত জিনিস ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পানি ভালোভাবে শোধনপূর্বক সরবরাহ করা হলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি ও সংরক্ষণ করা উচিত অর্থাৎ ব্যবহৃত পাত্র পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ভালো ডিম, দুধ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। আর্টিমিয়া নউপ্লি ১০ পিপিএম ফরমালিনে শোধনপূর্বক ব্যবহার করা উচিত। সরঞ্জামাদি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে ব্লিচিং পাউডার দ্রবীভূত পানিতে অথবা ফ্লোরাক্স পানিতে শোধনপূর্বক ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে। হ্যাচারির অভ্যন্তর এবং নিষ্কাশন নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

লার্ভার দেহে সাধারণত পরজীবী, যেমন জুথামনিয়াম (Zoothamnium) ইপিস্টাইলিস (Epistylis) হাইড্রয়েডস (Hydroids) ইত্যাদির সংক্রমণ হতে পারে। চাষের পূর্বে ফ্লোরাক্স বা ক্লোরিন (ব্লিচিং) দ্বারা ট্যাংক ভালোভাবে ঘসে পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দিয়েও ট্যাংক শোধন করে শুকিয়ে লার্ভা পালন শুরু করা যায়।

লার্ভা পালনকালে উল্লেখিত পরজীবীর সংক্রমণ দেখা দিলে ১০-২০ পিপিএম ফরমালিন অথবা ১-২ পিপিএম গ্লুটারএলডিহাইউ পর পর ২-৩ দিন ব্যবহার করে পরজীবী নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে, উপযুক্ত অ্যান্টিবাইওটিক খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা যায়। রোগ চিকিৎসার চেয়ে রোগ যেন না হয় সে জন্য হ্যাচারি ব্যবহৃত পানির স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান হওয়াই উত্তম।

ঠ) পোনা (Post Larvae) আহরণ ও বিক্রয়

গলদা চিংড়ি লার্ভা, পোষ্ট লার্ভা অবস্থায় উপনীত হবার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে পানির লবণাক্ততা কমিয়ে আনতে হয়। এ অবস্থায় পোনাকে বাজারজাতকরণের জন্য পৃথক ট্যাংকে (হ্যাচারি গৃহের বাইরে) রেখে পরিচর্যা করা ভালো। স্কুপনেট দ্বারা পোনা ধরে প্রতি লিটার পানিতে ১২৫-২৫০ টি পোনা অক্সিজেন ব্যাগে সরবরাহ করা যায়। ব্যাগে এক-তৃতীয়াশ পানি ও দুই-তৃতীয়াংশ অক্সিজেন প্রদান করে বরফের সাহায্যে (ব্যাগের বাইরে) তাপমাত্রা ১৮-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রেখে পরিবহণ করা গেলে পরিবহণজনিত মৃত্যুহার কম হয়।

হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা খামারের নার্সারিতে প্রতিপালন করে মূল চাষ এলাকায় ছাড়া গেলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। হ্যাচারির সকল ব্যবস্থাপনা নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পানির গুণাগুণ সংরক্ষণের ওপর বেশি নির্ভরশীল। হ্যাচারির পানি, খাদ্য, যন্ত্রপাতির স্বাস্থ্য রক্ষাপূর্বক পদ্ধতিগতভাবে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা করা গেলে গলদা চিংড়ি পোনা উৎপাদন কোন জটিল প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হয় না। গলদা চিংড়ি লার্ভা অন্য চিংড়ির লার্ভার চেয়ে বেশ শক্ত তাই এর পরিচর্যাও মোটামুটি সহজ।

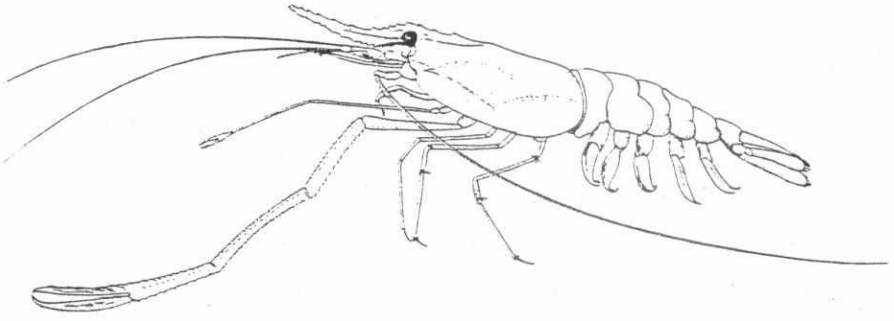

ফসলচক্রের ভিত্তিতে উপকূলীয় মৎস্যচাষ

নাহিদ সুলতানা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
ডঃ এম. এ. হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষনা ইনষ্টিট্যুট, কক্সবাজার।

কৃষিতে ফসলচক্রের ব্যবহার বহুকাল থেকেই চলে আসছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো একই ভূমিতে বা চাষাধীন জমিতে ফসলের রোগবালাই, কীটপতঙ্গের আক্রমণ ইত্যাদি হ্রাস করার জন্য পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ধরনের ফসলের আবাদ করা। এক এক ধরনের উদ্ভিদ বা ফসলের রোগ বালাই ভিন্নতর হয়ে থাকে, তদুপরি সব ধরনের শস্য, শাক-সব্জি মাটি থেকে সব সময় একই ধরনের পুষ্টি আহরণ করে না। তাই সার্থক ফসল চক্রের ব্যবহারে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে রোগবালাই, কীট-পতঙ্গের আক্রমণ যেমন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তেমনিভাবে একই পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতাও সুষমভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

কৃষির মতো মৎস্য চাষেও ফসলচক্র ব্যবহৃত হতে পারে। মাছ চাষে বহু আগে থেকেই পলিকালচার এবং মিশ্রচাষ পদ্ধতি প্রচলিত, পার্থক্য হলো কৃষিতে একটি ফসল উঠে যাবার পর ভিন্ন প্রজাতির অন্য ফসলের আবাদ করা হয়। মাছের ক্ষেত্রে পলিকালচার এবং মিশ্রচাষের বেলায় একই সময়ে একাধিক প্রজাতির চাষ হয়ে থাকে যাতে এরা পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের খাদ্য আহরণ করে, অথবা ভিন্ন উৎস বা ভিন্ন ধরনের খাদ্য খেয়ে বড় হতে পারে। এই পদ্ধতিতে জলাশয়ে উৎপাদিত বহু ধরনের খাবার বা একাধিক স্তরের প্রাকৃতিক খাবারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। কৃষি উদ্ভিদের অবস্থান একটি নির্দিষ্ট স্তরে অর্থাৎ ভূমির শুধুমাত্র উপরিভাগে, জলাশয়ে মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির অবস্থান থাকে প্রজাতি ভেদে পানির ভিন্ন স্তরে, তাই কৃষির তুলনায় মৎস্যচাষে পলিকালচার এবং মিশ্রচাষের সুবিধা বেশি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মাছ বা চিংড়ি চাষে আমরা ফসলচক্রের ব্যবহার কেন করবো। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে একই পুকুর বা জলাশয়ে ক্রমান্বয়ে একই প্রজাতির মাছ বা চিংড়ির চাষের ফলে ধীরে ধীরে এদের উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে এবং রোগবালাই ও পরজীবীর আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা জানি সব প্রজাতির মাছের বা চিংড়ির রোগবালাই এক ধরনের নয় অথবা ভিন্নভিন্ন প্রজাতির মাছ/চিংড়ি একই ধরনের পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই একটি পুকুরে বছরের পর বছর একই প্রজাতির মাছ বা চিংড়ির একক চাষ করা হলে এদের সম্ভাব্য রোগের জীবাণু বা এর উৎস, পরজীবী বা এর বাহন, বিশেষ ধরনের পানি বা মাটি দূষণের কারণ ঐ পুকুরে থেকে যাবার সম্ভাবনা বেশি, তাই প্রথম ফসলের পর দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ফসলের পর তৃতীয় এবং ক্রমান্বয়ে ফসলের ওপর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আশার কথা আমাদের মৎস্য খাতে বাগদা এবং ক্ষেত্র বিশেষে গলদা ছাড়া অন্য প্রজাতির একক চাষ তেমন হয়না বল্লেই চলে। ইদানিং মাগুর, সরপুঁটি ও তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে একক চাষ হচ্ছে। তবে মৌসুমী পুকুরেই এদের চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে- যেখানে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই ফসলচক্র পরিচালিত হয়।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে তথা স্বাদুপানির মৎস্যচাষে একক চাষের পরিমাণ কম, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অধিকাংশ মৎস্য খামারেই বিভিন্ন বহু প্রজাতির মাছ চাষ হয়ে থাকে। অপর দিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং একই বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করে অধিক মুনাফার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ির একক চাষ জনপ্রিয়। বাগদা চিংড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলের মৃদু লবণাক্ত পানির মাছের দামের মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকায় চাষীরা মাছ চাষ অপেক্ষা বাগদা চিংড়ি চাষে বেশি আগ্রহী। কৃত্রিম খাবার প্রয়োগে বাগদা চিংড়ির

চাষে খাদ্যের অত্যধিক মূল্যের জন্য চাষীরা উপকূলীয় কোন মাছই চিংড়ির সাথে চাষে আগ্রহী হবেন না।

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যেসব মাছ প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে বাঁচে এরাও পলিকালচারে বাগদা চিংড়ির কৃত্রিম খাবারে ভাগ বসায়। অর্থাৎ আবদ্ধ পানিতে ছোট অবস্থা থেকে এদের চাষ শুরু করা হলে এরা কৃত্রিম খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বাগদা চিংড়ির সাথে দুই প্রজাতির মুলেটসহ সরপুঁটি, গ্রাসকার্প, মিরর কার্প, রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি স্বাদুপানির প্রজাতির মিশ্রচাষে দেখা গেছে এরা শুষ্ক দানাদার কৃত্রিম খাবার বহুল পরিমাণে খেয়ে থাকে।

বাগদা চিংড়ির আধানিবিড় চাষে যেখানে প্রতি বর্গ মিটারে ২০-২৫টি চিংড়ি প্রতিপালিত হয় (একর প্রতি ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০), সে ক্ষেত্রে আধানিবিড় চিংড়ির সাথে একর প্রতি ৫,০০০ থাইসরপুঁটির ব্যবহার কৃত্রিম খাবারের চাহিদা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয় এবং চিংড়ির ফিড্ ইফিসিয়েনসি শতকরা হারে কমে যায়।

তাই আধানিবিড় চিংড়ি চাষে পলিকালচার অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন লাভজনক নয়। পক্ষান্তরে সনাতনী বা উন্নত সনাতনী চিংড়ি চাষে বাগদার সাথে উপকূলীয় যে কোন ধরনের অমাংসাশী মাছের চাষ লাভজনক হবে। ইদানিং উপকূলীয় বাগদা চিংড়ি চাষে ভাইরাসজনিত রোগের প্রকোপে চিংড়ির মড়ক দেখা দিয়েছে।এই মড়কের হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারে কার্যকরী কোন উপায় এখনো উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে আক্রান্ত অঞ্চলে দুয়েকটি ফসলে ভাল ফলাফল পাবার পর দেখা গেছে ঐসব পদ্ধতি গ্রহণের পরও বাগদা চিংড়ি ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বর্তমানে কোন কোন দেশে খামার পরিবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ২/৩টি ফসল তোলার পর ১টি খামার ২/১টি ফসলের সময়ে পতিত রেখে নতুন খামারে চাষ শুরু করা এবং পরবর্তীতে নূতন খামারটি পতিত রেখে পূর্ববর্তী খামারে পুনরায় চাষ করা। এই পদ্ধতিকে আমরা খামারচক্র বা Farm-rotation বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

বাংলাদেশের মতো স্বল্প ভূমির দেশে বাগদা চিংড়ি চাষে রিজার্ভার রাখা বা খামার চক্র ব্যবহারের সম্ভাব্যতা বহুলাংশে কম, একই ধরনের ফলাফলের জন্য আমাদের প্রয়োজন উপকূলীয় অঞ্চলের খামারসমূহে পর্যায়ক্রমে বাগদা চিংড়ি ও মাছের চাষ চালুর মাধ্যমে ফসলচক্র ব্যবহার। বিশেষ করে আধানিবিড় চিংড়ি চাষে ফসলচক্র জরুরি। এতে চিংড়ি রোগবালাইয়ের প্রকোপ যেমন কমে যাবে, তেমনি অর্থনৈতিক এবং পুষ্টির দিক দিয়েও চাষীরা এবং দেশবাসী হবেন উপকৃত।

আমাদের জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানও উপকূলীয় অঞ্চলে ফসলচক্র চালু এবং একে সার্থক করার পক্ষে উপযোগী।

উপকূলীয় বাগদা চিংড়ি চাষ সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে জুলাই-আগষ্ট মাসে শেষ হয়। কোন কোন খামারে অবশ্য দুটো ফসল তোলা হয়। কোথাও কোথাও বিশেষ করে সনাতনী বা উন্নত সনাতনী খামারে সারা বছরই কমবেশি পোনা ছাড়া ও চিংড়ি আহরণ চলতে থাকে। সে যাই হোক, বাগদা চিংড়ির জন্য যেহেতু লবণাক্ত পানির প্রয়োজন তাই বর্ষা মৌসুমের আগেভাগেই চাষীরা চিংড়ির সাইজ বড় করে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী।

বাগদার একটি ফসল তোলার পর, বিশেষ করে যেসব খামারে কৃত্রিম খাবার প্রয়োগ করা হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থের সমাবেশ ঘটে পুকুরের তলদেশে। সনাতনী খামারেও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত এবং পরবর্তীতে তলায় পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। দ্বিতীয় ফসলের চাষ শুরু করার পূর্বে স্বাভাবিকভাবেই এসব পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থ হয় অপসারণ করা দরকার অথবা একে নিষ্ক্রিয় করা অপরিহার্য। দুটো ব্যাপারই ব্যয়সাধ্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ফসলচক্রের ব্যবহারে এসব পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থ অপসারণ যেমন সম্ভব, তেমনি ভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হওয়া ছাড়াও রোগবালাইয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। চিংড়ি খামারে ফসলচক্রের মূল উদ্দেশ্যই হলো চাষীদের পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি ও মাছের চাষে আগ্রহী করে তোলা। এছাড়া বিগত কয়েক বছর থেকে আধানিবিড় চিংড়ি চাষে ভাইরাসজনিত রোগে যে মড়ক দেখা দিয়েছে এবং যা বর্তমানে সনাতনী এবং উন্নত সনাতনী খামারসমূহেও ছড়িয়ে পড়েছে, এর বিরুদ্ধে পরিবেশগতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এছাড়া উপকূলীয় জলভাগের বাস্তুসংস্থানগত অবস্থা [Ecological condition] অন্য যে কোন জলভাগ থেকে ভিন্ন ধরনের। জোয়ার-ভাটা ছাড়াও শুষ্ক মৌসুম এবং বর্ষাকালে উপকূলীয় অঞ্চলে পানির লবণাক্ততা দারুনভাবে ওঠানামা করে। এর ওপর ভিত্তি করে সঠিক ধরনের মাছ/চিংড়ি প্রজাতি ফসলচক্রের ভিত্তিতে চাষের ব্যবস্থা করা গেলে পরিবেশ

সহনীয় চাষের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের সরবরাহও বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে ফসলচক্র হিসেবে আমরা কোন্ কোন্ প্রজাতি নির্বাচন করবো। প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে তা হলো ঃ ক) অর্থনৈতিক গুরুত্ব, খ) দ্রুত বর্ধনশীল, গ) পোনার প্রাপ্যতা, ঘ) লবণাক্ততার দ্রুত ওঠানামায় সহনশীল, ঙ) প্ল্যাঙ্কটনভোজী, চ) ডেট্রাইটাস (Detritis) ভোজী এবং ছ) রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। উপরিবর্ণিত সবগুলো গুণাগুণ সম্পন্ন কোন চিংড়ি যা মাছের প্রজাতি পাওয়া দুষ্কর। তবে উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সুবিধাজনক একটি প্রজাতি নির্বাচন করে এর পরবর্তী ফসলের জন্য অন্য প্রজাতি আমরা নির্বাচন করতে পারি। এক্ষেত্রে প্রথম ফসলের জন্য নির্বাচিত প্রজাতিকে মূখ্য প্রজাতি এবং পরবর্তী প্রজাতি বা প্রজাতিসমূহকে গৌণ প্রজাতি হিসেবে ধরে নিরে সমস্যার সমাধান বহুলাংশে সম্ভব।

ক) **অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ** অর্থনৈতিক গুরুত্বের আলোকে মূখ্য প্রজাতি হিসেবে বাগদা চিংড়ির প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়িই একমাত্র ঈপ্সিত প্রজাতি হিসেবে চাষ করা হয়। হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সিংহভাগই আসে বাগদা চিংড়ি থেকে। এ ছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য প্রজাতি হলো গলদা চিংড়ি, ভেটকি মাছ, পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, সামুদ্রিক অন্যান্য চিংড়ি।

খ) **দ্রুত বর্ধনশীল ঃ** দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বাজারজাত উপযোগী প্রজাতির মাঝে বাগদা চিংড়ি প্রথম স্থান দখল করবে। এছাড়া তেলাপিয়া, অন্যান্য প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি, মুলেট, মৃদু লবণাক্ত পানিতে থাই সরপুঁটি এবং একেবারে কম লবণাক্ততায় কার্প জাতীয় অন্যান্য মাছের নাম করা যায়।

গ) **পোনা প্রাপ্যতা ঃ** বাগদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্য কয়েক দশক থেকেই এর পোনার বাণিজ্য উপকূলীয় অঞ্চলে চালু হয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস এবং হ্যাচারির মাধ্যমেও এর পোনা সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে। পোনার প্রাপ্যতার দিক দিয়ে গৌণ প্রজাতি হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করবে তেলাপিয়া। বছরের যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণ তেলাপিয়া পোনা পাওয়া যাবে। প্রাকৃতিক উৎস এবং হ্যাচারি থেকে গলদা পোনার সরবরাহও নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে। থাই সরপুঁটি এবং অন্যান্য প্রজাতির কার্প জাতীয় মাছের পোনা বর্ষা মৌসুমে অর্ডারমাফিক পাওয়া যায়।

ঘ) **লবণাক্ততার দ্রুত ওঠানামায় সহনশীল ঃ** এই অবস্থায় দ্রুত ও সহজে খাপ খাওয়ানোর মতো প্রজাতি হলো তেলাপিয়া, ভেটকি, বাগদা চিংড়ি, মুলেট ইত্যাদি। পাঙ্গাস মাছও লবণাক্ততায় দ্রুত ওঠানামায় সহনশীল।

ঙ) **প্ল্যাঙ্কটনভোজী ঃ** এই গ্রুপের মাঝে মুলেট, তেলাপিয়া এবং স্বাদুপানির কিছু কার্প জাতীয় মাছ যেমন কাতলা, সরপুঁটি, রুই, সিলভার কার্প অন্যতম।

চ) **ডেট্রাইটাসভোজী ঃ** বাগদা চিংড়ি, অন্যান্য প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি, মিল্ক ফিশ, পাঙ্গাস, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, মৃগেল প্রভৃতিকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

ছ) **রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ঃ** বাংলাদেশে মহামারি আকারে রোগবালাই দেখা দেয়নি এমন প্রজাতির মাঝে তেলাপিয়াই প্রধান, এ ছাড়া মহামারি আকারে গলদা চিংড়ির মড়ক এখনো দেখা দেয়নি। আমদানিকৃত কিছু কার্প জাতীয় মাছও রোগ প্রতিরোধে তুলনামূলকভাবে শক্ত বলে বিবেচিত।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় মূখ্য প্রজাতি হিসেবে বাগদা চিংড়ির সাথে আধানিবিড় চাষের পরবর্তী ফসল হিসেবে আমরা একাধিক প্রজাতিকে নির্বাচন করতে পারি। এই ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বাগদা উৎপাদনের পর বর্ষাকালে গলদার চাষ একই খামারে করা যাবে যদি খামারের পানি সম্পূর্ণ স্বাদুপানিতে রূপান্তর করা যায়। তবে আধানিবিড় বাগদা চাষের পর কৃত্রিম খাবার প্রয়োগে পুনরায় গলদার চাষ ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা কম। ফসলচক্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো খামারে পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থ অপসারণ। অল্প লবণাক্ত পানিতেও গলদার চাষ করা যেতে পারে। তবে বাগদার তুলনায় গলদা চাষে তুলনামূলকভাবে বেশি সময় লাগে একটি নির্দিষ্ট সাইজে উন্নীত করতে। বাগদা চাষের পর একই খামারে গলদা চাষ করা হলে খামারের পরিবেশগত এবং বাস্তুসংস্থানগত অবস্থার পরিবর্তন হয় বলে রোগবালাইয়ের উপদ্রব কম হবার সম্ভাবনা থাকে।

আধানিবিড় বাগদা চাষের পর একই পুকুরে পরবর্তী ফসল হিসেবে মুলেট বা তেলাপিয়ার চাষ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এতে পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থ পচনের ফলে পানিতে

জৈব সারের উপস্থিতিতে পর্যাপ্ত প্ল্যাঙ্কটনিক খাদ্যের সৃষ্টি হবে যা মুলেট বা তেলাপিয়ার খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এর সাথে আর কোন কৃত্রিম খাবার প্রয়োগ না করা হলে তলদেশের বর্জ্য ধীরে ধীরে কমে আসবে। এতে গৌণ ফসল আহরণের পর কম খরচে পরবর্তী বছরের মূখ্য ফসল অর্থাৎ বাগদা চাষের জন্য পুকুর তৈরি সহজতর হবে। তেলাপিয়া বা মুলেট চাষের জন্য খামারের পানির লবণাক্ততা কমানোর প্রয়োজন নেই। তবে বর্ষা মৌসুমে স্বাভাবিকভাবেই লবণাক্ততা কমলে এসব মাছের উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বেনা।

বাগদা চাষ যদি আধানিবিড় পর্যায়ের না হয়ে সনাতন পদ্ধতি বা উন্নত সনাতন পদ্ধতির হয় তবে বাগদা চাষের সময়ই পলিকালচার হিসেবে এর সাথে মুলেট বা মিল্ক ফিশের চাষ করা যেতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। সনাতনী বা উন্নত সনাতনী চাষে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে জৈব বর্জ্য জমা হয়না তাই পরবর্তী ফসলেও বাগদার সাথে অন্য মাছের প্রজাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন শুষ্ক মৌসুমে বাগদার সাথে মুলেট মাছের চাষ হলে বর্ষা মৌসুমে বাগদার সাথে কার্প জাতীয় মাছের চাষ করা যেতে পারে। স্বাদুপানির অধিকাংশ কার্পই মৃদু লবণাক্ত পানি সহ্য করতে পারে। এর মাঝে থাই সরপুঁটি এবং কমন কার্প তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। বাগদা লবণাক্ত পানির চিংড়ির হলেও এরা অত্যন্ত কম লবণাক্ত পানিতে বেঁচে থেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষামূলক ফসলচক্র ভিত্তিক বাগদা ও কার্প জাতীয় মাছের চাষে দেখা গেছে জুন মাসে বাগদা আহরণের পর জুলাই-আগষ্ট মাসে খামারের পানি স্বাদুপানিতে রূপান্তরের পর থাই সরপুঁটি, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প প্রভৃতি মাছ ছাড়ার ৩ মাস পর থাই সরপুঁটি গড়ে ৮০ গ্রাম এবং অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছ ২০০-২১০ গ্রামে উন্নীত হয়। কিন্তু বাজার দরের বিবেচনায় থাই সরপুঁটির দাম কার্প জাতীয় মাছের চেয়ে বেশি পাওয়া যায়। তাই বাগদা চাষের পর ফসল চক্রের পরবর্তী ফসল হিসেবে স্বাদু বা মৃদু লবণাক্ত পানিতে থাই সরপুঁটি চাষ করে অধিকতর লাভবান হওয়া সম্ভব।

উপকূলীয় অঞ্চলে একই বছর ফসলচক্র হিসেবে দুটো ফসল তোলার ক্ষেত্রে বাগদার পর অন্য যে কোন মাছের চাষে ৪/৫ মাসের বেশি সময় পাওয়া যায় না। তদুপরি ডিসেম্বর-জানুয়ারি এই ৩ মাসে মাছ বা চিংড়ির বৃদ্ধির হার প্রাকৃতিক কারণে মন্থর হয়ে পড়ে তাই দ্রুত বর্ধনশীল এবং বাজার উপযোগী সাইজ যে মাছের ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব তা নির্ধারণ করা দরকার। সনাতন চাষ ব্যবস্থায় বাগদা চিংড়ির ফসল তুলতে ৫/৬ মাস সময় লাগে তাই পরবর্তী অল্প সময়ে অন্য ফসল তোলা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কম লাভজনক হলেও পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থানগত অবস্থার বিচারে তা গুরুত্বপূর্ণ।

উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষে সারণত ৩ ধরনের ভূমি ব্যবহৃত হয়। আধানিবিড় বা উন্নতসনাতনী চাষে পুকুর তৈরি করে চিংড়ির চাষ হয়, এতে বাগদা চাষের পর ফসলচক্রের গৌণ ফসল হিসেবে অন্য যে কোন প্রজাতির চিংড়ি অথবা মাছ ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপর দিকে লবণ ক্ষেত্রে বর্ষা মৌসুমে সনাতন পদ্ধতিতে যে চিংড়ি চাষ করা হয় এতে পুনরায় অন্য ফসলের প্রয়োজন নেই। সে ক্ষেত্রে ফসলচক্র হিসেবে লবণ ও চিংড়িই যথেষ্ট। তবে চিংড়ি চাষের সময় প্ল্যাঙ্কটনভোজী যে কোন প্রজাতির মাছ পলিকালচার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সনাতন চাষ ব্যবস্থায় ঘের আকারে যে পদ্ধতিতে বাগদার চাষ করা হয় সে ক্ষেত্রে ঘেরের অধিকাংশ জমিই আসলে ধান ক্ষেত থেকে রূপান্তরিত। ঐ সমস্ত ঘেরে বাগদার সাথে ফসলচক্র হিসেবে ধানের চাষ করা যেতে পারে। অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে বাগদা চাষের পর বর্ষা মৌসুমে ধান চাষের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে এতে এক বর্ষ ব্যাপী ফসলচক্রের কথা বলা হয়েছে। একই বছর ফসলচক্র চালু না করে এক বা দুই বছর অন্তরও ফসলচক্র ব্যবহার করা যায়। এতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক বছর একটি খামারে আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষের পর পরবর্তী বছর তেলাপিয়া বা অন্য মাছের চাষ করা হলে খামারের তলদেশে পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় বা অপসারিত হবে। একটি খামারে একবার তেলাপিয়ার চাষ করা হলে তেলাপিয়া দূর করা কষ্টকর। এক্ষেত্রে একলিঙ্গের (mono-sex) তেলাপিয়া চাষ করা যেতে পারে।

মাছ ও চিংড়ির রোগবালাই ঃ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

মোঃ আবুল হোসেন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানোর জন্য এদেশে আধুনিক মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন সহজ বিকল্প নেই। এছাড়াও মাছ ও চিংড়ি এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাফল্যজনক ভাবে মাছ ও চিংড়ির রোগবালাই দমন, বাণিজ্যিকভাবে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের পূর্বশর্ত। বাণিজ্যিকভাবে মৎস্যচাষ শুরু করার আগে মাছ বা চিংড়ি রোগবালাই চেনার উপায়, কারণ নির্ণয়, প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ অত্যাবশ্যক।

রোগ কি?

পোষকের (host) সর্বানুকূল (optimum) জলজ পরিবেশের অবনতির কারণে সৃষ্ট পীড়ন (stress), কার্যকরী রোগজীবাণু (pathogen) এবং পোষকের দেহে স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির (natural immune resistance) আন্তঃক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থাকে রোগ বলা যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ

আসলে মাছ বা চিংড়ির রোগের প্রকার ভেদে আক্রান্ত পোষকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, পুকুরের মাছ বা চিংড়িতে নিম্নোক্ত এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে এরা কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

- খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দিলে বা একেবারেই বন্ধ করলে,
- গায়ে ক্ষত বা রক্তক্ষরণ হলে,
- লেজ ও পাখনা পচতে শুরু করলে,
- ফুলকা পঁচে গেলে,
- গায়ে তুলার ন্যায় ছত্রাক দেখা গেলে,
- গায়ে সাদা দাগ দেখা গেলে,
- ফুলকায় সাদা/কালো দাগ বা সিষ্ট দেখা গেলে,
- দেহের বর্ধনহার কমে গেলে,
- দেহের ভারসাম্য হারিয়ে গেলে ইত্যাদি।

বাংলাদেশে মাছ ও চিংড়ির অহরহ যে সমস্ত রোগবালাই দেখা যায়, সেগুলো চেনার উপায়, প্রতিরোধ/প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. মাছের ক্ষত রোগ (Epizootic Ulcerative Syndrome)

এদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় সব প্রজাতির মাছ কম বেশী এ রোগে সংবেদনশীল। এদেশের ৩২ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছে এ রোগ দেখা গেছে। Aphanomyces নামক এক প্রকার ছত্রাক একটি বিশেষ জলজ পরিবেশে এ রোগ সৃষ্টি করে।

লক্ষণ

- প্রাথমিকভাবে মাছের গায়ে লাল দাগ দেখা যায় এবং পরে ঐস্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- মাছ দুর্বল ও ভারসাম্যহীনভাবে পানির উপরিভাগে চলাফেরা করে।
- আক্রান্ত মাছ খাদ্য গ্রহণ করে না।
- আক্রান্ত মাছ দ্রুত মারা যায়।
- এ রোগ শীতকালে বেশী দেখা যায়।

প্রতিকার

- বড় মাছের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য ২৫ মিঃ গ্রাঃ হারে ক্লোরামফেনিকল সপ্তাহে ১ দিন, মাংসপেশীতে, মোট ৩টি ইনজেকশন দিলে দ্রুত ভাল হয়।

- মাছ ছোট হলে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ২০০ মি. গ্রা. হারে উপরোক্ত এন্টিবায়োটিক পাউডার মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

- প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত মাছকে ১ পিপিএম তুঁত ($CuSo_4$) দ্রবণে (যতক্ষণ সহ্য করতে পারে) সপ্তাহে ১ বার মোট ৩ বার ধৌত করলে যথেষ্ট উপকারে আসবে।

প্রতিরোধ

- শীতের শুরুতে এবং মাঝামাঝি সময়ে শতাংশে ১ কেজি হারে পুকুরে পাথর চুন প্রয়োগ করলে এ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

- পুকুর পরিষ্কার রাখা, বন্যার পানি বা মাছ ঢুকতে না দেয়া, আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জাল রোদে শুকিয়ে পরে অন্যত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

২. লেজ ও পাখনা পচা রোগ (Tail & finrot disease)

স্বাদুপানির কার্প ও ক্যাটফিশে এ রোগ বেশী হয়। অ্যারোমোনাস ও মিক্সোব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীবাণু এ রোগের কারণ।

লক্ষণ

- গায়ের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায়,
- লেজ ও পাখনার পর্দা ছিঁড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,
- দেহের ভারসাম্য হারায় ও খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত মাছ বড় হলে, প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য ১৫ মি. গ্রা. হারে জেনটামাইসিন মাংসপেশীকে ইনজেকশন করে দিতে হবে। মাছ ছোট সাইজের হলে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ৪০-৪৫ মি. গ্রা. একই এন্টিবায়োটিক মিশিয়ে কমপক্ষে ১০ দিন খাওয়াতে হবে।

- পোনামাছ হলে ১ পিপিএম তুঁত দ্রবণে (যতক্ষণ সহ্য করতে পারে) সপ্তাহে ২ দিন চুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিন।

প্রতিরোধ

- পুকুর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ,
- মজুদকৃত মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়া,
- জৈব সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা,

৩. পেটফোলা রোগ (Dropsy)

এদেশের স্বাদুপানির প্রায় সব মাছেই এ রোগ কিছু কিছু দেখা যায়। তবে কার্প/ক্যাট ফিশে এ রোগ বেশী দেখা যায়। অ্যারোমোনাস জাতীয় এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ।

লক্ষণ

- আক্রান্ত মাছের বক্ষগহ্বরে (body cavity) তরল পদার্থ জমে এবং তা বেশ ফুলে যায়,
- গায়ের রং ও স্বাভাবিক স্বচ্ছতা হারায়,
- দেহের ভারসাম্য হারায় এবং ধীরে ধীরে মারা যায়।

প্রতিকার

- প্রথমে জীবাণুমুক্ত সূচ দিয়ে বক্ষগহ্বর থেকে জমে থাকা তরল পদার্থ বের করে ফেলতে হবে। অতঃপর বড় মাছের ক্ষেত্রে ক্লোরামফেনিকল ২৫ মি. গ্রা. হারে (প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য) সপ্তাহে একবার ইনজেকশন করে দিতে হবে। মাছ ছোট হলে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে একই ঔষধ ২০০ মি. গ্রা. হারে মিশিয়ে কমপক্ষে দু'সপ্তাহ খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ

- মাছের ঘনত্ব কমিয়ে, জৈব সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হবে।
- পরীক্ষিত পরিমাণ সুষম খাদ্য নিয়মিত প্রয়োগ করতে হবে।
- পুকুরে নিয়মিত পাথর চুন শতাংশ ১ কেজি (৩ মাস অন্তর) হারে দিতে হবে।

৪. ছত্রাক জনিত রোগ (Fungul disease)

এদেশের মিঠাপানির প্রায় সব মাছই ছত্রাক রোগে সংবেদনশীল। সাধারণত স্যাপ্রোলেগনিয়া জাতীয় ছত্রাক এদেশে বেশী দেখা যায়। আঘাত প্রাপ্ত মাছ সহজেই ছত্রাক আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ

- আক্রান্ত মাছের মুখে, ঠোঁটে, পাখনায়, লেজে বা ক্ষত স্থানে তুলার ন্যায় সাদা ছত্রাক খালি চোখেই দেখা যায়,

- দেহের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ও শক্তি হারায়,
- আক্রান্ত মাছ ধীরে ধীরে মারা যায়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত মাছকে ০.১৫ পিপিএম ম্যালাকাইট গ্রীন অথবা ০.৫ পিপিএম তুঁত, অথবা ০.১ পিপিএম মিথাইলিন ব্লু অথবা ২.৫ শতাংশ সাধারণ লবণ দ্রবণে (যতক্ষণ সহ্য করতে পারে) চুবিয়ে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিন। একাজ সপ্তাহে ১ বার, মোট ৩ বার করতে হবে।

প্রতিরোধ

- মাছ বা মাছের পোনা পরিবহণ/স্থানান্তর বা জাল টানার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে মাছের গায়ে কোন প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি না হয়
- পুকুরের পানি জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য শতাংশে ১ কেজি হারে পাথর চুন প্রয়োগ করতে হবে।

৫. মাছের সাদা দাগ রোগ (White spot disease of fish)

এ রোগ কার্প জাতীয় মাছে বেশী দেখা যায় এবং এককোষী পরজীবী ইনথাইয়োপথিরিয়াস দ্বারা সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

- মাছের গায়ে, লেজে, পাখায় সাদা সাদা দাগ হয়,
- ফুলকায় বা গায়ে সিষ্ট দেখা যায়,
- গায়ের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায় এবং স্বাভাবিক স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে,
- শীতকালে এ রোগ বেশী দেখা যায়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত মাছকে ৫০ পিপিএম ফরমালিন, অথবা ১.০ পিপি এম তুঁত, অথবা ২.৫% লবণ দ্রবণে (যতক্ষণ সহ্য করতে পারে) সপ্তাহে ১ বার মোট ৩ বার চুবিয়ে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রতিরোধ

- পুকুর শামুক/ঝিনুক মুক্ত রাখতে হবে।
- পুকুরে নিয়মিত (৩ মাস অন্তর) চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- পুকুরে পোনা মজুদের আগে লবণ (২.৫%) জলে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জাল রোদে না শুকিয়ে অন্যত্র ব্যবহার করা যাবে না।

৬. ট্রাইকোডাইনিয়াসিস (Trichodiniasis)

এককোষী পরজীবিজনিত রোগের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভব পোনা মাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশী, রুই জাতীয় পোনা তথা গ্রার্স কার্প এ রোগে সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল। ট্রাইকোডিনা নামক এককোষী পরজীবি এ রোগ সৃষ্টি করে।

লক্ষণ

- আক্রান্ত মাছের ফুলকায় ঈষৎ হলদে রঙ্গের সিষ্টদেখা যায়,
- মাছ দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকে,
- ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয় এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়,
- পোনা মাছ দ্রুত মারা যায়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত মাছকে ৫০ পিপিএম ফরমালিনে ২৪ ঘন্টা বা ২৫০ পিপিএম ফরমালিনে ৩-৫ মি., অথবা ২০০০ পিপিএম বা ২% সাধারণ লবণে ১৫-২০ মিনিট চুবিয়ে রেখে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রতিরোধ

- মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়া এবং জৈবিক বর্জ্য পদার্থ বা জৈব সার প্রয়োগ স্থগিত রাখতে হবে।
- পানিতে পাথর চুন (প্রতি শতাংশে ২কেজি) প্রয়োগ করতে হবে।

৭. মাছের উকুন (Argulosis)

আরগুলাস নামক এক প্রকার পরজীবী দ্বারা প্রধানত ব্রুড মাছে এ রোগ দেখা যায়। কার্পজাতীয় মাছে এ রোগের প্রকোপ বেশী।

লক্ষণ

- পরজীবী মাছের মাংসপেশীতে, পাখনায় হুল ফুটিয়ে বসে বসে রক্ত শোষণ করে এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়,

- ক্ষতস্থানে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের পথ সুগম করে দেয়,
- মাছের দৈহিক বর্ধন হার কমে যায়।

প্রতিকার

- রোগাক্রান্ত পুকুরে ০.৫ পিপিএম ডিপটেরেক্স অথবা ০.২৫ পিপিএম ম্যালাথিয়ন বা প্যারাথিয়ন ১৫ দিন অন্তর কমপক্ষে দুইবার প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিরোধ

- মাছের মজুদ হার কমিয়ে দিয়ে পুকুরে পাথর চুন (শতাংশে ১ কেজি) প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জাল রোদে না শুকিয়ে অন্য পুকুরে ব্যবহার করা যাবে না।
- জৈব সার/বর্জ্য পুকুরে দেয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হবে।

চিংড়ির সাধারণ রোগসমূহ

আগেই বলা হয়েছে যে পরিবেশ, প্যাথোজেন এবং পোষক বিভিন্নভাবে মিশ্রক্রিয়ার (interaction) ফলে রোগের উৎপত্তি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে চিংড়ির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিবেশগত পীড়নের ফলেও মড়ক দেখা দিতে পরে। এদেশে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল এবং পর্যাপ্ত কারিগরি সুযোগ-সুবিধার অভাবে চিংড়ি রোগের ওপর তেমন গবেষণা হয়নি বললেই চলে। শুধুমাত্র যখন রোগবালাই দেখা দিয়েছে, তৎকালীন কিছু চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি পোনার উৎস, ও অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ, উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সমস্ত রোগবালাই এদেশে সনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো। নিম্নে চিংড়ির কিছু সাধারণ রোগবালাই প্রতিকার/প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

চিংড়ি রোগের সাধারণ লক্ষণ

মাছের মত চিংড়ির রোগের প্রকারভেদে লক্ষণ ভিন্নতর হতে পারে। তবে নিম্নোক্ত এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে চিংড়ি কোন-না-কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

- চিংড়ি পুকুরের পাড়ের কাছে অলস ভাবে ঘোরাফেরা করে,
- খাদ্য গ্রহণ করে না, খাদ্য নালি শূন্য থাকে,
- ফুলকায় কালো/হলদে দাগ পড়তে পারে।
- মাংসপেশী সাদা/হলদে হয়ে যেতে পারে,
- চিংড়ির 'শেল' নরম হতে পারে,
- চিংড়ির 'শেলস্থ এবং মাথায় সাদা দাগ হতে পারে,
- অ্যাপেনডেজ পচে/ নষ্ট হয়ে যেতে পারে,
- চিংড়ি দ্রুত/ধীরে ধীরে মরে যেতে পারে।

১. চিংড়ির সাদা দাগ রোগ (Whitespot disease of shrimp)

এ রোগ এদেশের কক্সবাজার অঞ্চলে প্রথম দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এ রোগ এখনও মূলত বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। এটি ভাইরাস জনিত একটি রোগ।

লক্ষণ

- চিংড়ির দেহে খোলসের নিচে মাথায়, সাদা সাদা দাগ খালি চোখেই দেখা যায়,
- আক্রান্ত হবার লক্ষণ দেখা দেয়ার ৪/৮ দিনের মধ্যে চিংড়ি মারা যায়,
- চিংড়ি পোনা মজুদের ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

প্রতিরোধ

- বাংলাদেশী রোগমুক্ত চিংড়ি পোনা ব্যবহার করুন।
- বিদেশী বা কালোবাজারে আনা চিংড়ি পোনা রোগাক্রান্ত কিনা নিশ্চিত না হয়ে মজুদ করবেন না।
- আধানিবিড় এবং উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।
- রোগাক্রান্ত খামারের জাল কড়া রোদে ভালভাবে না শুকিয়ে অন্য পুকুরে/খামারে ব্যবহার করবেন না।
- শুধুমাত্র পরিমিত পরিমাণ সুষম চিংড়ি খাদ্য ব্যবহার করুন।
- রোগাক্রান্ত পুকুরের পানি/কাঁদা যাতে অন্য পুকুরে না যায় যে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিকার

ভাইরাস জনিত কোন রোগের কোন চিকিৎসা নেই। কাজেই আজেবাজে ঔষধের যথেচ্ছ ব্যবহার ভাইরাস রোগাক্রান্ত চিংড়ির উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে।

২. চিংড়ির কালো ফুলকা রোগ (Black gill disease of shrimp)

এ রোগ বলদা চিংড়িতে শুধুমাত্র আধানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এ রোগ দু'ভাবে হতে পারে।

(১) পুকুরের তলায় মাত্রাতিরিক্ত জৈব পদার্থ,

(২) মেলানিন নামক এক প্রকার রং বিভিন্ন উৎস (যেমন খাদ্য, পানি, সার ইত্যাদি) থেকে আসতে পারে।

লক্ষণ

- ফুলকায় কালো দাগ ও পচন দেখা যায়,
- ফুলকায় কালো রংঙের বর্জ্য পদার্থ জমে থাকে এবং ফুলকার স্বাভাবিক কাজ কর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়,
- স্বাভাবিক রং ও স্বচ্ছতা হারায়,
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেয়া দেয়,
- দেহের বর্ধন হার কমে যায়,
- আক্রান্ত চিংড়ি ধীরে ধীরে মারা যায়।

প্রতিরোধ

- পুকুরের তলা বিশেষ করে পাড়ের দিক অবশ্যই পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- খাদ্য অবশ্যই ট্রেতে দেয়া এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ প্যাডেল হুইলের মাধ্যমে পুকুরের তলা নিশেষ করে খাবার গ্রহণের জায়গা (feeding area) পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিমিত এবং সুষম খাদ্য ব্যবহার করতে হবে।
- সারের ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে।
- শুধুমাত্র পরিশোধিত পানি পুকুরে ব্যবহার করতে হবে।
- খামার পরিকল্পনাকালে বর্জ্য জমার জায়গা, পানি পরিশোধের জলাধার নির্মাণ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. খোলস নরম রোগ (Soft shell disease)

চিংড়ি খোলস নরম হওয়া একটি সাধারণ রোগ। খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাবে সাধারণত এ রোগ হয়। তবে অনেক দিন (chronic) ধরে চলতে থাকলে বুঝতে হবে যে, বিষাক্ত বস্তুর প্রভাবে যেমন কীটনাশক বা বিষাক্ত কোন শ্যাঁওলার প্রভাবে এমনটি হতে পারে।

লক্ষণ

- খোলস বদলানোর ২৪ ঘন্টা পরেও শক্ত হয় না,
- চিংড়ির বর্ধন হার কমে যায়,
- চিংড়ি দুর্বল থাকে এবং সহজেই অন্যান্য জলজ প্রাণীর শিকারে পরিণত হয় ও উৎপাদন কম হয়,
- দেহের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা হারায়।

প্রতিকার

- ক্যালসিয়াম সহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ–সম্পন্ন সুষম খাবার চিংড়ির আকারের ওপর এবং চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে দিতে হবে।

প্রতিরোধ

- সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হবে।
- পানির ভৌতরাসায়নিক গুণাবলী সর্বানুকূল রাখতে হবে।
- মজুদ হার কমিয়ে দিতে হবে।
- খাদ্য অবশ্যই ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে কোন প্রকার বিষক্রিয়ার জন্ম না হয়।

৭. চিংড়ির গায়ে শ্যাঁওলা সমস্যা (External fouling of shrimp)

এধরনের রোগ বা সমস্যা পুকুরের তলা এবং পানির অব্যবস্থাপনার কারণেই সাধারণত হয়ে থাকে। পুকুরে পানির গভীরতা কম রেখে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সার প্রয়োগ করলে এ অবস্থা হতে পারে।

লক্ষণ

- চিংড়ির গায়ে সবুজ রঙের শ্যাঁওয়া জন্মায়,
- চিংড়ি খোলস বদলাতে পারে না,
- চিংড়ির ফুলকার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়,
- খাদ্য গ্রহণে অসুবিধা হয় এবং বর্ধনহার কম হয়।

প্রতিকার

- কমার্শিয়াল ফরমালিন ২৫ পিপিএম হিসাবে পুকুরে প্রয়োগ করে এর প্রতিকার সম্ভব।

প্রতিরোধ

- পুকুরে পানির গভীরতা বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে তলা পর্যন্ত আলো না পৌঁছায়।
- সারের ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে যাতে অতিরিক্ত শ্যাঁওলা না জন্মায়।
- নিয়মিত পাথর চুন ব্যবহারে ভাল সুফল পাওয়া যায়।

সতর্কতা

চিংড়ির উল্লেখিত রোগবালাই ব্যতীত আরো অনেক প্রকার ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জনিত রোগ হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, কোন রোগের ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য আনতে পারলেও উৎপাদিত চিংড়ির বাজারজাতকরণে সমস্যা দেখা যায়। কারণ উন্নত দেশসমুহ যারা চিংড়ির মূল আমদানিকারক বা ক্রেতা তারা চিংড়ির দেহে অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি টের পেলে পুরো বাজার হারানোর সম্ভাবনাই বেশী। এছাড়াও অন্টিবায়োটিক বা বিভিন্ন কেমিক্যালস-এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে খাদ্য শিকল (food chain) পুরো/আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভাইরাস এমনই এক জীবাণু, চিংড়ি কেন- মানুষ, গরু সহ অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও এদের কোন প্রতিকার বিশ্বের কোথাও নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিষেধক যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এখনও পরীক্ষাধীন আছে। কাজেই উন্নয়নশীল দেশে চিংড়ির রোগবালাই দমনের চেয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। চিংড়ি চাষের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, রোগমুক্ত সুস্থ সকল পোনার ব্যবহার এবং পারিবেশিক পীড়ন (environmental stress) সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার মাধ্যমেই কেবল চিংড়ি রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
মোঃ হেলাল উদ্দিন, উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রাণিজ প্রোটিনের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে মাছ হতে। বাংলাদেশ তথা বিশ্বের প্রায় সকল দেশই আমিষের চাহিদা মেটানো হয় প্রধানত মাছ থেকে। প্রাণিজ আমিষের অন্যান্য উৎস যেমন মাংশের চেয়ে মাছের প্রোটিনে মানব দেহ গঠনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই বলে সারা বিশ্বে মাছের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে যদিও এ দেশের মাছে-ভাতে বাঙ্গালি আজ প্রায় নিরামিষ ভোজী হতে চলেছে-তথাপি দেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বার্থে ভোক্তা দেশের আমিষের স্বল্পতা দূর করতে গিয়ে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মৎস্য রপ্তানি। ১৯৭২-৭৩ সালে এ দেশ হতে মাত্র ২.৮৫ কোটি টাকার মাছ রপ্তানি হতো তা ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৩৫০ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে ১০ শতাংশ হলেও সারা বিশ্বের রপ্তানির প্রায় ২ শতাংশ মাত্র। বস্তুত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যদিও চাহিদার তুলনায় মাছের উৎপাদন অনেক কম তবু শুধু বৈদেশিক মুদ্রার অভাব পূরণের লক্ষ্যেই এ দেশ হতে মাছ রপ্তানি হচ্ছে।

বিদেশী ক্রেতাদের যেমন চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তেমনি বেড়েছে পণ্যের মান সম্পর্কে সচেতনতা। আর এ কারণে মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে মাননিয়ন্ত্রণ এবং নিশ্চিতকরণ আজ অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ হতে বর্তমানে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হচ্ছে তার সঠিক গুণাগুণ রক্ষা করে আরো অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যাতে অর্জন করা যায় সে প্রেক্ষিতে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও গ্রহণ করছে নতুন উদ্ভাবিত কলাকৌশলসমূহ। এর একটিই উদ্দেশ্য, ভোক্তাদের ঝুঁকিমুক্ত বা সংক্রমণমুক্ত, তাজা, প্রোটিন সমৃদ্ধ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সরবরাহ করা। মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করতে হলে মৎস্য আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা এবং প্রক্রিয়াকরণের সকল পর্যায়ে যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ

কোন পণ্যের মান তার উৎকর্ষের মাত্রা দিয়ে বোঝান হয়। আর এই উৎকর্ষকে যথাসম্ভব স্বল্পতম ব্যয়ে ভোক্তা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রক্ষার কলাকৌশলই হচ্ছে ঐ পণ্যের "মান নিয়ন্ত্রণ"। আরো একটু বিস্তৃতভাবে বলা যায়, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক ক্ষতি ও ভোক্তার অভিযোগ এড়ানো সম্ভব একই পণ্য রপ্তানি করে বর্তমানের চেয়ে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা। মৎস্য আহরণ ও বিপণনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি এমনকি চাষকৃত মাছের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষী মাছের মান রক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগের ওপর মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা অত্যাবশ্যক। মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি/বিভাগ অবশ্যই উৎপাদন বিভাগের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে এবং সে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ ব্যক্তির সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করবে। বাংলাদেশের মত দেশে ছোট ছোট মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অবশ্য উৎপাদনের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। কিন্তু মান নিয়ন্ত্রণ কোনক্রমেই অন্যের অধীনস্থ হবে না। মান নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ন্যূনপক্ষে অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানের সমান হতে হবে। মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এমন হবে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঐ পদ্ধতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা

করে অভিজ্ঞতা ও সর্বশেষ লব্ধজ্ঞানের আলোকে তা হাল নাগাদ করা সম্ভব হয়। মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

উৎপন্ন পণ্যের রূপরেখা সুনির্দিষ্টকরণ, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের পরিদর্শন, প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ ও মান নিশ্চিতকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পণ্যের রূপরেখা সুনির্দিষ্টকরণ

মান নিয়ন্ত্রণের ১ম ধাপে ভোক্তার চাহিদা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পণ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাবলি যেমন ওজন, আকার, বর্ণ ইত্যাদির মাত্রা নির্ধারণ করা। অধিকাংশ দেশেই ভোক্তার নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিটি পণ্যের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারিত থাকে। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে আবার ক্রেতাদেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে হয়। কোন নির্দিষ্ট মৎস্য ও মৎসপণ্যের প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণত (১) পণ্যের নাম, (২) ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ/প্রজাতি, (৩) প্রক্রিয়াকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, (৪) আকার, কাউন্ট, ধরন, (৫) নীট ওজন (৬) মোড়কের বিবরণ, (৭) লেবেলিং, (৮) ব্যবহারে নির্দেশাবলি, (৯) ব্যবহারের সময়সীমা ইত্যাদি বিষয় কঠোরভাবে মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকে।

কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন ঃ নিম্নমানের কাঁচামাল থেকে কোনভাবেই উৎকৃষ্ট মানের পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই কাঁচামালের মান নিরূপণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অবশ্যই প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনে উল্লেখ থাকতে হবে এবং স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের চেয়ে নিম্নমানের কোন কাঁচামালই প্রক্রিয়াকরণের জন্য গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে ফাইনাল প্রোডাক্ট বিশ্লেষণপূর্বক নিশ্চিত হতে হবে যে, তা নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী উৎকৃষ্ট মানের মৎস্য/মৎস্যপণের উৎপাদন, পুরোপুরি কাঁচামালের উৎকর্ষ ও যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। তাই আহরণ পরবর্তী সকল পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মেনে চলে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ঃ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণে উৎপাদিত পণ্য পরীক্ষার চেয়ে প্রক্রিয়াকরণে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত এবং স্বীকৃত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রধান লক্ষ্য হবে যেন উৎপাদিত পণ্যের মান সঠিক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হয়। এজন্য প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপ বিশ্লেষণপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ সনাক্ত করে ঐ সমস্ত স্থানে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ কারণে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন মৎস্য উৎপাদনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি প্রবর্তন অত্যন্ত যুগোপযোগী। সম্প্রতিক কালে খাদ্য তথা মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণে এ কর্মসূচির প্রবর্তন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে (যুক্তরাষ্ট্রে হ্যাসাপ; ক্যানাডায় কিউএমপি; ইউরোপীয় ইউনিয়নে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের দেশ প্রতি বছর মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বিশেষ করে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তাই ক্রেতা দেশের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালায় "কোয়াপ" নামে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা ও প্রতিটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় এর প্রবর্তন বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

"কোয়াপ" এমন একটি কর্মসূচি যাতে প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপে নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্থানসমূহ সনাক্তপূর্বক সেসব স্থানে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ ও পরিহারের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। "কোয়াপ" কর্মসূচি প্রচলনের পরিকল্পনা গ্রহণের সময় প্রক্রিয়াকরণ কারখানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনে একটি সংক্ষিপ্ত "প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম" তৈরি করতে হবে যাতে প্রক্রিয়াকরণের নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্থানসমূহ মনোযোগ সহকারে মূল্যায়ন করা যায়।

মান নিয়ন্ত্রণে করনীয়

কারখানা পর্যায়ে আমাদের দেশ থেকে গত তিন যুগ ধরে মাছ বিশেষ করে চিংড়ি হিমায়িত করে বিদেশে রপ্তানি করা হলেও অদ্যাবধি প্রক্রিয়াকারকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের ব্যাপারে খুব বশি সচেতন নন এবং উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও তাদের ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত অধিকাংশ কর্মকর্তা

ও কর্মচারীর মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে যথাযথ কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ প্রক্রিয়াকারক মনে করেন তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারি মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কোন প্রক্রিয়াকারকের উৎপাদিত পণ্যের মান অপর কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। দেশের অন্য যে কোন সেক্টরের শিল্প কারখানার দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রতিটি কারখানায়ই তাদের পণ্য নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হচ্ছে কি না তা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হিময়িত খাদ্যের মত ১০০% রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কারখানাসমূহের কোন নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালু নেই।

কাঁচামালের গুণগত মানের ওপর যেহেতু উৎপাদিত পণ্যের মান পুরোপুরি নির্ভরশীল, সেক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে প্রক্রিয়াকারকদের অবশ্যই দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। মাছ/চিংড়ি আহরণের পর অনেক হাত ঘুরে বহু পথ পাড়ি দিয়ে যখন কারখানায় পৌঁছে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তার মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। কারণ মাছ/চিংড়ি একটি অতি দ্রুত পচনশীল খাদ্য বিধায় আমাদের দেশের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৮ থেকে ১০ ঘন্টার মধ্যে তা খাদ্যের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকারক উৎপাদন/আহরণ এলাকা থেকে সরাসরি নিজস্ব ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। মৎস্য/চিংড়ি চাষ, আহরণ, পরিবহণ, আহরণোত্তর যত্ন, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ এবং জাহাজীকরণের সকল পর্যায়ে মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম "কোয়াপের" মাধ্যমে প্রতিটি প্রক্রিয়াকারককে অবশ্যই চালু করতে হবে অন্যথায় আমদানিকারক দেশ যে কোন মুহূর্তে আমাদের দেশ থেকে মৎস্য/মৎস্যপণ্য আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে।

সরকারি পর্যায়ে সরকারি মান নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সীমিত জনবল ও সুযোগসুবিধা নিয়ে সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে শুধুমাত্র রপ্তানিযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছে। সময়ের প্রয়োজনে এ কার্যক্রমকে দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বাণিজ্যিক বিপণনে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বৃহদাকারের একটি প্রকল্প বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবে রূপ পেলে সরকারি মান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম তার সঠিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

"কোয়াপ" কর্মসূচিতে প্রতিটি কারখানা কর্তৃপক্ষ তার কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য/চিংড়ি চাষ/আহরণ থেকে শুরু করে আহরণোত্তর যত্ন, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ, জাহাজীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু এবং তার রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণ করবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ "কোয়াপ" সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কারখানায় চালু কার্যক্রম মনিটরিং, সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র পরীক্ষা এবং মাঝেমধ্যে কারখানা থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করবে।

মৎস্য খাতে চিংড়িই যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস, সে কারণে আহরণোত্তর যত্ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার চিংড়ি চাষ এলাকায় (সাতক্ষীরা, খুলনা বাগেরহাট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) প্রথম পর্যায়ে ২০টি মডেল সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং শীঘ্রই এগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। প্রতিটি সার্ভিস সেন্টারে চিংড়ি চাষ, আহরণ, অবতরণ, হ্যান্ডলিং, পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দানের ব্যবস্থা থাকবে। চিংড়ি চাষী/খামার মলিকগণ যাতে তাদের আহরিত চিংড়ি দ্রুত সরাসরি বিপণণের জন্য সার্ভিস সেন্টারে আনেন, সে বিষয়ে তাদেরকে উৎসহিত করা হবে। সার্ভিস সেন্টারগুলোতে মৎস্য/চিংড়ি আহরণোত্তর যত্নের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগসুবিধা, যেমন পানোপযোগী পানি এবং অনুরূপ পানি থেকে প্রস্তুত বরফ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। মডেল সার্ভিস সেন্টারগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য সফল বিবেচিত হলে পরবর্তীতে আরো অনুরূপ সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে আইনগত সমর্থন দেয়ার প্রয়োজনে সরকার মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ-৮৩ এবং পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশকে কার্যকরভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-৮৯ জারি ও কার্যকর করেছে। সম্প্রতি উক্ত বিধিমালাকে আমদানিকারক দেশসমূহের চাহিদা এবং মৎস্যপণ্যের মান সম্পর্কিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে

ব্যাপক পবির্তন ও পরিবর্ধনপূর্বক নতুন নতুন ধারা সংযোজনের মাধ্যমে নবরূপ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। উক্ত বিধিমালা কার্যকর হলে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

মান নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

আমাদের দেশে উৎপাদিত হিমায়িত খাদ্যের (চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ) রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে ও বাজার ধরে রাখার প্রয়োজনে মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অত্যাবশ্যক। কারণ কোন দেশই রপ্তানিকারক দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্যজনিত সনদ ব্যতীত অন্য দেশ থেকে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করে না। আমাদের দেশে গত ক'বছরে চিংড়ির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। অনেকেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত ভূমি চিংড়ি চাষের আওতায় এনে সঠিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা গেলে দু হাজার সাল নাগাদ শুধুমাত্র চিংড়ি রপ্তানি থেকেই বাংলাদেশ প্রতি বছর পাঁচ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমকে জোরদার এবং কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব। এজন্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিবহণ, বাজারজাতকরণ এবং মৎস্য ব্যবসায়ে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সৎ, আন্তরিক ও সচেতনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে হিমায়িত খাদ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের সুপারিশ করা হল ঃ

★ প্রতিটি মৎস্য হিমায়িতকরণ কারখানায় নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা "কোয়াপ" চালু করতে হবে।

★ সরকারি মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে মৎস্য আহরণ, অবতরণ ও বিপণনের সকল পর্যায়ে বিস্তৃত করতে হবে।

★ ধরার পর কোন অবস্থাতেই যেন বরফবিহীন অবস্থায় মাছ না রাখা হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

★ সরকারি পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণের বর্তমান কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা ও জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

★ দূরবর্তী মৎস্য আহরণ ও বিপণন কেন্দ্রসমূহে উত্তম মানের পর্যাপ্ত বরফপ্রাপ্তি ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

★ প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা মেনে চলার জন্য কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকতে হবে।

★ চিংড়ির ক্ষেত্রে মাথা ও খোসা ছাড়ানোর কাজ প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সর্বোপরি এ কাজে নিয়োজিত জেলে, মৎস্যজীবী, আড়তদার, পাইকারি বিক্রেতা, পরিবহণকারী, প্রক্রিয়া-করণকারী, রপ্তানিকারক প্রত্যেককে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধি ও অধ্যাদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর এ সকল কাজের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হলেই বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে হ্যাসাপভিত্তিক মাননিয়ন্ত্রণ প্রথা মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃতি ঘটানো সম্ভব যার ফলে ২০১০ সালের মধ্যে এ খাত হতে ৫,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

মাছের মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ভূমিকা

মুহাম্মদ মুজাফ্ফর হুসেইন, চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

হিমালয় পর্বতমালার সন্নিকটে ও বিশ্বের বৃহত্তম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে রয়েছে বিশাল জলসম্পদ। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুর-দীঘিতে ভরা বিস্তীর্ণ জলাশয় ও জলাধার রয়েছে এদেশে। তাছাড়াও রয়েছে ৪৮০ কি. মি. উপকূলীয় এলাকা ও বঙ্গোপসাগরের ৪৮,৩৬৫ বর্গ মাইল (নটিকেল) জলাশয়ে রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ।

অর্ধ শতাব্দি আগেও বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে বেশ সম্পদশালী ছিল। কালের প্রবাহে জনসংখ্যার বিস্ফোরণসহ মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে মৎস্য আহরণের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ৮৫ হাজার টন থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ২.৬০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে যার বৃদ্ধির হার প্রায় ৩০০%। সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পের এত দ্রুত বিকাশ নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় অগ্রগতি। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ষাটের দশকে। ১৯৬৪ সনে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সৃষ্টি হবার পর পরই মৎস্য শিল্পের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ১৯৬৪-৬৮ সনে ৬-১২ অশ্বশক্তি সম্পন্ন আউটবোর্ড কেরোসিন ইঞ্জিন দ্বারা সুইডিশ ফ্রিডম ফর হাঙ্গার কেম্পেইন প্রকল্পের অধীনে ২৮৫টি দেশী নৌকা যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ শুরু হয়। পরবর্তীতে ইনবোর্ড ইঞ্জিনযুক্ত যান্ত্রিক নৌকার প্রচলন শুরু হয়। ১৯৬৬-৭২ সময়ে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রাক পুঁজি বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে 'সাগর সন্ধানী' ও 'মীন সন্ধানী' গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণা চালানো হলে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার জন্য রাশিয়ান সরকারের অনুদানে ১০টি আধুনিক ট্রলার দ্বারা বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মৎস্য শিকারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রথম প্রয়োগ ও জনশক্তি প্রশিক্ষণের কাজ হাতে নেয়। এরই ফলশ্রুতিতে দেশে বর্তমানে প্রায় ৭০টি ট্রলার রয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টি চিংড়ি ট্রলার এবং ১৫টি সাদা মাছ ধরার ট্রলারসহ কম বেশি মোট ৬০টি ট্রলার চালু আছে। ১৯৭৫-৮০ সময়ে ডেনিশ সরকারের অনুদানে কর্পোরেশন প্রায় সাত শতাধিক ৩৮ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২২/২৪ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন চালিত যান্ত্রিক নৌকা তৈরী করে জাল ও সরঞ্জামসহ জেলেদের মধ্যে বিতরণ করে। ইতোমধ্যে প্রায় দুই হাজার দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণ করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৬০০০ যান্ত্রিক নৌকা বঙ্গোপসাগর থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ করছে। মৎস্য আহরণে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলনের সাথে সাথে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। দেশ স্বাধীন হবার সময়ে যেখানে মাত্র ৯টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ছিল বর্তমানে সেখানে প্রায় ১০০টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার সংখ্যা কাঁচামাল (চিংড়ি) সরবরাহের সাথে এতই অসঙ্গতিপূর্ণ যে, এদের অনেকগুলোই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। কারখানাগুলো গড়ে মাত্র ১৫% ক্ষমতায় চালু আছে। মৎস্য অবতরণ বৃদ্ধির সাথে বরফ কল ও বরফ উৎপাদনের পরিমাণও বহুগুণ বেড়ে গেছে। জেলেরা এখন তাদের ধৃত মাছে যথাযথভাবে বরফ ব্যবহার করতেও শিখেছে যদিও এটি এখনও পর্যাপ্ত নয়।

চিংড়ি চাষ এ দেশে প্রায় নতুন। মাত্র এক দশক আগে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ২৪০ কেজি। যদি উৎপাদনের পরিমাণ দশগুণ বৃদ্ধি করা যায় তবে এ খাতে বর্তমানের আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকার পরিবর্তে দশ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা

সম্ভব হবে। মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে এবং বেসরকারি খাতে অত্যন্ত তৎপর হওয়ায় এ খাতে দারুণ অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

এতকিছু সত্বেও একটি দিক এখনও সম্পুর্ণ অবহেলিত রয়ে গেছে। মাছের গুণগতমান ঠিক রাখতে না পারার ফলে দরিদ্র জেলে সম্প্রদায় মাছের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মৎস্য আহরণ পরবর্তীতে অনেক মাছ নষ্ট হওয়ায় জেলেরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। রপ্তানী বাণিজ্যে লোকসানের অন্যতম কারণ হলো সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে যথেষ্ট দুর্বলতা বা যথেষ্ট সংখ্যক আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য বন্দর বা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র গড়ে না উঠা। আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা না থাকায় বেসরকারি খাত এতে পুঁজি বিনিয়োগে মোটেই আগ্রহী নয়। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনই একমাত্র সংস্থা যে, আধুনিক মৎস্য বন্দর ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে কাজ করে আসছে।

১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত কর্পোরেশন কক্সবাজার, খুলনা, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, রাজশাহীতে পাঁচটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭১-৭২ সনে প্রায় ৫.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলি নদীর অপর পাড়ে প্রায় ১২২ একর জমির ওপর জাপান সরকারের অনুদানে এক আধুনিক মৎস্য বন্দর গড়ে তোলা হয়েছে। কর্পোরেশন বরিশাল, পাথরঘাটা ও খেপুপাড়াতেও একটি করে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। স্বার্থপর একশ্রেণীর মাৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের প্রভাবে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপসমূহে এবং উপকূল রেখা বরাবর মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর আহরিত মাছের প্রায় ৩০% বা ৭৫,০০০ টন মাছ গুণগতমানে নষ্ট হয় এবং এর মধ্যে আনুমানিক ২৫,০০০ টন মাছ পঁচে যাওয়ার ফলে জেলে সম্প্রদায় ও দেশ ৫০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়। নিম্ন মানের মাছকে শুটকি তৈরী করে জেলেরা অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করে। শুধুমাত্র সামুদ্রিক মাছের পচন ও গুণগতমান খারাপ হওয়ার কারণেই আমরা প্রতি বছর আনুমানিক ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হারিয়ে থাকি। গুণগতমান নষ্ট হবার ফলে চিংড়ি রপ্তানি খাতে দেশ কেজি প্রতি প্রায় ২ ডলার কম পেয়ে থাকে। এ অবস্থা নিরসনে উপকূলীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, বরফ কল, হিমাগারসহ বিতরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদি সৃষ্টি ও তার সম্প্রসারণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই গুরুত্বের দাবী রাখে।

জাপানী অনুদানে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম শহরের মনোহরখালী ব্রীজঘাট এলাকায় আধুনিক মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধাদি সমন্বিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোশেনের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা। এখানে বছরে ৫০,০০০ টন মাছ অবতরণ করানো সম্ভব হবে। অবতরণকৃত মাছের গুনগতমান নিশ্চিত করে অভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্য উন্নীতকরনের পাশাপাশি জেলে ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকলকেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রাপ্ত সুবিধাদির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

[মৎস্য পক্ষ '৯৫ সংকলন হতে পুনমুদ্রিত]

মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ গতিধারা

লোকমান আহমেদ, যুগ্ম প্রধান
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সাব-সেক্টর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় আয়, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পুষ্টি সরবরাহে এ খাতের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় ও রপ্তানি আয়ে এ খাতের অবদান যথাক্রমে ৪.৭% ও ৯.১২%, পুষ্টি সরবরাহের পরিমাণ ৮০ ভাগ। মোট কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যার প্রায় ২৫% সেক্টরটিতে সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এ সেক্টরে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের প্রভূতি সুযোগ বর্তমান। এ কার্যক্রম আমাদের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য যে, মৎস্য খাতের কর্মকান্ডের প্রায় ৯৮% বেসরকারি খাতের অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট বেসরকারি খাতকে সাহায্য সহযোগিতা দান করা ছাড়াও দেশের সার্বিক মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রমে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মৎস্য উৎপাদনের সমস্যাবলী

মৎস্যচাষের ক্ষেত্রসমূহ যেমন-পুকুর, বাঁওড় এবং চিংড়ি খামারগুলোতে ক্রমাগত হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে মৎস্য উৎপাদন এর পরিমাণ ১৯৮৪-৮৫ সাল হতে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত হ্রাস পায়। মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আইন প্রয়োগ জোরদার ও পোনা অবমুক্তকরণসহ অন্যান্য কিছু কার্যক্রম নেয়ার ফলে ১৯৯০-৯১ সাল থেকে উৎপাদন আবার বাড়তে থাকে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কতিপয় কারণেই মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ।

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের পথে কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) কোন্ ধরনের জাল বা সরঞ্জাম দ্বারা কোন্ কোন্ প্রজাতির মাছ কী পরিমাণে আহরিত হচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় এবং পানির গুণাগুণ নির্ণয়, মৎস্য মজুদ, মৎস্য বিচরণের প্রকৃতি সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মাছ আহরণ কৌশল নির্ণয় করা কঠিন।

(খ) এতদাঞ্চলের মিশ্র প্রজাতির মাছের মজুদ নির্ণয় এবং সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মাছ আহরণের একটি উপযুক্ত মডেলের অভাব।

(গ) সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য মজুদ এবং বার্ষিক কি পরিমান লার্ভা ও কিশোর চিংড়ির আগমন ঘটে তার তথ্যাদি নাই বললেই চলে।

(ঘ) দেশের বিভিন্ন সেক্টরের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সৃষ্ট সমস্যাদি যেমন- সেচ কাজের জন্য অত্যধিক পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, কলকারখানা এবং কৃষিজাত পণ্য হতে পতিত বর্জ্য পদার্থের দ্বারা জলাশয় দূষণ, অতি আহরণ এবং ক্ষতিকরভাবে মৎস্য আহরণের ফলে মাছ ও মাছের খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত জীবকূলের মৃত্যু, প্রাকৃতিকভাবে মাছের মজুদে বাধা সৃষ্টি, প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট এবং মাছের যথেচ্ছ বিচরণে বাধাপ্রাপ্তি প্রভৃতি পরিবেশগত সমস্যা।

(ঙ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সীমিত জনবল ও আইন প্রয়োগের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রচলিত মৎস্য আইন সমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আবহমানকাল থেকে জলসম্পদের ওপর জনগণের সহজাত শিকার প্রবৃত্তি, ত্রুটিপূর্ণ ইজারা ব্যবস্থা, একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলাশয়

নিয়ন্ত্রণ, আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণে বাস্তব প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

(চ) কলকারখানার ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ শুধুমাত্র মাছেরই মৃত্যু ঘটায় না যাবতীয় জলজ প্রাণীর আশ্রয়স্থলও ধ্বংস করে থাকে। পৌর এলাকার বর্জ্য পদার্থ পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস, বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করে।

(ছ) উপকূলীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্য, জেলেদের নিম্নমানের সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জেলেদের বিকল্প আয়ের উৎসের অভাব এবং পরিবেশ সম্পর্কে কম সচেতনতার ফলে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের ওপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

(জ) স্বাদুপানিতে ও উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকতে সক্ষম, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তির অনুপস্থিতি।

(ঝ) মৎস্য বিভাগসহ মৎস্য সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার না হবার ফলে প্রযুক্তি হস্তান্তর বিঘ্নিত হচ্ছে।

(ঞ) উচ্চ সুদের হার, নিরাপত্তা ও বহু মালিকানার অসুবিধার কারণে মৎস্যজীবি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্যচাষ উদ্যোক্তাগনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির অপ্রতুলতা।

(ট) প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা প্রাপ্তির নির্ভরতা, বাণিজ্যিক মৎস্যখাদ্যের অপ্রাপ্যতা, উচ্চ মাত্রায় লবণাক্ততা, উচ্চবিনিয়োগ মূল্য, ভূমি ব্যবহারে বিরোধ, নিরাপত্তার অভাব, অবকাঠামোগত সুবিধাদির অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি দেশে চিংড়ি চাষ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।

মৎস্য বিভাগের সামুদ্রিক শাখার সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উদঘাটিত হয় যে, বেহন্দি জাল, সমুদ্র সৈকতে ব্যবহৃত বেড় জাল ও চিংড়ি পোনা ধরার ঠেলা জাল সামুদ্রিক মৎস্য মজুদের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।

অবলম্বিত উন্নয়ন কৌশল

মুক্ত জলাশয়ঃ বাংলাদেশে ৪ মিলিয়ন হেক্টরেরও বেশি অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় রয়েছে যা মৎস্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) মৎস্য আইন বাস্তবায়ন এবং মৎস্যজীবিদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ।

(খ) বিল ও প্লাবনভূমিতে দ্রুত বর্ধনশীল বিপুল সংখ্যক রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

মৎস্য বিভাগ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ১৯৮৮ সনে প্রথম মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদের কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর আইডিএ এবং এডিবি এর আর্থিক সহায়তায় উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে আইডিএ এর সহায়তায় তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের অধীনে মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ অব্যাহত আছে। অন্যদিকে, এডিবি এর সাহায্যপুষ্ট ২য় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বিল নার্সারী হতে মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পোনা মজুদ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মোটামুটি উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে।

(গ) নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি (New Fisheries Management Policy)।

(ঘ) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সমন্বিত মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।

বদ্ধ জলাশয় ঃ দেশে ১,৪৭,০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ১.৩ মিলিয়নের অধিক পুকুর, ৫,৪০০ হেক্টর আয়তনের বাঁওড় এবং ১,৪০,০০০ হেক্টর আয়তনের ও অধিক এলাকায় চিংড়ি খামার রয়েছে। মৎস্য বিভাগ তার অধীনস্থ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক বেসরকারি পুকুরে প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ এবং মিশ্র পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রযুক্তি হস্তান্তর করছে। যদি দেশের ১.৩ মিলিয়ন পুকুর মৎস্য বিভাগ অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে আগামী ৫ বৎসরে পুকুরের মৎস্য উৎপাদন বর্তমানের ১,৯৫,০০০ মেঃ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে কমপক্ষে ৬,০০,০০০ মে. টনে উন্নত করা সম্ভব হবে।

আধা-লোনাপানিতে চিংড়ি চাষ ঃ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে সনাতন পদ্ধতি বা উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি গড়ে ১৬০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বাগেরহাট এবং পিরোজপুরে ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, চিংড়ি পোনার খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে চাষীদের উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে এ সাব-সেক্টরের উন্নয়নের

কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। বেশকিছু উদ্যোক্তার মাধ্যমে কিছু পরিমাণ সীমাবদ্ধ এলাকায় (৫০০ হেক্টর) বর্তমানে আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৩-৫ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চিংড়ি পোনা ও চিংড়ি খাদ্যের অপ্রাপ্যতা, রোগ দমন এবং উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাবে আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ বর্তমানে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। মৎস্য বিভাগ বর্তমানে আধানিবিড় চাষের উপযোগী এলাকাসহ চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হচ্ছেন। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে সরকার রাস্তাসহ উপযুক্ত ভূমি, বিদ্যুৎ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করবেন। এ লক্ষ্যে হ্যাচারি স্থাপন, খাদ্য প্রস্তুত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য সরকার কর্তৃক বেসরকারি সেক্টর এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীসহ যৌথ উদ্যোগের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ঃ আর্টিসেনাল ফিশারী সামুদ্রিক মাছের শতকরা ৯৫ ভাগ যোগান দিচ্ছে। আর্টিসেনাল ফিশারী কর্তৃক অতি আহরণের ফলে পোস্ট লার্ভা ও কিশোর চিংড়িসহ অন্যান্য মাছের মজুদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বেহুন্দি জাল, উপকূলীয় বেড় জাল, চিংড়ি পোনা ধরার ঠেলা জালসহ দেশীয় সাধারণ ও যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মৎস্য মজুদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ডিমারসেল ট্রল ফিশারী এবং চিংড়ির ট্রলার ফিশারী সমুদ্রে অধিক হারে মাছ ও চিংড়ি আহরণ করছে। ফলে সমুদ্রের ১০০০ মিটার গভীরতার বাইরে মৎস্য আহরণ হচ্ছে না।

এ অবস্থায় আর্টিসেনাল মৎস্য আহরণ সীমিত করার লক্ষ্যে যান্ত্রিক নৌকা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরকার আর্টিসেনাল ফিশারীতে মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিমধ্যেই নৌকা পিছু লাইসেন্স প্রথা চালুর বিধি জারী করেছেন। যদি উক্ত বিধি বাস্তবায়িত হয় তাহলে অতি আহরণ করার প্রবণতা কমবে বলে আশা করা যায়।

পেলাজিক উৎস থেকে মাছ আহরণের সীমিত অথবা আদৌ মৎস্য আহরণ করা হয় না। এ সম্পদ আহরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদির অভাব আছে। সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় উদ্যোক্তা অথবা যৌথ উদ্যোগে পেলাজিক উৎস থেকে মৎস্য আহরণের প্রচেষ্টা চলছে।

ভবিষ্যৎ কার্যক্রম

মুক্ত জলাশয়

(ক) মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ বাড়ানোর জন্য সারাদেশে উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থানে সরকারি জলাশয়সমূহকে অভয়াশ্রম হিসেবে সরকারিভাবে ঘোষণা দিতে হবে।

(খ) মুক্ত জলাশয়ে পোনার মজুদ বাড়ানোর জন্য বর্তমানে চালু পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম সুফলভোগীদের উদ্যোগে এবং সুফলভোগীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন মানের প্যাকেজ প্রোগ্রাম তৈরি করে তাদের মাধ্যমে প্রোগ্রামসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঘ শস্যক্ষেতে রোগবালাই দমনের জন্য কীটনাশক, বিষাক্ত ঔষধ আমদানি ও ব্যবহার ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(ঙ) মৎস্য সংরক্ষণ, আহরণ আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন করতে হবে।

(চ) পরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অবকাঠামো স্থাপন করতে হবে।

বদ্ধ জলাশয়

(ক) অভয়াশ্রমসমূহ চিহ্নিত করা এবং এগুলো ইজারা আওতার বর্হিভূত করে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে।

(খ) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন মানের প্যাকেজ প্রোগ্রাম তৈরি করা। প্যাকেজ প্রোগ্রামগুলো জনগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(গ) উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করা।

(ঘ) উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ।

(ঙ) উদ্যোক্তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(চ) উদ্যোক্তা যদি ভূমিহীন দরিদ্র হয় তবে উদ্যোক্তার জন্য সরকারিভাবে খাস জমির ব্যবস্থা করা এবং সহজ শর্তে, স্বল্প জামানতে, ঋণের ব্যবস্থা করা।

চিংড়ি শিল্পখাত ঃ উৎপাদনের দিক থেকে ইলিশের পরই চিংড়ির স্থান। কাজেই চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

উপকূলীয় এলাকায় হোয়াইট স্পট রোগের কারণে লোনাপানির চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে সে রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইলিশ মাছ ঃ উৎপাদনের দিক থেকে ইলিশ মাছের অবস্থান সবার ওপরে। সম্প্রতি এ মাছ রপ্তানিও হচ্ছে। জাটকা নিধন বন্ধ, প্রজননক্ষেত্র এবং নার্সারীক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

উন্নত জাতের মৎস্য পোনা প্রাপ্তি ঃ মৎস্য উৎপাদনে মানসম্মত পোনা প্রাপ্তি একটি প্রধান অন্তরায়। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই দেশের হ্যাচারি মালিক, খামার মালিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মাছ বিশেষ করে চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণের সহযোগিতামূলক কিছু প্রকল্প যেমন চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র, সার্ভিস সেন্টার, হ্যাসাপ (HACCP) ভিত্তিক মৎস্য পান নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা ঃ দ্রুত উন্নয়ন কর্মকান্ডে গবেষণার সহায়তা অপরিহার্য। মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা সহায়তার জন্য ১৯৮৪ সালে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত ১১টি মৎস্যচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

(১) নাইলোটিকার চাষ, (২) রাজপুঁটির চাষ, (৩) লাল তেলাপিয়ার চাষ, (৪) সমন্বিত মাছ-মুরগির চাষ, (৫) মাছের মিশ্রচাষ, (৬) কার্প জাতীয় মাছের আঁতুড় পুকর ব্যবস্থাপনা, (৭) ধান ক্ষেতে মাছ চাষ, (৮) পেনে মাছ চাষ, (৯) পাঙ্গাস মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ, (১০) ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা (১১) পাবদা ও গুলশা মাছের কৃত্রিম প্রজনন।

উল্লেখিত বেশিরভাগ গবেষণা প্রযুক্তি বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষের সাথে সম্পৃক্ত। মুক্ত জলাশয় আজও জাতীয় উপাদানের প্রায় ৭৩% ভাগের যোগান দিচ্ছে। মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

জুলাই, ১৯৯৬ থেকে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প আরম্ভ হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভূত এবং ভবিষৎ সমস্যায় সমাধান পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

মৎস্য খাদ্য ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে খাদ্য একটি প্রধান বাধা। খাদ্য উৎপাদনে দেশজ পণ্য ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাছ ও পশুর খাদ্য হিসেবে বাণিজ্যিক ভাবে কুটিপানা (duckweed) ব্যবহারে উজ্জ্বল সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। "ডাকউইড রিসার্স প্রকল্প" এর মাধ্যমে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মকান্ড শুরু করা হয়েছে।

বিনিয়োগ

সারণি-১ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে মৎস্য সেক্টরে সরকারি খাতে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে গত ১১ বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে অধিক (১০২৬৫.০০ লক্ষ টাকা) বিনিয়োগ করা হয়।

জনবল ও প্রশিক্ষণসহ সহায়ক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি

গত ৬বৎসরে মৎস্য অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার জন্য ৬টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪টি জেলা অফিস, ১৯টি হ্যাচারি (দ্বিতীয় মৎস্য ৩টি, সমন্বিত প্রকল্প ১৬টি) নির্মাণ, ১৫৭৪টি যানবাহন সংগ্রহ, প্রায় ১০৮৮ জন জনবল নিয়োগ, ৭৯৯ জন সরকারি লোককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, ৬১৯৪ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ৩৭ জন বেসরকারি লোককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৪৭৩৯ জনকে স্থানীয় প্রশিকক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরে ৩৮১৭ জন জনবল রাজস্ব বাজেটে আছে এবং ১০৮৮ জন জনবল প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োজিত করা হয়েছে। এই সকল জনবল, যানবাহন ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা সমূহ কার্যকরী ভাবে কাজে লাগানোর পরই কেবর মাত্র নতুন সুবিধা সমূহ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন বনাম কার্যক্রম বাস্তবায়ন

এখন আমাদের প্রজেক্ট এ্যাপ্রোচের পরিবর্তে প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ অবলম্বনের সময় হয়েছে। এতে ঘন ঘন পিসিপি/পিপি অনুমোদন, নতুন লোক নিয়োগ, নতুন অফিস স্থাপন ইত্যাদি জটিলতা অনেকটা এড়ানো যাবে। তবে খুব বিচার বিশ্লেষণ করে আর্থিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, পুষ্টি যোগান, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি মানদন্ড সতর্কতার সঙ্গে সঠিকভাবে যাচাই করে প্রোগ্রাম নিতে হবে।

সারণি-১। ১৯৮৫-৮৬ সাল হতে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত মৎস্য খাতে মোট বিনিয়োগ।

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	প্রকল্প সংখ্যা	মৎস্য সাব-সেক্টর বরাদ্দ (প্রকৃত ব্যয়)		
		মোট	মোট	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫
১৯৮৫-৮৬	১৪	২৭২৫.৭১ (১৫৩৭.১০)	৯৭৩.১৬ (৫৫৮.৩৩)	১৭৫২.৫৫ (৯৭৮.৭৭)
১৯৮৬-৮৭	১১	৩৬২৪.৫৭ (১৯৯৮.৩৪)	১২০৩.০০ (৬৭৩.২৪)	২৪২১.৫৭ (১৩২৫.১০)
১৯৮৭-৮৮	১৭	৫০২২.৮৭ (২৪৮০.৩০)	১৮৬৬.৭৪ (৬৭০.৫১)	৩১৫৬.১৩ (১৮০৯.৮৮)
১৯৮৮-৮৯	১৮	৪৬৬২.২৫ (২৩৭১.২০)	১৬৪০.০০ (৯৮৫.৬১)	৩০২২.২৫ (১৩৮৫.৫৯)
১৯৮৯-৯০	১৮	৮২২৭.৭৬ (৩১৩১.০৬)	১২৭৬.৯১ (১০৯৩.২০)	৬৯৫৪০.৮৫ (২০৩৭.৮৬)
১৯৯০-৯১	১৮	৭৯৬৯.০০ (৩৯০২.৩০)	২৭০০.০০ (১৭৬৯.৪৭)	৫২৬৯.০০ (২১৩২.৮৩)
১৯৯১-৯২	২২	১১০৭.০০ (৬৩৪৮.৪১)	২৭২৪.০০ (১৫০৪.১৬)	৮২৮৩.০০ (৪৮৪৪.২৫)
১৯৯২-৯৩	২০	১০২৭০.০০ (৭৯৯৭.৩১)	২১৭৬.০০ (১৪২৩.৪৮)	৮০৯৪.০০ (৬৫৭৩.৮৯)
১৯৯৩-৯৪	২৩	১১৩১৯.০০ (১০২৬৫.০)	২৭৫৫.০০ (১৪২৩.৪৮)	৮৫৬৪.০০ (৮৫৪৮.৭৫)
১৯৯৪-৯৫	২৩	৯২০০.০০ (৭৬৪৬.৪৪)	২৬২০.০০ (১৯১৩.১২)	৬৫৮০.০০ (৫৭৩৩.৩২)
১৯৯৫-৯৬	২৮	৯৬৯২.০০ (৭৬০৩.২৭)	২৬২২.০০ (১৭৭৫.২৫)	৭০৭০.০০ (৫৮২৮.০২)
১৯৯৬-৯৭	২৬	৯৬৬৮.০০ (-)	৪৭৬৮.০০ (-)	৪৯০০.০০ (-)
সর্বমোট		৯৩৩৮৮.১৬ (৫৫২৮০.৯২)	২৭৩২৪.৮১ (১৪০৮২.৬৬)	৬৬০৬৩.১৫ (৪১১৯৮.২৬)

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ পরিসংখ্যান

মোঃ ইনামুল হক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিট্যুট, ময়মনসিংহ

মৎস্য খাতের অবদান

		জিডিপিতে – ৪.৭%
পুষ্টি	ঃ	আমিষ চাহিদা পূরণে– ৬.০%
		প্রাণিজ আমিষ চাহিদা পূরণে– ৮০.০%
		প্রতিজনে গড় মাছ ভক্ষণের পরিমাণ – ২০.৫ গ্রাম/দিন
		(সুপারিশকৃত প্রতিজনে মাছ ভক্ষণের পরিমাণ– ৩৮.০ গ্রাম/দিন)
কর্মসংস্থান	ঃ	মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে – ৭%
		প্রত্যক্ষভাবে জড়িত– ১.৪ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী
		পরোক্ষভাবে জড়িত– ১১.০ ,, ,,
রপ্তানি আয়	ঃ	১৯৯৫–৯৬ অর্থবছরে– ৯.১২% (জাতীয় আয়ের)
		(চিংড়ি হতে রপ্তানি আয় ৭.৫ %)

জলসম্পদ

সারণি- ১। অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলসম্পদ।

উৎস	জলায়তন (হেক্টর)	মোট জলায়তনের শতকরা হার %
ক. অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ		
১. **মুক্ত জলাশয়**		
নদী, খাল, খাড়ি ও		
মোহনা অঞ্চল	১০,৩১,৫৬৩	২৩.৭৩
হাওড় ও বিল	১,১৪,১৬১	২.৬২
কাপ্তাই হ্রদ	৬৮,৮০০	১.৫৮
প্লাবণভূমি (নিমজ্জিত		
শস্য ভূমিসহ)	২৮,৩৪,০০৮	৬৫.২১
মোট (মুক্ত জলাশয়) ঃ	৪০,৪৮,৫৩২	৯৩.১৪

উৎস		জলায়তন (হেক্টর)	মোট জলায়তনের শতকরা হার %
২.	**বদ্ধ জলাশয়**		
	পুকুর (১২,৮৮,২২২টি)	১,৫১,৯১৬	৩.৫০
	বাওড়	৫,৪৮৮	০.১৪
	উপকূলীয় চিংড়ি খামার	১,৪০,০০০	৩.২২
	মোট (বদ্ধ জলাশয়) ঃ	২,৯৭,৪০৪	৬.৮৬
মোট (অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ) ঃ		৪৩,৪৫,৯৩৬	১০০.০০
খ.	**সামুদ্রিক জলসম্পদ** ট্রেলিং শিল্প ও আর্টিস্যানাল ফিশারীজ)	১,৬৬,০৭,০০০	–
	মোট (সামুদ্রিক জলসম্পদ) ঃ	১,৬৬,০৭,০০০	–
	সর্বমোট ঃ	২,০৯,৫২,৯৩৬	–

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যুরো অব ষ্ট্যাটিষ্টিক (BBS)

মৎস্য উৎপাদন

সারণি- ২। বাংলাদেশে চাষকৃত বিদেশী মৎস্য প্রজাতি।

মৎস্য প্রজাতি	সাধারণ নাম	প্রাকৃতিক আবাস	উৎস	আমদানীর বছর
Aristichthys nobilis	বিগহেড কার্প	চীন	নেপাল	১৯৮১
Carassins auratus	গোল্ড ফিশ	ইউরোপ/এশিয়া	পাকিস্তান	১৯৫৩
Ctenopharygodon idella	গ্রাস কার্প	চীন	হংকং	১৯৬৬
Cyprinus carpio var. communis	কমন কার্প/স্কেল কার্প	এশিয়া/ইউরোপ	চীন	১৯৬০
C. carpio var. specularis	মিরর কার্প	ইউরোপ	নেপাল	১৯৭৯
Hypophthalmichthys molitrix	সিলভার কার্প	চীন	হংকং	১৯৬৯
Mylopharyngodon piceus	ব্লাক কার্প	চীন	চীন	১৯৮৩
Puntius gonionotus	সিলভার বার্ব/ রাঁজপুটি	থাইল্যান্ড	থাইল্যান্ড	১৯৮৭
Clarias gariepinus	ক্যাট ফিস/আফ্রিকান মাগুড়	আফিকা	থাইল্যান্ড	১৯৮৯
Tor putitora	মহাশের	নেপাল	নেপাল	১৯৯১
Oreochromis	জাভা তেলাপিয়া	আফ্রিকা	থাইল্যান্ড	১৯৫৪
O. niloticus /mossambicus	নাইল তেলাপিয়া	আফ্রিকা	থাইল্যান্ড	১৯৭৪
O. niloticus	লাল তেলাপিয়া	আফ্রিকা	থাইল্যান্ড	১৯৮৮
Trichogaster pectoralis	গুরামি	থাইল্যন্ড	সিংগাপুর	১৯৫২

উৎস ঃ নুরুজ্জামান (১৯৮৮) ও রহমান (১৯৮৪)

সারণি- ৩। বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির তালিকা ।

প্রজাতির শ্রেণী	মৎস্য প্রজাতি	সাধারণ নাম
Carp	*Labeo gonius* (Ham.)	গণিয়া
	Labeo nandina (Ham.)	নান্দিনা
	Cirrhina reba (Ham.)	বাটা
	Puntius sarana (Ham.)	সঁরপুটি
	Tor tor (Ham.)	মহাশোল
	Tor putitora (Ham.)	মহাশের
Cat fish	*Pangasius pangasius* (Ham.)	পাংগাস
	Mystus cavasius (Ham.)	গুলশা টেংরা
	Batasio tengara (Ham.)	টেংরা
	Ompak pabda (Ham.)	মধু পাবদা
	Ompak bimaculatus (Bloch)	বলি পাবদা
	Alilia colla (Ham.)	বাঁশপাতা
	Ailichthys punctata (Day)	কাজলি
	Pseudeutroptus atherinoides (Bloch)	বাতাসী
Loach	*Botia dario* (Ham.)	রাণী
	Lepidocephalue gontea (Ham.)	গুতুম
Spinty eel	*Macrognathus sculeatus* (Bloch)	তারাবাইম
	Mastacambelus pancalus (Ham.)	চিরকা
Whiting	*Nandus nandus* (Ham.)	মেনি/ভেদা
	Badis badis (Ham.)	নাপিত কই
Goramies	*Colisha faciatus* (Bloch & Sohneider)	খলিশা
	Colisha lalius (Ham.)	লাল খলিশা
Glass perch	*Chanda nama* (Ham.)	লামা চান্দা
	Chanda ranga (Ham.)	লাল চান্দা
Mullet	*Rhinomugil corsula* (Ham.)	খল্লা

উৎস ঃ ডঃ এম. জি. হোসেন (১৯৯৫)

সারণি- ৪। মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের বছরওয়ারী তথ্য।

বৎসর	অভ্যন্তরীণ আহরণ (টন)	মৎস্য চাষ (টন)	সামুদ্রিক মৎস্য (টন)	মোট মৎস্য উৎপাদন (টন)
৮৪-৮৫	৪.৬৩	১.২৩	১.৮৮	৭.৭৪
৮৫-৮৬	৪.৪২	১.৪৫	২.০৭	৭.৯৪
৮৬-৮৭	৪.৩১	১.৬৬	২.১৮	৮.১৫
৮৭-৮৮	৪.২৩	১.৭৬	২.২৮	৮.২৭
৮৮-৮৯	৪.২৪	১.৮৪	২.৩৩	৮.৪১
৮৯-৯০	৪.২৪	১.৯৩	২.৩৯	৮.৫৬
৯০-৯১	৪.৪৩	২.১১	২.৪২	৮.৯৬
৯১-৯২	৪.৭৯	২.২৭	২.৪২	৯.৫২
৯২-৯৩	৫.৩৩	২.৩৮	২.৫০	১০.২১
৯৩-৯৪	৫.৫২	২.৭৫	২.৬০	১০.৮৭
৯৪-৯৫	৫.৭০	৩.৩০	২.৭০	১১.৭০
৯৫-৯৬	৫.৯৫	৩.৯০	২.৭৯	১২.৬৪

রপ্তানী ও আয়

সারণি-৫। মাছ/ চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্যজাত পণ্যের রফতানী বিষয়ক তথ্য।

পরিমাণ = মেট্রিক টন
মূল্য = মিলিয়ন টাকা

অর্থ বছর	চিংড়ি		ব্যাংগের পা		হিমায়িত মাছ		শুষ্ক মাছ		লবণাক্ত মাছ		কচ্ছপ/ কাছিম		হাঙ্গরের পাখনা ও পটকা		কাঁকড়া		সর্বমোট		জাতীয় রপ্তানী আয়ে অবদান (%)
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
১৯৯০-৯১	১৭৯৮৫	৪৫১.২২	৩১৮	৭.৩৬	৭৫২০	৪১.৪০	৪২৭	৫.৫৭	১১৪৪	১৩.৯৫	৭২	০.৫১	৭৮	৩.৭২	৩৩৩	২.৭১	২৬১০৯	৫২৬.৬২	৮.৬৪
১৯৯১-৯২	১৬৭৩০	৪৫৫.৭৩	৭৭১	১১.০৯	২৬০৪	৩০.১০	৮৯২	১৪.১১	৮০	১.৩৯	৯১	০.৯৫	৬৫	৫.৪১	৮৪৭	৫.৫৭	২২০৮০	৫২৪.৩৫	৬.৯১
১৯৯২-৯৩	১৯২২৪	৬০৪.০৩	-	-	২৭০৪	৩৮.৩১	১০৪২	১২.২৬	৫৯৯	৯.৮৪	৬০০	৬.৯১	২৩৮৩৯	১৪.২৫	২২০০	১৪.৬৯	২৬৬০৭৩৯	৭০০.২৯	৭.৫৭
১৯৯৩-৯৪	২২০৫৪	৭৮৭.৭৩	-	-	৩১২৫	৫১.১৮	২৪৭৩	৪১.৮৩	৫০	১.০৬	-	-	৪৫	২.৭৯	২৮৯২	১৯.৩১	৩০৬৩৯	৯০৩.৯	-
১৯৯৪-৯৫	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭	-	-	৯২৬৭	১৮০.২৫	৭৭৮	৯.৬৫	৫৯৬	১৪.১৪	-	-	১৮২	১৩.৮৩	৩৩১৬	২২.১৪	৪০৪১৯	১২৮৫.৭	-
১৯৯৫-৯৬	২৭৮৭০	১১০৯.১	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩৪৯	১৫.৫৪	-	-	৩৫৫৬	২৩.৭৪	৩৮৯২৯	১৩৪০.৯	৯.১২

উৎস ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো

মৎস্য স্থাপনা

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় যাবতীয় মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বিভাগীয়, জেলা ও থানা (থাঞ্চি, রামু, বরকল ও বিলাইছড়ি থানা ব্যতীত) পর্যায়ে প্রশাসনিক দপ্তর রয়েছে। তাছাড়াও প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দান এবং পোনা মাছ সহজলভ্য করার জন্য সারাদেশে ৮৮টি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১০টি গ্রামীণ মৎস্য খামার, ১৬টি মিনি হ্যাচারি, ৩টি চিংড়ি হ্যাচারি, ২টি ব্যাকইয়ার্ড চিংড়ি হ্যাচরি, ৪টি চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী খামার এবং ২টি মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার রয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় মৎস্য বন্দর, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও ফিশমিল প্ল্যান্ট, মান নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যসামগ্রী উন্নয়ন কেন্দ্র, মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র, জাল কারখানা এবং মেরিন ফিশারীজ একাডেমী রয়েছে।

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ময়মনসিংহে স্বাদুপানি কেন্দ্র, চাঁদপুরে নদী কেন্দ্র, পাইকগাছায় (খুলনা) লোনাপানি কেন্দ্র এবং কক্সবাজারে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। তা'ছাড়াও রাংগামাটিতে নদী উপ-কেন্দ্র ও সান্তাহারে ৩য় মৎস্য প্রকল্প এই ২টি উপ-কেন্দ্র রয়েছে।

এছাড়াও, বেসরকারী পর্যায়ে ২৫৬টি কার্প হ্যাচারি, ২০টি চিংড়ি হ্যাচারি (তন্মধ্যে ১২টি নির্মাণাধীন ও ১১৪টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে (১৯৯৫ সনের হিসাব অনুযায়ী)।

উন্নয়ন কর্মসূচী

১৯৯৬-৯৭ সনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ।

মৎস্য অধিদপ্তর

১। দ্বিতীয় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প।
২। বিল ও বাওড় মৎস্য উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
৩। তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প।
   ক) মৎস্য অধিদপ্তর অংশ।
   খ) মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট অংশ।
   গ) পানি উন্নয়ন বোর্ড অংশ।
৪। মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় ধাপ)।
৫। পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প।
৬। বগুড়া জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৭। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় কার্প/চিংড়ির মিশ্রচাষ প্রকল্প।
৮। থানা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৯। খাদ্য সহায়তা সমন্বিত মৎস্যচাষ প্রকল্প।
১০। চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র এবং সার্ভিস সেন্টার স্থাপন।
১১। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি প্রকল্প।
১২। বেসরকারী পর্যায়ে চিংড়ি চাষ উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি প্রকল্প।
১৩। কক্সবাজার জেলার কলাতলী সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত চিংড়ি হ্যাচারি এলাকা ভাঙ্গণরোধ প্রকল্প।
১৪। উত্তর-পশ্চিম মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় ধাপ)।
১৫। ধানক্ষেতে মাছচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

১৬। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এলাকায় ও অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্যচাষ প্রকল্প।
১৭। মেরিন ফিশারীজ একাডেমী, চট্টগ্রাম (দ্বিতীয় ধাপ)।

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

১৮। মাৎস্য গবেষণা কর্মসূচী উন্নয়ন প্রকল্প ।
১৯। ARMP-এর আওতায় মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের উন্নয়ন প্রকল্প।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

২০। কাপ্তাই লেকে মৎস্য উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।
২১। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কক্সবাজার ও পাথরঘাটা পাইকারী মৎস্য বাজার ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র দুইটি আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহ

মৎস্য অধিদপ্তর

১। বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
২। কমিউনিটি বেইজড ইনল্যাণ্ড ওপেন ওয়াটার ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। ইন্টিগ্রেটেড একুয়াকালচার (ডাক উইড) প্রকল্প।

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

৪। বাংলাদেশে ইলিশ মাছ গবেষণা প্রকল।
৫। একুয়াকালচার রিচার্স ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প।

(সংকলিত)

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

মোঃ মাহমুদুল হক, সহকারী প্রধান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

অবতরণিকা

মৎস্য সেক্টরের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় এবং উক্ত খাতের উন্নতিবিধানকল্পে বেঙ্গল সরকারের নির্দেশনায় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য স্যার কেজি গুপ্ত কর্তৃক তথ্যানুসন্ধানপূর্বক প্রণীত ও পেশকৃত সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৮ সনের 'মৎস্য অধিদপ্তর' সৃষ্টি হলেও ১৯১০ সনে মৎস্য অধিদপ্তরকে কৃষি অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করা হয়। পুনরায়, ১৯১৭ সনে মৎস্য অধিদপ্তরকে কৃষি অধিদপ্তর থেকে বিযুক্ত করা হয় এবং মূলত অর্থাভাবে এবং যোগ্য ব্যক্তির অপ্রাপ্যতার কারণে 'বেঙ্গল রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি'র সুপারিশে ১৯২৩ সনে মৎস্য অধিদপ্তরের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বরে বেঙ্গল সরকার কর্তৃক মাদ্রাজ সরকারের ডঃ এম আর নাইডুকে বেঙ্গল প্রভিন্সের তৎকালীন মৎস্যসম্পদের অবস্থা জরিপ করে উন্নয়নের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান হয়। ডঃ নাইডুর সুপারিশে (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) ১৯৪১ সনের মে মাসে মৎস্য অধিদপ্তর পুনরুজ্জীবিত হয়।

১৯৫৪ সনে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যাবলী 'গবেষণা' এবং 'সম্প্রসারণ' উইং হিসেবে ভাগ করে 'সম্প্রসারণ' উইংটি 'সম্প্রসারণ ও পল্লী উন্নয়ন পরিদপ্তর' এর সাথে একীভূত করা হয় এবং 'গবেষণা' উইংটি মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালকের আওতায় দু'জন উপ-পরিচালকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৬১ সনে মৎস্য অধিদপ্তর 'রিপোর্ট অব দি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিঅর্গানাইজেশন'-এর ভিত্তিতে এবং ১৯৮২ সনে 'মার্শাল ল কমিটি অন অর্গানাইজেশনাল সেট-আপ অব পাবলিক বডিস, ইটসেট্রা'-এর ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সনে 'মার্শাল ল কমিটি'-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনরায় মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়।

করাচীতে সদর দপ্তর স্থাপন করে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ১৯৫২ সনে 'কেন্দ্রীয় মৎস্য বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় মৎস্য বিভাগের সদর দপ্তর করাচী থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অবশ্য এ সময় সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগের একটি দপ্তর চট্টগ্রামে অবস্থিত ছিল যা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৫ সনে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে একীভূত হয়। পরে ১৯৭৭ সনের জুলাই মাসে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগকে বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা বাস্তবায়িত হবার পূর্বেই ১৯৭৭ সনের ডিসেম্বর মাসে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত রাখা হয়। আবার ১৯৮৪ সনে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগকে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করা হয় এবং বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকান্ড অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ-উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত।

১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে ভারত বিভক্তির পর মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর কলকাতা থেকে (তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের নতুন রাজধানী ঢাকাতে স্থানাভাবে) কুমিল্লায় স্থানান্তরপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়।

১৯৫৫ সনের মার্চ মাসে ঢাকাস্থ ইডেন বিল্ডিং (বর্তমান সচিবালয়)-এ সদর দপ্তর স্থাপন করে মৎস্য অধিদপ্তরকে পূর্ববর্তী ১৯৫৪ সনে পূর্ব রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ইডেন বিল্ডিং থেকে ৮১, কাকরাইল রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়, যা ১৯৮৬ সনের ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান 'মৎস্য ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পুষ্টি সমস্যার সমাধান এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি- বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মৎস্য উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা, বাংলাদেশের (১৯৯৩-৯৪ সনে) জাতীয় আয়ের ৪.৭ ভাগ, কৃষিসম্পদ থেকে আয়ের ১৫.৮ ভাগ, রপ্তানি আয়ের ৯.৩৮ ভাগ (১৯৯৪-৯৫), প্রাণিজ আমিষের ৮০ ভাগ আসে মৎস্য খাত থেকে। তাছাড়া জিডিপিতে উক্ত খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৮.৭ ভাগ (১৯৯৩-৯৪)।

উক্ত সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তা নিম্নরূপঃ

১. অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।

২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ব্যাপক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৩. মৎস্য অধিদপ্তরের খামার ও হ্যাচারির মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে সম্প্রসারিতকরণ।

৪. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. মৎস্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডে জড়িত জনগোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তাদান।

৬. নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ, মজুদ ও উৎপাদন নিরূপণ।

৭. মৎস্য বিষয়ক আইন-কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে সহায়তাদান।

৮. মৎস্য বিষয়ক উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

৯. মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০. রপ্তানিযোগ্য প্রক্রিয়াজাত মৎস্য পণ্যের গুণগত মান নিরূপণ ও রপ্তানিযোগ্যতার সনদপত্র প্রদান।

১১. মৎস্য বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

বাজেট

মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের উৎস্য দু'টো, যথা রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট। ১৯৯৬-৯৭ সনে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২৪৬৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৮০৬১.০০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তর একটি সার্ভিস সেক্টর।

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও জনবল

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম একজন মহাপরিচালক দ্বারা নির্বাহ হয়ে থাকে। দু'জন পরিচালক (ক. অভ্যন্তরীণ মৎস্য ও খ. সামুদ্রিক মৎস্য) এবং তিনজন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ক. মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ, খ. মৎস্যসম্পদ জরিপ পদ্ধতি এবং গ. মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর) মহাপরিচালককে সমুদয় কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

পরিচালক (অভ্যন্তরীণ) কে বিভাগীয় উপ-পরিচালক, বাঁওড় প্রকল্পের রাজস্ব খাতভূক্ত অংশের প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর ও ফরিদপুরের অধ্যক্ষদ্বয় সহায়তা প্রদান করেন। একই ভাবে বিভাগীয় উপ-পরিচালককে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে থানা মৎস্য কর্মকর্তা এবং খামার ব্যবস্থাপক সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

পরিচালক (সামুদ্রিক) কে উপ-পরিচালক (সামুদ্রিক) এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সামুদ্রিক) সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন খাতে জনশক্তির সংখ্যা সর্বমোট ৫০৮০ জন। তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ৩৯৩১ জন (১ম শ্রেণী-৭৪৭ জন, ২য় শ্রেণী-৭১ জন, ৩য় শ্রেণী-২১২৯ জন এবং ৪র্থ শ্রেণী-৯৮৪ জন) এবং উন্নয়ন খাতে ১১৪৯ জন (১ম শ্রেণী-২৭৪ জন, ২য় শ্রেণী-৫১ জন, ৩য় শ্রেণী-৪৭৬ জন এবং ৪র্থ শ্রেণী ৩৪৮ জন)।

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো

মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ঢাকাস্থ সেগুন বাগিচায় 'মৎস্য ভবনে' অবস্থিত। তাছাড়া বিভাগ, জেলা এবং থানা (থাঞ্চি, রামু, বরকল এবং বিলাইছড়ি থানা ব্যতীত) পর্যায়ে মৎস্য দপ্তর রয়েছে। তদুপরি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সমগ্র দেশে ৮৭ টি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১ টি খামারবিহীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩ টি চিংড়ি হ্যাচারি, ২ টি ব্যাকইয়ার্ড চিংড়ি হ্যাচারি এবং ৪টি চিংড়ি প্রদর্শনী খামার রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, বর্ধিত হারে আমিষের যোগান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৬-৯৭ সনে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৭ টি (বিনিয়োগ ১৫ টি, কারিগরি সহায়তা ২টি) প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে। ঐসব প্রকল্পের জন্য সর্বমোট ৮০৬১.০০ লক্ষ (বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ৭৯৭৮.০০ লক্ষ এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য ৮৩.০০ লক্ষ) টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম

ইতোপূর্বে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং সহায়ক সার্ভিসের অপ্রতুলতার কারণে মৎস্য সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড চাহিদা মোতাবেক পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে রাজস্ব খাতের শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমেও কিছুটা শক্তি সঞ্চিত হওয়ায় মৎস্য/চিংড়ি চাষের আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্প্রসারণ কার্যক্রম কিছুটা গতি লাভ করেছে। ইতোমধ্যেই একটি চিংড়ি সেল স্থাপিত হয়েছে এবং মৎস্য সেল স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় কারিগরি পরামর্শদানসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক পুস্তিকা, পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। তথাপি সর্বদাই, সম্প্রসারণ কর্মকান্ড আরো জোরদারকরণের অবকাশ থেকেই যায়।

প্রশিক্ষণ

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তদুপরি, মৎস্যচাষী, বেকার যুবক/মহিলা, প্রান্তিক চাষীদেরকে মৎস্য/চিংড়ি বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মসূচির আওতায় নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিশেষ কর্মসূচি

১. নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্যজীবীগণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৬ সনে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ পূর্বক মৎস্য অধিদপ্তরকে এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করে। এ নীতিমালার আওতায় মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য লাইসেন্সিং প্রথা চালু করা হয়। কিন্তু ১৯৯৫ সন থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে উক্ত কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রাখা হয়।

২. অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উৎপাদন ব্যাপকহারে কমে যাওয়ায় মৎস্য অধিদপ্তর কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের উৎপাদনে উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান কর্মসূচি

সরকার মৎস্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে যাতে মৎস্য অধিদপ্তর সহায়তা প্রদান করে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হল ঃ

- উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষীগণকে চিংড়ি চাষ প্রকল্পে ঋণদান কর্মসূচি (১৯৮০ সনে প্রবর্তিত)।
- মৎস্য অধিদপ্তরের দ্বিতীয় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প (এডিবি)-এর আওতায় চিংড়ি/মৎস্যচাষীগণকে ঋণদান কর্মসূচি (১৯৮৯ সনে প্রবর্তিত)।
- মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় ধাপ), ময়মনসিংহ-এর আওতায় মৎস্যচাষের ঋণদান কর্মসূচি (১৯৯১ সনে প্রবর্তিত)।
- পুকুর মালিকগণকে মৎস্য শিল্পে ঋণদান কর্মসূচি (১৯৯২ মসে প্রবর্তিত)।
- বিল ও বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, যশোর-এর আওতায় এনজিওর মাধ্যমে মৎস্যাজীবীগণকে ঋণদান কর্মসূচি (১৯৯৩ সনে প্রবর্তিত)।

৪. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানসহ আয়ের পথ প্রশস্ত করার জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সরকারি জলাশয়ের সংস্কার কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৫. রেণু/পোনা মাছ উৎপাদন কর্মসূচি

মৎস্যচাষ মূলত গুণগত মানসম্পন্ন রেণু/পোনা মাছ প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। মানসম্পন্ন রেণু/পোনামাছ সহজলভ্য করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হ্যাচারি/মৎস্য খামারে রেণু/পোনামাছ উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

মৎস্যসম্পদ

জলসম্পদ সমৃদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে নদীমাতৃক বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল। অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪৩.৪০ লক্ষ হেক্টর যার মধ্যে ৯৩% উন্মুক্ত জলাশয়। তাছাড়া রয়েছে ৪৮০ কিলোমিটার উপকূল, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ৭,৩২৫ বর্গ নটিক্যাল মাইল, টেরিটোরিয়েল ওয়াটার–২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল, একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা–৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল, কন্টিনেন্টাল শেলফ–২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল। উক্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মৎস্য উৎপাদন ও রপ্তানি

১৯৯৩–৯৪ সনে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ছিল ১০.৯০ লক্ষ টন এবং ১৯৯৪–৯৫ সনে ১২.০০ লক্ষ টন (প্রজেক্টেড)। উক্ত উৎপাদনের মধ্যে ১৯৯৪–৯৫ সনে ০.৪২ লক্ষ টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছিল ১,৩০৬.৯৪ কোটি টাকা। ১৯৯৫–৯৬ সনে মৎস্যক্ষেত্রের রপ্তানি আয় হয়েছে (মে'৯৬ পর্যন্ত) ১,২১৬.০৩ কোটি টাকা। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বিবেচনায় আনা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনাকালে অর্থাৎ ১৯৯৯–২০০০, ২০০৪–২০০৫ এবং ২০০৯–২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৩.৬৩ কোটি, ১৪.৬৪ কোটি এবং ১৫.৩৯ কোটি। ঐ সময় দৈনিক মাথাপিছু আমিষের প্রাপ্যতা যথাক্রমে ২৮.৩৮ গ্রাম, ৩১.৩২ গ্রাম এবং ৩৩.৪৬ গ্রাম নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১৫.০২ লক্ষ টন (রপ্তানি–০.৯০ লক্ষ টন), ১৮.২৪ লক্ষ টন (রপ্তানি–১.৫০ লক্ষ টন) এবং ২১.৮০ লক্ষ টন (রপ্তানি–৩.০ লক্ষ টন)।

মৎস্য বিষয়ক আইনকানুন

সম্পদ সংরক্ষণ এবং সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা বজায় রাখার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর যে সকল আইন–কানুন প্রয়োগে সহায়তা করে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

১. পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯।

২. ইষ্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিশ অ্যাক্ট, ১৯৫০।

৩. মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩।

৪. ফিশ অ্যান্ড ফিশ প্রডাক্টস (ইন্সপেকশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩।

৫. চিংড়ি চাষ অভিকর আইন, ১৯৯২, ইত্যাদি।

উপসংহার

জনবল এবং সহায়ক সার্ভিসের সীমাবদ্ধতা সত্বেও মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে বিএফডিসির ভূমিকা

বিগত ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও গবেষণা, মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রের মৎস্য আহরণের জন্য ট্রলার বহরের প্রচলন, দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণ, উন্নত মানের যান্ত্রিক নৌকা প্রচলন, সর্বপ্রকার আধুনিক মৎস্য চাষ উৎপাদন, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন, বরফকল স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য বন্দর, মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন, রাঙ্গামাটি হ্রদের মৎস্য ব্যবস্থা, বিপণন ও বিতরণ, জনশক্তি উন্নয়নকল্পে মেরিন ফিশারিজ একাডেমী স্থাপন ইত্যাদি অবকাঠামো ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিগত ১৯৬৪ সন থেকে ১৯৮৮ সনের জুন মাস পর্যন্ত এই কর্পোরেশন মূলত উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে দেশের মৎস্যশিল্পের ক্ষেত্রে মজবুত বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এই সময়ে কর্পোরেশন মূলত সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কিছু কিছু আধা-বাণিজ্যিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

১৯৮৯ সাল থেকে কর্পোরেশনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি কমিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই লক্ষ্যে কাপ্তাই, ডিএনডি ও গুলশান লেকসমূহে বর্ধিত হারে পোনা অবমুক্তি, ২টি সাদা মাছ ধরার ট্রলারকে চিংড়ি ট্রলারে রূপান্তর এবং চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে দ্বিতীয় স্লিপওয়ে নির্মাণ ইত্যাদি সম্পন্ন করায় কর্পোরেশন সামগ্রিকভাবে ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে কর্পোরেশন ৬.১০ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। আরো উল্লেখযোগ্য যে, সাদা মাছ ধরা ২টি ট্রলার চিংড়ি ট্রলারে রূপান্তরের সুফল হিসেবে ১৯৯৩-৯৪ ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ সালে যথাক্রমে ২২৭.৪৭ লক্ষ, ৪৫.৩৫, লক্ষ এবং ৮৬.৮৬ লক্ষ টাকা অপারেশনাল মুনাফা লাভে সমর্থ হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে কেবল ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ সনে কর্পোরেশনের ট্রলার বহর ইউনিট ১৫৭.৬৭ লক্ষ ১৩৬.০৩ লক্ষ এবং ১১০.৬৫ লক্ষ টাকার হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে ১৮টি বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে এবং এর অধীনে পরিচালিত রাজস্ব ইউনিটগুলো পরিচালনার জন্য কোন সরকারি অনুদান বা ঋণ নেয়া হয়নি। কর্পোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব তহবিল থেকেই ইউনিটগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প, ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প এবং ১৫ (পনর) বছরের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ যথাক্রমে সারণি ১,২ ও ৩ এ পরিবেশিত হলো।

উল্লেখ্য যে, চলতি এডিপি (১৯৯৫-৯৬)"তে কর্পোরেশনের "কাপ্তাই লেকে মৎস্য উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, কার্য পরিধি এবং বিদ্যমান সুবিধাদি।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৯৬৪ সন।
অধ্যাদেশ ঃ নং ৪/১৯৬৪।
এ্যাক্ট ঃ ২২/১৯৭৩।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- ❒ মৎস্য ও মৎস্যশিল্পের উন্নয়নে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❒ মৎস্যশিল্প প্রতিষ্ঠা।
- ❒ মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্যসম্পদ আহরণের জন্য উন্নততর মৎস্য আহরণ সুবিধাদির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ❒ মৎস্যশিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার নৌকা, ফিশ ক্যারিয়ার, নদী ও সড়ক পথে চলাচলযোগ্য যানবাহন ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা।
- ❒ মৎস্যশিল্প এবং সমবায়ীদের মধ্যে ঋণপ্রদান।
- ❒ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ দান।
- ❒ মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- ❒ মৎস্য শিকার, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন ও পরিচালনা।
- ❒ মৎস্য ও মৎস্য দ্রব্যাদি রপ্তানিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প স্থাপন।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমান জনশক্তি		
	অনুমোদিত	কর্মরত
মোট	৯৮৫	৭৮০
কর্মকর্তা	১৯৫	১৭৬
কর্মচারী	৭৯০	৬০৪

কার্যক্রম ঃ উপরিবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলেছে ঃ

- ❑ গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার
- ❑ উপকূলীয় মৎস্য শিকার
- ❑ মিনি ট্রলারের প্রচলন
- ❑ মৎস্য বন্দর স্থাপন
- ❑ মৎস্য অবতরণ ঘাঁটি ও পাইকারি মৎস্য বাজার স্থাপন
- ❑ নৌকা যান্ত্রিকীকরণ এবং নৌকা নির্মাণ
- ❑ মৎস্য জাল তৈরি
- ❑ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ
- ❑ ডকিং ও জাহাজ মেরামত
- ❑ জেলেদের মধ্যে যান্ত্রিক নৌকা, সূতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বিতরণ
- ❑ মৎস্য বাজারজাতকরণ ও বিতরণ
- ❑ মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানি
- ❑ হ্রদে মৎস্য চাষ
- ❑ ফিশমিল উৎপাদন
- ❑ শুটকি মাছ উৎপাদন
- ❑ মৎস্যজাত খাদ্য তৈরি
- ❑ শার্ক লিভার ওয়েল তৈরি
- ❑ বরফ উৎপাদন
- ❑ জনশক্তি উন্নয়ন
- ❑ পণ্যের মান উন্নয়ন
- ❑ মৎস্যশিল্প এলাকা স্থাপন

বিদ্যমান সুবিধাদি

(ক) অবকাঠামো নির্মাণ
মৎস্য বন্দর ঃ ১টি চট্টগ্রাম।
মৎস্য অবরতণ কেন্দ্র ও পাইকারি মৎস্য বাজার ঃ ১১টি চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, পাগলা, ঢাকা, পাথরঘাটা,, ডাবরঘাট ও মংলা।

(খ) বরফ কলের সংখ্যা ঃ মোট ১৫টি। চট্টগ্রাম- ৩টি, কক্সবাজার-১টি, রাঙ্গামাটি- ২টি, পাগলা- ১টি, মংলা- ২টি, পাথরঘাটা-১টি, বরিশাল-১টি, খুলনা,-১টি, রাজশাহী-১টি, ডাবরঘাট-১টি ও খেপুপাড়া-১টি।
দৈনিক বরফ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ মোট ২৭৯ টন।

(গ) হিমাগার সংখ্যা ঃ মোট ১০টি।
ধারণ ক্ষমতা ঃ ৬৩৫ টন।

(ঘ) ফ্রিজিং প্ল্যান্টের সংখ্যা ঃ মোট ৪টি।
ফ্রিজিং ক্ষমতা ঃ মোট ৬১ টন।
প্লাষ্ট ফ্রিজিং ঃ মোট ৪৯ টন।
প্লেট ফ্রিজিং ঃ মোট ১২ টন।

(ঙ) ফ্রোজেন ষ্টোরেজ ধারণ ক্ষমতা ঃ ১৩৮০ টন। কক্সবাজার-১টি, চট্টগ্রাম- ১টি, পাগলা- ১টি ও মংলা- ১টি।

(চ) ফিশমিল প্ল্যান্টের সংখ্যা ঃ মোট ৪টি। চট্টগ্রাম- ২টি, কক্সবাজার- ১টি ও মংলা- ১টি।
ফিশমিল উৎপাদন ক্ষমতা (দৈনিক) ঃ মোট ৮ টন।

(ছ) মৎস্য নিলাম কেন্দ্র ঃ মোট ১৩টি।

(জ) মৎস্য পরিবহণ ভ্যান মোট ১০টি।

(ঝ) ট্রলার সংখ্যা ঃ চিংড়ি ট্রলার- ২টি ও সাদা মাছ ধরার ট্রলার-৬টি।

(ট) মৎস্য জাল কারখানা ঃ মোট ৩ টি।
জাল উৎপাদন ক্ষমতা (বাৎসরিক) ঃ মোট ৪.২০ লক্ষ পাউণ্ড।

(ঠ) মেরিন ওয়ার্কশপ ঃ মোট ১ টি।

(ড) ডকইয়ার্ড/ স্লিপওয়ে ঃ মোট ২টি।

(ঢ) কর্মরত জনশক্তি ঃ মোট ৭৮০ জন।

বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ

১। মৎস্য অবতরণ ও পাইকারি মৎস্য বাজার, কক্সবাজার।
২। মৎস্য অবতরণ ও পাইকারি মৎস্য বাজার, খুলনা।
৩। মৎস্য অবতরণ ও পাইকারি মৎস্য বাজার, রাজশাহী।
৪। মৎস্য অবতরণ ও পাইকারি মৎস্য বাজার, বরিশাল।
৫। মৎস্য অবতরণ ও পাইকারি মৎস্য বাজার, খেপুপাড়া।
৬। মৎস্য অবতরণ ও পাইকারি মৎস্য বাজার, পাথরঘাটা।
৭। মৎস্য অবতরণ ও পাইকারি মৎস্য বাজার, সুনামগঞ্জ।
৮। মৎস্য সংরক্ষণ, অবতরণ ও বিতরণের সুবিধাদি স্থাপন, মনোহরখালী, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।
৯। মহানগর জলাশয় ইউনিট, ডেমরা, ঢাকা।
১০। কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি।
১১। মৎস্য জাল কারখানা, কুমিল্লা।
১২। মৎস্য জাল কারখানা, চট্টগ্রাম।
১৩। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার।
১৪। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, মংলা।
১৫। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, পাগলা।
১৬। ট্রলার বহর, চট্টগ্রাম।
১৭। চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৯৩-৯৬ (এপ্রিল) অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান খাত সমূহ	১৯৯৫–৯৬ জুলাই–জুন	১৯৯৪–৯৫ জুলাই–জুন	১৯৯৩–৯৪ জুলাই–জুন
১।	মাছ আহরণ/উৎপাদন			
	(ক) সামুদ্রিক মাছ (টন)	১৫৭	৩৫৪	৩২৬
	(খ) চিংড়ি (টন)	৬৬	৪৪	৫৫
	(গ) মিঠাপানির মাছ ঃ			
	অ) কাপ্তাই হ্রদ (টন)	৫৭৯৬	৫২০৭	৫৮০৩
	আ) মহানগর জলাশয় ইউনিট (টন)	৩৬	৪৫	৬৭
২।	মৎস্য অবতরণ (সামুদ্রিক) টন	১০৩৬৪	৮৬৩৬	৪৯৮০
৩।	চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ	৪	–	১০
৪।	মাছ হিমায়ন	১৯৭৮	২২৯০	১০৪২
৫।	ফিশমিল	৪৫	১৯০	৩৫৪
৬।	হাঙ্গরের তৈল	–	৬	৯
৭।	বরফ উৎপাদন	১৮৪৭৩	২৩১৫০	১৬০৮৭
৮।	জাল উৎপাদন	৫৬৮০৩	৮৬৪৪৬	১২৭৭৬৪
৯।	সাদা মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি (লক্ষ টাকায়)	১১০.৬৫	১৫৪.৮২	১৭৯.৪১
১০।	খুচরা বাজারজাতকরণ	৪৫০	৬৫৫	৬৭৯

মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় আমিষ চাহিদা পূরণে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান বর্তমানে শুধু তাৎপর্যপূর্ণই নয়, এর সম্ভাবনাও অপরিসীম। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ, রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯ ভাগ এবং প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৭৩ ভাগ আসে মৎস্যসম্পদ থেকে।

অতীতে এদেশের প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, রোগের প্রাদুর্ভাব, পরিবেশগত বিপর্যয় ইত্যাদি নানা কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের প্রাচুর্য আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পায়। এই বিষয়টির প্রতি তাই দেশের মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এর ফলশ্রুতিতে দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদ ও সরকারি নীতি নির্ধারকদের নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়। এঁরা সরকারের নিকট সুপারিশ রাখেন যে, দেশের মৎস্যচাষ ও আহরণ ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠু ও সঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দানের লক্ষ্যে অবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। এরপর, যথাযথ গবেষণা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন ও সর্বোত্তম ব্যবস্থার নিশ্চিত করার স্বার্থে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইনষ্টিট্যুট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে সরকার দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনকল্পে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার আহ্বান জানালে ইনষ্টিট্যুট সরকারের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ইনষ্টিট্যুটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সামনে রেখে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের সার্বিক কর্মধারা পরিচালিত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

- দেশের মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয়সাধন।
- মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত দিকসমূহের নিরীক্ষণ ও প্রমিতকরণ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা।
- আমদানি বিকল্প ও ব্যয় হ্রাসের পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং জাতীয়ভাবে ব্যবহারোপযোগী অথবা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য পণ্যের মানোন্নয়ন পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইনষ্টিট্যুটের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির পাশাপাশি ইনষ্টিট্যুট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ের চাষী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের নিকট জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা।
- দেশের মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারকে সময় সময় পরামর্শ প্রদান।

ইনষ্টিট্যুটের ব্যবস্থাপনা

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন পরিচালক যিনি ইনষ্টিট্যুটের জন্য প্রণীত নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী

যুযোপযোগী এবং বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করে থাকেন।

ইনষ্টিট্যুট প্রশাসনিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ দিক-নির্দেশনাসহ এটি পরিচালনা ও এর সার্বিক নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি "বোর্ড অভ্ গভর্ণর্স্" এর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। "বোর্ড অভ্ গভর্ণর্স্" এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

চেয়ারম্যান	ঃ	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
ভাইস-চেয়ারম্যান	ঃ	সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
সদস্যবৃন্দ	ঃ	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়
	ঃ	নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
	ঃ	ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
	ঃ	সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন।
	ঃ	মহা-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
	ঃ	সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনষ্টিট্যুটের দু'জন বিজ্ঞানী
	ঃ	সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মৎস্য উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'জন ব্যক্তি
সদস্য-সচিব	ঃ	পরিচালক, মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

জলজ পরিবেশগত অবস্থানুযায়ী দেশের ৪টি এলাকায় ইনষ্টিট্যুটের গবেষণা কেন্দ্র ও ২টি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হলো ময়মনসিংহে অবস্থিত স্বাদুপানি কেন্দ্র, চাঁদপুরে অবস্থিত নদী কেন্দ্র খুলনার পাইকগাছায় অবস্থিত লোনাপানি কেন্দ্র ও কক্সবাজারে অবস্থিত সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র দুটি হলো রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই লেক উপকেন্দ্র ও সান্তাহার প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র। এছাড়াও খেপুপাড়াস্থ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি ইনষ্টিট্যুটের নিকট হস্তান্তর পর্যায়ে রয়েছে। ইনষ্টিট্যুটের প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে অবস্থিত।

ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন প্রকাশনা

ইনষ্টিট্যুটের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে হস্তান্তর ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ইনষ্টিট্যুট থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ১৪টি সম্প্রসারণ পুস্তিকা, ১৮টি লিফলেট, ২০টি ট্রেনিং ম্যানুয়েল ও ২০টি পোষ্টার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকাশনা ছাড়াও ইনষ্টিট্যুট নিয়মিতভাবে কারিগরি প্রতিবেদন, বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালার প্রসিডিংস প্রকাশ করে থাকে। প্রকাশিত লিফলেট এবং সম্প্রসারণ পুস্তিকাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মী এবং মৎস্য চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইনষ্টিট্যুট থেকে ইতোমধ্যে প্রায় এক লক্ষ সম্প্রসারণ পুস্তিকা এবং লিফলেট আগ্রহী সম্প্রসারণ-কর্মী ও মৎস্যচাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ইনষ্টিট্যুটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হচ্ছে *"Fisheries Newsletter"* নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা। মৎস্য সেক্টরের দেশী-বিদেশী খবরাখবর, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি ফিশারিজ নিউজলেটারে অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ১৯৯২ সাল থেকে ইনষ্টিট্যুট এ প্রকাশনাটি নিয়মিতভাবে বের করে আসছে।

এছাড়াও ইনষ্টিট্যুট হতে শীঘ্রই *Journal of Fisheries Research* নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল প্রকাশ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সঙ্গে ইনষ্টিট্যুটের কর্মসংযোগ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মসংযোগের মাধ্যমে ইনষ্টিট্যুটের গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনই এ

ধরনের কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। এ ধরনের কয়েকটি কর্মসংযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১.আইডিআরসি (International Development Research Centre) ঃ আইডিআরসি এর আর্থিক সহায়তায় চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্র ১৯৮৬ সালে "ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ইনষ্টিট্যুট থেকে কতিপয় সুপারিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে এবং জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষাকল্পে সরকার তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছেন।

২. ইকলার্ম (International Centre for Living Aquatic Resources Managment) ঃ আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইকলার্ম প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের সাথে যৌথভাবে কাজ করে আসছে। ইনষ্টিট্যুট কর্তৃক উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে চাষীদের নিকট হস্তান্তরে ইকলার্মের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তাদানের পাশাপাশি মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং ইনষ্টিট্যুটের মানবসম্পদ উন্নয়নে ইকলার্ম সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

৩. ইনগা (International Network of Genetics in Aquaculture) ঃ ফিলিপাইনস্থ "ইকলার্ম" এতদঞ্চলে উন্নত ও দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য প্রজাতি উদ্ভাবন, বিতরণ ও তার উৎপাদনশীলতা মূল্যায়নসহ মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে "ইনগাঃ নামে একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গঠন করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার আরো ১০টি দেশসহ বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে এই নেটওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত হয়। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট জাতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (nodal institute) হিসেবে উক্ত নেটওয়ার্কের সদস্য।

৪. এসিআইএআর (Australian Council for International Agricultural Research) ঃ আইডিআরসি ১৯৯২ সালে ইনষ্টিট্যুট পরিচালিত "ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান বন্ধ করে। এর প্রেক্ষিতে, অস্ট্রেলীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা ইনষ্টিট্যুটের ইলিশ গবেষণা প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহেযোগিতা প্রদানে সম্মত হন। এরই আলোকে সম্প্রতি ইনষ্টিট্যুট এবং এসিআইআর-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৫. নেদারল্যাণ্ড সরকার ঃ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট সম্প্রতি নেদারল্যাণ্ড সরকারের সহযোগিতায় কুটিপানা (duck weed) প্রকল্প নামে ৪ বছর মেয়াদী একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে স্বল্প খরচে কুটিপানা উৎপাদন ও তা মৎস্যখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

ইনষ্টিট্যুট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট দেশের মৎস্য খাতে উন্নয়ন সাধনে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এই সমস্ত গবেষণা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক তথ্য এবং উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। ইতোমধ্যে ইনষ্টিট্যুট বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে। এই সমস্ত প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে, পুষ্টি চাহিদা মেটাতে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ইনষ্টিট্যুট কর্তৃক উদ্ভাবিত এ ধরনের প্রযুক্তির তালিকা নিম্নরূপ।

১. মৌসুমী পুকুরে নাইলোটিকা ও লাল তেলাপিয়ার চাষ, ২. পুকুরে রাঁজপুটির চাষ, ৩. উন্নত জাতের হাইব্রিড মাগুর উৎপাদন, ৪. রুই জাতীয় মাছের আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনা, ৫. পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ. ৬. সমন্বিত হাঁস/মুরগি ও মাছ চাষ, ৭. দেশীয় উপাদানে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুত, ৮. পাঙ্গাঁস মাছের প্রজনন ও ব্যবস্থাপনা, ৯. পেনে মাছ চাষ, ১০. গৃহাঙ্গণ হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন, ১১. ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা।

গবেষণার বর্তমান ধারা

ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও উপকেন্দ্রে বর্তমানে যে সকল গবেষণা প্রকল্প চালু রয়েছে, নিম্নে তার তালিকা সন্নিবেশিত হলো ঃ

FRI, Mymensingh

1. All Bangladesh Co-ordinated adaptive research on fish and prawn culture in different agroclimatic/physiographic regions of the country.
2. Studies on the development of hatchery technology and culture system of the giant freshwater prawn, *Macrobrachium rosenbergii.*

Sub-project A : Studies on the development of backyard hatchery for *M. rosenbergii.*

Sub-project B : Studies on the mass seed productiong of *M. rosenbergii* and its farming system in brackishwater environment.

Sub-project C : Studies on the development of freshwater prawn *(M. resenbergii)* nursery and grow-out technology in freshwater environment.

FRESHWATER STATION, Mymensingh

3. Feed and Nutrition : Development of feed for fingerlings and broodstock of carp and catfish.
4. Breeding plan and genetic studies for stock improvement of commercially important fishes of Bangladesh.
5. Development of nursery pond management methods for optimizing production of fry/fingerlings of carps.
6. Development of breeding and culture techniques for endangered fish species of Bangladesh.
7. Breeding and culture of commercially important catfishes of Bangladesh.
8. Studies on the biological stress in relation to the diseases of freshwater fishes.

RIVERINE STATION, Chandpur

9. Studies on the reproductive biology and development of breeding techniques for riverine catfish, *Pangasius pangasius, P. sutchi, Rita rita, Mystus aor and Silona silandia.*
10. Development of pen culture techniques in irrigation canals and oxbow lakes.
11. Studies on the effects of commonly used agrochemicals on aquatic biota.
12. Sylhet-Mymensingh basin fish stock assessment.
13. Population dynamics and stock assessment of Hilsa in the Meghna river.

RIVERINE SUB-STATION, Rangamati

14. Assessment of biological productivity and management of fisheries of Kapti Lake

BRACKISHWATER STATION, Paikgacha, Khulna

15. Survey and assessment of shrimp fry resources of Bangladesh.
16. On-farm research on productivity enhancement of gher fishery.
17. Development of suitable culture technique for mud crab.
18. Demonstration of improved polyculture technique of shrimp and mullet.

MARINE FISHERIES AND TECHNOLOGY STATION, Cox's Bazar

19. Monitoring and assessment of marine fisheries resources of Bangladesh.

20. Development of improved methods for the culture of some important marine and hyposaline organism.

21. Utilization of fisheries resources through processing, preservation and product development.

22. Studies on water quality management in shrimp farms and its relationship with disease.

23. Development of an environment friendly semi-intensive shrimp farming in Bangladesh.

THIRD FISHERIES PROJECT (FRI COMPONENT), Santahar

24. Limnological and production process investigation of the flood plains.

25. Gear selectivity study of the flood plains.

26. Fish diseases study in the flood plains and shrimp disease study in Khulna area.

27. Limnological investigation into new floodplains.

28. Study on the feeding biology of Grass carp.

গবেষণা ভিত্তিক মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট কম পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বাধিক মৎস্য উৎপাদনে যে কয়টি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, তা দেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে অর্থবহ অবদান রাখতে পারে। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট মূলত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর নিজস্ব কোন সম্প্রসারণমূলক কাঠামো নেই। সে কারণে ইনষ্টিট্যুট উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তরের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও এর সাথে যৌথ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম ইতোমধ্যে বেশ ইতিবাচক সাড়া জাগিয়েছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পরিবেশে ইনষ্টিট্যুট উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের কার্যকারিতা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে, মৌসুমী পুকুরে বৎসরে প্রতি হেক্টর ১.৩–২.৬ টন এবং মেয়াদি পুকুরে ৩–৪ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব। মৌসুমী ও মেয়াদি পুকুরে গড়ে ১ কেজি মাছ উৎপাদনের খরচ মাত্র ৬–১২ টাকা অথচ ১ কেজি বিক্রয়যোগ্য মাছ থেকে প্রকৃত মুনাফা আসে ২৬–৩৩ টাকা, যা নিঃসন্দেহে যে কোন কৃষিজ পণ্যের চেয়ে লাভজনক।

প্রশিক্ষণ

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট মূলত একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হলেও গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি ও কলাকৌশল চাষী পর্যায়ে হস্তান্তরের লক্ষ্যে ইনষ্টিট্যুট থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামীণ মহিলা, বেকার যুবক, মৎস্য চাষী, মৎস্য ব্যবসায়ী এবং বেসরকারি ও সরকারি সংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উন্নত মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইনষ্টিট্যুট থেকে এ যাবৎ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে ৬০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর

সৈয়দ খায়রুল আলম, উপপরিচালক
মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর, ঢাকা

মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রচারধর্মী সরকারি সংস্থা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি তথ্য সংস্থা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আজ থেকে দশ বছর আগে সৃষ্টি হয় মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর। এ সংস্থার সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও বরিশালে একটি করে আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাণিজ আমিষের সরবরাহে মৎস্য ও পশুসম্পদ উপখাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আমাদের জাতীয় খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৮০ ভাগেরই যোগান আসে এ দুটি উপখাত থেকে। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য ও পশুসম্পদ উপখাতদ্বয়ের অবদান যথাক্রমে ৪.৭ ও ৬.৫ শতাংশ। মোট জাতীয় রপ্তানি আয়ের ২২.১২ শতাংশ আসছে এই দু'টি উপখাত থেকে। প্রায় এককোটি লোক তাদের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মৎস্য খাতের সাথে জড়িত। এছাড়া ৯০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার পরোক্ষভাবে নদী-নালা হতে মাছ আহরণ করে থাকে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে মৎস্য খাতে এক বিরাট জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পশুসম্পদ খাতের ভূমিকাকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। প্রায় ২০ ভাগ লোক পশুসম্পদ সম্পর্কিত কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিপ্রধান এই বাংলাদেশে হাল চাষ, ফসল মাড়াই, গ্রামীণ পরিবহণ একান্তভাবেই গবাদি পশুর ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া গোবর থেকে আমরা সার ও জ্বালানি পেয়ে থাকি। এদেশে প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মৎস্য ও পশুসম্পদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কারণে এ সেক্টরদ্বয়ের কর্মকান্ড সম্প্রসারণ, উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি সংবলিত তথ্যাবলী প্রচার ছাড়াও গণ যোগাযোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। কেননা, একটি প্রযুক্তি যতই মূল্যবান হোক না কেন এর প্রয়োগ ও বিস্তারে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে জাতির সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তা প্রত্যাশিত প্রভাব রাখতে পারে না।

এদিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় স্বার্থে মৎস্য ও পশুসম্পদ উপখাতদ্বয়ে উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সনের এপ্রিল মাসে মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেদিন থেকে এই দপ্তরটি অত্যন্ত সীমিত অর্থসম্পদ ও জনশক্তি নিয়ে বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

এ সংস্থার মূখ্য কাজ হচ্ছে

১. মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্যাবলী প্রকাশ ও প্রচার।

২. চোখে দেখে কানে শুনে বাস্তব জ্ঞানলাভের সহায়ক হিসেবে মৎস্যচাষ ও পশুসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যভিত্তিক স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, ভিডিও ফিল্ম, ফিলার নির্মাণ ও সেগুলো প্রদর্শন।

৩. জাতীয় প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে পশুসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষামূলক তথ্যাবলী, কথিকা, সংবাদ, গান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ও সকল মৎস্যচাষীদের সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্রের জবাব প্রভৃতি প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রামাণ্য চিত্র, স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ভিডিও ফিল্ম, ফিলার ও টেলপ ধারণ করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে মৎস্য ও পশুসম্পদ সংক্রান্ত সংবাদ, ফিলার, বিজ্ঞপ্তি, শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক তথ্যাবলী পরিবেশন।

৫. দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মৎস্যচাষী ও পশু-পাখি পালনকারীদেরকে মৎস্যচাষ ও পশু-পাখি পালন সংক্রান্ত কলাকৌশল ও তথ্য পরিবেশন।

৬. মৎস্য ও পশুসম্পদ বিষয়ক ফটোগ্রাফ, স্লাইড ফটোগ্রাফ ও চিত্র প্রদর্শন।

৭. এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি ও প্রদর্শন। এছাড়া কর্মশিবির, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সেমিনারের আয়োজন এবং অন্য কোন দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মশিবিরে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান। এছাড়া বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন সংগ্রহ।

এ দপ্তরের প্রধান ও মূখ্য কাজ হচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কিত তথ্য প্রচার। আর এ কাজগুলো সম্পাদনের জন্য সবচেয়ে স্বীকৃত এবং স্থায়ী মাধ্যম হচ্ছে মুদ্রন প্রকাশনা মাধ্যম। পশু-পাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদেরকে নতুন নতুন গবেষণালব্ধ ফলাফলসহ প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল হস্তান্তর কাজে সহায়তার জন্য এবং এ ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য এ দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রচারণামূলক পুস্তক-পুস্তিকা, ফোল্ডার, সংকলন, পত্রিকা, ফ্লিপ চার্ট, পোষ্টার ইত্যাদি প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

উপরিবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে ১৯৯০-৯৫ পর্যন্ত এ দপ্তর যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে তা সংশ্লিষ্ট সকল মহলে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। নিম্নে এ ধরনের কতিপয় উদ্যোগের বিবরণ সংক্ষেপে পরিবেশন করা হলো।

১। মৎস্য-পশুসম্পদ বার্তা ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মৎস্য ও পশুসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাবলী, সংবাদ, কলাকৌশল প্রচারের দায়িত্ব এ দপ্তরের। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাসিক মৎস্য-পশুসম্পদ বার্তা প্রকাশ করা হয়। এ বার্তায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার, মৎস্য ও পশু-পাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষী ভাইদের করণীয়, আধুনিক কলাকৌশলের ব্যবহার এবং সফলচাষীদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক কাহিনী, তথ্যভিত্তিক ফিচার, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। প্রতি মাসে ১০ হাজার পত্রিকা জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে মৎস্যচাষী ও পশু-পাখি পালনকারী ছাড়াও স্কুল-কলেজ, পাঠাগার ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে পাঠানো হয়ে থাকে। এ বার্তা পাঠ করে অসংখ্য লোক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।

২। সংকলন ঃ এ দপ্তরের অপর আকর্ষণীয় প্রকাশনা হচ্ছে সংকলন। মাসিক বার্তায় প্রকাশিত তথ্যবহুল রচনা নিয়ে সংকলন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত তিনটি বিশেষ সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে যা প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। বাজারে এ সংকলনের ব্যাপক চাহিদা থাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যে এর হাজার হাজার কপি নামমাত্র সৌজন্য অনুদানের বিনিময়ে চাষীরা সংগ্রহ করেন।

৩। নিবিড় মাছ চাষ নির্দেশিকা ও বর্ষপঞ্জী ঃ এ দপ্তর থেকে মৎস্য চাষীদের মূল্যবান একটি পুস্তিকা হচ্ছে "নিবিড় মাছ চাষ নির্দেশিকা ও বর্ষপঞ্জী"। এ নির্দেশিকায় বদ্ধজলাশয়ে মাছ চাষের প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। মৎস্যচাষের ব্যাপারে এই প্রকাশনাখানি মৎস্যচাষীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য গাইডবই হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

৪। ফোল্ডার ঃ এই দপ্তর থেকে 'এক মোরগের সংসার', একের ভিতর দুই, বার মাসে তের জোড়া, ক্ষুরারোগ থেকে গবাদি পশুকে বাঁচান, একটি হাঁসের সংসার, পাখির নাম কোয়েল, মৎস্য আইন মেনে চলুন, নাইলোটিকার চাষ, গরীবের গাভী ছাগল, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে, রাণিক্ষেত টিকা দিয়ে মোরগ-মুরগিকে সুস্থ রাখুন প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

মাছের নাম থাই সরপুঁটি ঃ এই মাছের নাম বাংলাদেশের মানুষের এক সময় অজানা ছিল। থাইল্যান্ড থেকে এই মাছটি এদেশে আনার পরে বাংলাদেশে এর চাষাবাদ শুরু হয়। এ দপ্তর মাছের নাম থাই সরপুঁটি ফোল্ডারটি প্রকাশ করে এ মাছের গুণাগুণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেছে।

নাইলোটিকার চাষঃ এই মাছ সম্পর্কেও অনেকের ধারণা ছিল না। থাইল্যান্ড থেকে এ মাছ আনা হয় এবং আমাদের দেশের ডোবা ও নালায় নাইলোটিকা মাছের চাষ শুরু হয়। মাছ চাষ সম্পর্কে যাদের এক সময় অনাগ্রহ ছিল তারাও এই ফোল্ডার পড়ে মাছ চাষে ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছেন।

অন্যান্য প্রকাশনা সামগ্রী ঃ ফোল্ডার ছাড়াও মুরগির বাচ্চা পালন, বাংলাদেশে হাঁসের চাষ, নিবিড় মাছ চাষ নির্দেশিকা, চিংড়ির পোনা হস্তান্তর ও নতুন পরিবেশে অভ্যস্তকরণ পদ্ধতি, রাণিক্ষেত টিকা দিয়ে মোরগ-মুরগিকে সুস্থ রাখুন নামক কয়েকটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

এ দপ্তর থেকে পোষ্টারও ছাপানো হয়েছে অনেক বিষয়ের উপর। যেমন- মৎস্য আইন মেনে চলুন, আপনি জানেন কি? ডিমওয়ালামাছ মারবেন না, গবাদি পশুকে ক্ষুরারোগ থেকে বাঁচান, আপনার পশু-পাখিকে সময়মত রোগ প্রতিষেধক টিকা দিন। এই পোষ্টারগুলো প্রশিক্ষণ সমাবেশ, কর্মশালায় প্রয়োজন হয়। মৎস্য অধিদপ্তর ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর প্রায়শই এগুলো এ দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ বিষয়ক স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তরের মাঠ কর্মীগণ মৎস্য ও পশুসম্পদ সর্ম্পর্কিত ৬টি স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র যেমন, রূপালী চাষ, চাষীর সাথী, ক্ষুদ্র প্রাণীর বৃহৎদান, হাঁস-মুরগির চাষ বাড়ান ইত্যাদি বিভিন্ন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র ইউনিট ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে মৎস্য ও পশু সম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী প্রচার, বাংলাদেশ টেলিভিশন "মাটি ও মানুষ" অনুষ্ঠানে মৎস্য ও পশুসম্পদ বিষয়ক অনুষ্ঠানের সমন্বয় সাধন করে থাকে মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবেদন, টিভি রিপোর্ট ইত্যাদি প্রচার করা হয়েছে। প্রচার কার্য আরো সফল করে তোলার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর বেশ কয়েকটি ভিডিও ফিল্ম তৈরি করেছে। বিভিন্ন চাষী সমাবেশ, প্রশিক্ষণাদিতে এ দপ্তরের মাঠ কর্মীগণ ভিসিআর এর মাধ্যমে এইগুলো প্রদর্শন করেছেন। এ সব ভিডিও ক্যাসেটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ এক মোরগের সংসার, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে, টিকল ডাউন, ভ্যাটেনারি সার্জারি (পশুসল্য চিকিৎসা) প্রভৃতি। এ দপ্তর কর্তৃক নির্মিত মাছের পোনা দেশের সোনা ফিলারটি টেলিভিশনে প্রদর্শনের পরে সারা দেশে এ ব্যাপারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ফটোগ্রাফির মাধ্যমে প্রচার ঃ এ দপ্তর থেকে মৎস্য ও পশুসম্পদ বিষয়কছবি তোলা হয়। এই সব ছবি পরবর্তীতে প্রকাশনা সামগ্রী প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিনেমা স্লাইডের সাহায্যে প্রচার ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তরকল্পে এ দপ্তর সিনেমা স্লাইডও তৈরি করে থাকে। এই সব সিনেমা স্লাইড দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ, সমাবেশ, কর্মশালা ও সেমিনার ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতের কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে প্রদর্শনী, সমাবেশ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে এ দপ্তরের মাধ্যমে।

এই সব প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে থাকেন মৎস্য চাষী এবং পশুপাখি পালনকারীরা এবং এদেরকে বিশেষজ্ঞগণ স্ব-স্ব বিষয়ে জ্ঞানদান করে থাকেন।

পত্র পত্রিকায় ফিচার পরিবেশন ঃ দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্যদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে নিয়মিত ফিচার পরিবেশন করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ফিচারগুলো হলো-বাড়ির ছাদে মুরগি পালন, ধান ক্ষেতে মাছের চাষ, গাভীর জাত উন্নয়ন ও প্রতিপালন, কিভাবে গলদা চিংড়ির চাষ করবেন, দুধ বিক্রি করে লাখ টাকা আয়, একজন হাফিজের সাফল্য, জালের খাঁচায় মাছের চাষ, মুরগি পালন করলে বাড়তি আয়, দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে দালান, মজুদ পুকুরে মাছ চাষ, পাখি পালন করে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নিতে পারেন, বাংলাদেশে ছোট মাছ হারিয়ে যাচ্ছে, রুই জাতীয় মাছের পোনা পালন, গাভী পালন করে প্রতিমাসে ২১ হাজার টাকা আয়, মাছ ও মুরগির একত্র চাষ, কর্মসংস্থানের জন্য গরু মোটাতাজা করণ প্রকল্প প্রভৃতি।

মৎস্য ও পশুসম্পদ সাব-সেক্টরের কার্যক্রম জোরদার, উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর কাজ করে আসছে। এ দপ্তর মৎস্য ও পশুসম্পদ উপখাত উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ABSTRACT

Development and management of fishery resources in Bangladesh

Bangladesh is uniquely endowed with the diverse of very rich and extensive inland and marine fishery resources which mainly includes floodplains, rivers, estuaries, coastal belt and vast sea waters. In the overall agro-based economy of the country, the contribution of fishery is very promising and important for creating job opportunities for unemployed people, earning foreign exchange, alleviating poverty and improving nutritional status of the people. Therefore, the present Govt. prioritises the fisheries sector for its sustainable development by adopting appropriate strategies and principles of resource management. This article critically describes the present status of marine and inland open and closed water fisheries including the constraints and policy guidelines. Special emphasis has been given in identifying the scope, problems and measures for developing shrimp culture in the country.

Culture based fisheries resources development

The Department of Fisheries has implemented two development projects during the period from 1991 to 1995 to compensate the loss of fish due to natural and man made causes by stocking inland openwaters, particularly the floodplains and ox-bow lakes. Improved management practices adopted on pilot scale basis have been briefly presented in the paper. The management system as developed under the project has been apparently found to be technically reasible and economically viable. No negative impact on environment including biodiversity has been noticed so far. So, this programme should continue to refine to sustain the management model. Local community-based participatory management approach should be undertaken and continued by motivating, organizing and involving the target beneficiaries for sustained development of the culture based fisheries resources.

Development of floodplain fisheries through stocking of fish fingerling

The Department of Fisheries under its Third Fisheries Project (TFP)has undertaken a massive programme of stocking carp fingerlings in the floodplains to augment fish production therefrom.

Based on studies on detailed limnological features, the annual life cycle of floodplains has been divided into four phases, namely resting, preparatory, growing and the decay phase. The floodplains have been categorized into five types and based on the type, species selection, species composition and stocking density have been suggested. Floodplains with moderate aquatic vegetation with paddy are suitable for stocking. Cyprinus carpio and Cirrhina mrigala of major carps consume huge quantities of detritus, while Catla catla, Labeo rohita and Puntius gonionotus consume remarkable proportion of vegetation and periphyton. Stocking with quality fingerlings, it is necessary to have good quality seeds through improve nursery management, handling and transportation. Grass carp can be stocked into the poldered depression called beel. Seine nets, lift nets and fish traps catch a lot of stocked fingerlings which need to be regulated. Operation of set bagnet should be banned to save the fish being caught.

Effects of pesticides on environment and fisheries resources

Adequate attention to environmental pollution problem in Bangladesh was hitherto not paid which is now affecting its fisheries resources. Environmental pollution is mainly attributed to over-population, urbanization and industrialization. Pesticides are one of the most important agents of environmental pollution. In Bangladesh, every year about 7,000 metric tons of pesticides are used in agricultural fields. About 25% of these pesticides are being washed into openwater bodies from agricultural fields. As a result, pollution hazards for the aquatic life are increasing significantly causing mortality of fishes and other aquatic organisms. Pesticide pollution hampers growth, feeding, immunity and reproduction of fishes and other aquatic organisms. In laboratory tests, 60% of the registered pesticides have been found to be extremely toxic to fish at the recommended doses, while another 30% moderately toxic and the remaining 10% non-toxic. Among the different groups of pesticides, the organochlor and pyrethroid are extremely toxic to fish causing 100% mortality immediately after application. Therefore, it is urgently necessary to introduce Integrated Pest Management (IPM) system in order to conservation of the aquatic environment.

Fishpass

During the last decades natural migratory patterns of fishes have been largely interrupted by construction of dykes, regulators etc. for flood control and irrigation purposes without any provision for the passage of fish. The abundance of majority of freshwater fishes have declined and researchers have identified barriers to migration of fish as a major contributing factor for this decline. In order to permit fish migrations in rivers and floodplains, it is necessary to maintain conditions which help migrants reach their destination. To overcome obstacles, placed in the migratory route of fish, a fishpass is the only sustainable mitigation measure. A fishpass consists of a series of pools installed to aid the fish to overcome natural or artificial obstacles during migration. A vertical slot fishpass has been constructed in 1995 at Kashimpur of Moulvibazar district under Northeast Regional Project (FAP-6) with the financial assistance of Canadian International Development Agency (CIDA) across the full flood embankment of Manu River Project. This Flood Control Drainage and Irrigation (FCDI) Project has had a particularly negative impact on the important Kawadight Haor fishery. Results of the fishpass to date have been encouraging. Some 62 species of fish have been found using the structure. Migration is in both directions - river to haor, and haor to river - and both countercurrent and concurrent. Fish bio-diversity in the haor has responded strongly to the structure and fish production has also increased significantly.

Development of marine fisheries : problems and potentials

This paper reviews the overall situation of marine capture fisheries - its exploitation, constraints, potentials and strategies. The marine fish and shrimp are being exploited using a number of gears such as trawl net, gill net, set bag net, seine net, trammel net, hook and lines, shrimp fry net etc. There are some underexploited and unexploited resources like tuna and tuna like fishes, sharks, sardines, herring, anchovies, squid, cattle fish, lobster etc, which have potentials for development. These fisheries may be developed by proper resource assessment and introduction of appropriate technology like purse seining, squid jigging, lobster, post etc. The scope for oyster and sea weed culture and cage farming also exist.

Marine fish and shrimp stocks are harvested by a number of fisheries at different stages of their life cycle. The shrimp fry collection fishery, beach seine and estuarine set bag net (ESBN) fishery have been identified as the most destructive fishing methods. These fisheries, if stopped, can enhance production in other fisheries like trawl fishery and trammel net fishery. But hundreds of thousands fishermen are directly involved in these fisheries making its solution a far cry.

The development strategies in marine fisheries would include (i) assessment of pelagic and other unexploited resources, (ii) development of underexploited and unexploited resources, (iii) utilization of trash fish, (iv) introduction of closed season and areas in industrial fisheries, (v) replacement of destructive gears like ESBN by more selective gears and rehabilitation of fishermen, (vi) reduction of fish and shrimp larvae mortality in shrimp fry collection, and (vii) pollution control and environmental conservation.

Role of sonali bank in financing aquaculture

Sonali Bank - the premier nationalized commercial Bank of the country is involved in financing agricultural production including fisheries sector since 1973-74, in addition to its general function as a commercial bank. Of the total number of 1313 branches of the bank, about 1050 are directly involved in agricultural credit activities which include financing fisheries as well.

The major schemees in this field undertaken by the Sonali Bank are as follows :

(a) Special Investment Scheme
(b) Pond Fisheries Scheme
(c) Farming and Off Farming Credit Scheme
(d) Agro-based Industrial Credit Scheme

Under special investment scheme, the credit facility is given to a single or to a group of persons who are permanent inhabitants of a definite area. The credit is disbursed step by step in accordance with the requirements of the project. No collateral security is required for loan limit upto Tk. 50,000. Credit is disbursed only on hypothecation of fishes to be cultivated and on person/group guarantee. For loans above Tk. 50,000, immovable property is required to be mortgaged as collateral security. The value of property must cover 50% of loan limit excluding the borrower's equity. Loan sanctioning power has been delegated to field level officers.

In pond fisheries scheme, pond owner will get preference for loan. Joint owners of a pond will be able to take the loan jointly if one person is given power of attorney by other members of the group. Ceiling of loan is Tk. 17,200 per bigha. The terms are :

- Period of loan is 3 years repayable in 3 yearly installments.
- Equity of the loan is 20% of total project cost.
- No collateral security is required for loan limit upto Tk. 50,000.
- For above Tk. 50,000, immovable property is required to be mortgaged covering 50% of loan limit as collateral security.

Terms of Farming and off-farming credit scheme :

* Ceiling of loan is Tk. 19,000 per bigha, maximum Tk. 15.00 Lakhs.
* Period of loan is 3 years including maximum grace period of 6 months, repayable in daily/weekly/fortnightly/quarterly installments.
* Equity of the loan is 30% of the total project cost.
* Security of loan is hypothecation of produce and mortgage of land, building and structure thereon.

Terms of Agro-based industrial credit scheme programme :

* Ceiling of loan is fixed as per actual requirement of the project prepared after technical and financial appraisal.
* Period of loan is maximum 7 years for project loan and 1 year for working capital loan renewable upto the project loan period subject to satisfactory conduct of the loan.
* Project loan is repayable usually in quarterly installments.
* Equity of the loan for both project loan and working capital loan is 30%.

The Sonali Bank has so far sanctioned a loan of Tk.55.31 crores to 7247 farmers for aquaculture development, of which Tk. 33.88 crores have been recovered while Tk. 43.03 crores as loan is still outstanding. Sonali Bank, the largest NCB with major commitment in rural credit, is playing an important and vital role in developing aquaculture by implementing the different credit programmes, creating employment opportunities, improving socio-economic conditions, combating malnutrition and increasing foreign exchange earnings.

Quality control of fish seeds in hatchery

During the middle of 1960, artificial fish breeding techniques were developed in Bangladesh. Meanwhile, a large number of hatcheries, estimated nearly 400, has been established producing about 50,000 kg of spawn per year which is more than 90% of the total fish seed production of the country. In hatcheries, deterioration of fish seed quality has largely been reported. The reasons are poor broodstock management (i.e. unconscious negative selection or use of undesirable size of breeders for mating) and inbreeding depression in hatchery stocks due to generation after generation spawning between finite populations. As a result, retarded growth, physiological deformities, occurrence of diseases and heavy mortality of spawn have often been observed by the hatchery operators.

In this article, an attempt has been made to highlight the facts of present scenario of hatchery operation and management in the country. The problems are identified and briefly discussed and finally a number mitigating measures suggested.

Genetics of broodstock management

Fish production largely depends on the availability of good quality fish seed. The quality or biological potential of fish seed can only be ensured by maintaining good quality broodstock. Application of genetic principles and techniques are considered to be the most important aspects of broodstock management. In Bangladesh, no genetic principles are followed by the hatchery operators. As a result, a gradual deterioration in the quality of fish seed has been observed by most people in this sector. Effective breeding number which is expressed as Ne (the breeding size of a finite population) is an important single factor determining the fate of an allele (alternate form of a gene) and of a phenotype. It is essential that a reasonably good number of brood fish be collected and used for spawning. The hatchery operators must also know the history of the brood fish and maintain a breeding record. Simple genetic principles and techniques of broodstock management have been discussed in this article. To avoid genetic drift and inbreeding depression problem, all the hatchery operators should follow the genetic principles and techniques of brood stock and hatchery management. For this purpose, a training programme for all the hatchery personnel on this subject needs to be organized urgently.

Development of genetically improved fish breeds

Genetic deterioration particularly in hatchery population of carps due to poor broodstock management, mating of female and male spawners from a closely related population and undesirable attempts at interspecific hybridization is now well-known. Existing stocks of available tilapia species are also of poor genetic material due to i. inbreeding of original Nile tilapia stock; ii. introgression of genes from other less desirable feral tilapia strains; and iii. red hybrid strain, which does not breed true. Among catfishes both the existing species (local and African types) need to be genetically upgraded due to their undersirable body shape, tough muscle and carnivorous behaviour, especially in the African species.

In view of the aforementioned problems, FRI has already initiated a genetic stock improvement programme in some commercially important fishes like carps, tilapias and catfishes. In carps, both catla and silver barb stocks are being upgraded through selective breeding and line crossing techniques. In addition, studies are underway to develop all-female silver barb, which might have better growth rate than males, using the technique of gynogenesis and sex-reversal. Indigenous rohu stock are being improved through chromosome manipulation, thereby, leading to the induction of mitotic gynogenesis (production of 100% homozygous individuals) in the first generation and meiotic gynogenesis in the second generation (production of clonal lines). Genetically improved hybrid catfish has been developed through cross breeding between local and African catfish breeders. Research is an progress to generate a true breeding mutant red tilapia strain for production of all red colour progeny. Meanwhile, Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) strain has been introduced and genetically evaluated. Wide scale on-station and on-farm trials indicated that GIFT strain is superior to local strain in terms of growth and survival.

The present article briefly discusses these programmes and highlights the plans for future research activities in fish genetics and breeding.

Appropriate aquaculture technologies for small scale and marginal farmers

Bangladesh produces only half the quantity of fish (1.17 m ton, 1994-95) that it requires for consumption although vast water resources with highly favourable climatic conditions prevail in the country to grow enough fish. Absence of sound management policies for conservation of fisheries, lack of entrepreneurship in modern aquaculture, inadequate extension support to fish farmers and environmental degradation are the main factors responsible for this situation.

Research undertaken by FRI has established that while proper management of openwater fisheries can only prevent its decline in production, improved aquaculture in the country's huge water bodies (4.3 m ha) can produce enough fish to meet the requirements of the population and also can contribute sufficiently to socio-economic development through improving nutrition and increasing income. To highlight the proven economic benefits of aquaculture, a brief description of the technical and economical aspects of improved aquaculture technologies suitable for small and marginal farmers of Bangladesh has been presented in this paper. These are: nursery management for production of carp fingerlings, culture of silver barb and tilapia in seasonal water bodies, integrated aquaculture (poultry-cum-fish, duck-cum-fish, rice-cum-fish culture), polyculture of carps, culture of pangasius in ponds, fish culture in pens, backyard Macrobrachium hatchery, culture of hybrid catfish (Clarias spp.), etc. Small farmers can produce 2 tons of silver barb and 3 tons of tilapia with a net benefit of Tk. 70-90 thousand/ha/6 months from seasonal water bodies. Rice-fish farming, while producing 300-350 kg of

fish/ha/6 months as an additional crop (net benefit Tk. 10,500/ha/6 months) also increases rice yield by 10-15%. Fish production from other aquaculture technologies vary from 3-6 tons/ha/6-8 months with net benefits of Tk. 1-2 lakh/ha. Production of carp fingerlings is more profitable and found better suited for resource poor farmers with a guaranteed net income of over Tk. 1.5 lakhs in only 2 months. Scientific management and nutritional diets which help to control diseases are important factors for the success of improved aquaculture practices leading to higher yields and economic benefits.

Fish culture in pond

According to an estimate there are 1.3 million ponds and dighis having an area of 1.47 lakh ha. Utilization of potential un-taped water resources for nutrition, development and employment generation is of worth consideration for the welfare of rural community. Present level of production can easily be increased by 2.5 to 3.0 times from ponds and dighis using simple aquaculture techniques disseminated to the rural community through extension.

Integrated fish culture in Bangladesh and its prospects

The integrated system of fish culture, livestock raising and agriculture is prevalent in China, Taiwan, Malaysia, Hungary and in many other countries since long. Bangladesh has unique scope to adopt this system with suitable modification according to social and cultural heritage. Traditionally many of the households raise cattle, poultry and other livestock in their homestead. They have ponds also to culture fish. The interlinked management particularly of livestock and fish may play in important role for substantial increase of production of animal protein and generation of employment for the rural poors.

This integrated system also maximise production through recycling of wastes, optimum utilization of resources and given maximum return to the farmers with minimum cost involvement in fish culture.

The fish feed on fresh excreta of animals containing undigested food particles and the remaining excreta supports the growth of plankton — the natural food for fish, which drastically reduce the cost of feed and fertilizers for fish ponds.

Several models of integrated farming with aquaculture exist. Among those fish cum poultry, duckery and cattle integration are widely practiced. Rice-cum-fish culture is also a prospective field of integration in Bangladesh.

There are 1.3 million ponds comparing an area of 0.147 million ha. and 0.70 million ha FCDI water area which are unique place for integrated fish farming with other livestock components.

The integration may be done in two ways : (1) making the sheds of poultry and duckery on the pond water or on the dike or (2) raising them in house-hold sheds for better safety. Poultry dropping contains 1.63% N, 1.54% P2O5, and 0.83 K2O which are higher than cowdung. Integration of Sericulture and Fish farming is also an effective approach, where there sericulture exists.

Though initial capital investment is comparatively higher in case of newly established integrated farming, the profit margin from fish culture is higher than fish culture conducted alone. This integrated aquaculture do not create any negative impact on environment, moreover it helps to keep the environment favourable for us.

The management techniques and possibilities of different integrated fish farming systems have been discussed in brief in this article.

মৎস্য পক্ষ '৯৬ পুরস্কার

১. **মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা ।**	অধ্যাপক ডঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ আমিনুল হক প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
২. **রুই জাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম ।**	ডঃ মোঃ ইউসুফ আলী প্রাক্তন সচিব মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩. **চিংড়ি খামার ।**	কাসেম শহর লিঃ। প্রোঃ আলহ্বাজ আবুল কাশেম টেকপাড়া, কক্সবাজার।
৪. **চিংড়ী হ্যাচারি ।**	নিরিবিলি হ্যাচারি লিঃ প্রোঃ আলহ্বাজ মোস্তাফিজুর রহমান, সার্কিট হাউস রোড, কক্সবাজার।
৫. **ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারি ।**	ঝলক মিঠাপানি চিংড়ি হ্যাচারি প্রাঃ লিঃ প্রোঃ কপিল প্রসাদ চৌহান, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
৬. **মৎস্য খামার ।**	গচিহাটা ফিশ ফার্ম লিঃ প্রোঃ মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান এম.পি গচিহাটা, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।
৭. **পুকুরে মৎস্যচাষ ।**	জনাব রওশন আলী এফ-৮৬০, গণকপাড়া, ঘোড়ামারা-৬১০০, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
৮. **মৎস্য হ্যাচারি ।**	কুমিল্লা অঞ্চল ঃ সোহাগ মৎস্য রেণু উৎপাদন খামার প্রোঃ আলহ্বাজ মোঃ মজিব আহমেদ, দক্ষিণ লাকসাম, কুমিল্লা। খুলনা অঞ্চল ঃ শেখ মেজবাহ উদ্দিন আর, বি, কে রোড,সবজীবাগ, চাচড়া, যশোর।
৯. **পাঙ্গাঁস মাছের পোনা উৎপাদন ।**	ওয়ারসী এ্যাকুয়া-টেক প্রোঃ এইচ. এস ইসমাইল খান ৩৫-৩, গাওয়াইর, পোঃ আশাকোনা, উত্তরা, ঢাকা।
১০. **মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানী ।**	জনাব সাহিদুর রহমান ৭১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। জনাব মুসা মিয়া ২৮, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১১. **প্রচারণা ।**	বাংলাদেশ টেলিভিশন রামপুরা, ঢাকা।

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর	
		অফিস	বাসা
ক.	**মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**		
	ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৮৬১১১৭		
১.	জনাব সতীশ চন্দ্র রায় প্রতিমন্ত্রী	৮৬২৪৩০/৮৬১৫৫৫	৮৪২৮১৮
২.	সৈয়দ আতাউর রহমান একান্ত সচিব	৮৬৩৯৩০	৯১২০৬৮৩
৩.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সহকারী একান্ত সচিব	৮৬৪৭০২	৮৩৭২০৯
৪.	জনাব মোঃ ইরশাদুল হক সচিব	৮৬৪৭০০	৮৮২৩৩৩
৫.	জনাব জামাল উদ্দিন আহমেদ সচিবের একান্ত সচিব	৮৬১২৫৮	৯৩৩১৭৯২
৬.	জনাব ম. বদরে আলম খান যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৮৬১৯৭৭	৮৩১৪৬৯
৭.	জনাব লোকমান আহমেদ যুগ্ম-প্রধান	৮৬৭৯৬৯	৮০৫১৭১
৮.	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব উপ-সচিব (মৎস্য)	৮৬৯৫৬৫	৪০৬১৩৬
৯.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই উপ-সচিব (সামুদ্রিক)	৮৬৯৫৬৪	৪০৬০০৪
১০.	মনোয়ারা বেগম উপ-প্রধান (মৎস্য)	৮৬২৭৮৩	৮৩৪২১৮
খ.	**মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ১ পার্ক এভিন্যু, রমনা, ঢাকা-১০০০।**		
	পিএবিএক্স ৯৫৬৫০২১-২৩, ৯৫৬৬১০৩-০৪		
১.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, মহা-পরিচালক	৯৫৬২৮৬১	৯১১৫৯১১
২.	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, পরিচালক (সামুদ্রিক)	৯৫৬১৩৫৫	৯৫৬১৭১৫
৩.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৬৭২১৯	৫০০৩২৫
গ.	**বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন** ২৪-২৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৫২০১০, ৯৫৫১০৭৬; ৯৫৫৯৮৮৩-৮৪ ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৫৬৩৯৯০		
১.	আলহাজ্ব এম. মুজাফ্ফর হুসেইন চেয়ারম্যান	৯৫৬৯০৮৬	৯০০০১৬৬
ঘ.	**মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ-২২০১।**		
১.	ডঃ এম. এ. মজিদ পরিচালক	(০৯১) ৪৮৭৪	৫৪১০

চিংড়ি ও মৎস্য চাষী ভাইদের জন্য
সুখবর

আমেরিকার **AERATION INDUSTRIES INT'L, INC.** কর্তৃক প্রস্তুত বিশ্বখ্যাত এয়ারি ওটু সিরিজ টু এয়ারেটর **(AIRE -O_2 SERIES II AERATOR)** এখন বাংলাদেশে। যা সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত। ইহা সরাসরি বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে পানিতে প্রবেশ করায় এবং ছোট/বড় পুকুরে বা প্রকল্পে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে।

AIRE O_2 AERATION SYSTEM
is not only for Aquaculture (fish/Shrimp farming) but it has major application in Wastewater Treatment: Municipal and Industrial Lakes, Rivers, Harbours restorations Golfwater etc. and thus it helps a great deal in assisting the prevention of water pollution.

CONTACT FOR DETAILS:
ANTORIK INTERNATIONAL CORPORATION
OFFICE : Room No.-9, SAYEDA COURT (1st Floor) 28 AGRABAD C.A. CHITTAGONG- 4100
MAILING ADDRESS : G.P.O. BOX: 1311, CHITTAGONG-4000, BANGLADESH.
FAX: 880-31-710177 (Office), 710586 (Res.) TELEX: 66225 CAGPCO BJ ATTN: JHUTON
PHONE: (031) 712139 (Office), 710389 (Res.)

মৎস্য পক্ষ '৯৬
সফল হউক

আমরা নিম্নলিখিত উপকরনাদীর একমাত্র আমদানীকারক ও সরবরাহকারক ঃ

১। ক্লোরণ (এইস,সি,জি,পিত্তর)
২। সুমাছ (এইচ, সি, জি ক্রড)
৩। ওভাপ্রিম (পি,জি'র পরিবর্তে)
৪। পি, জি,
৫। আর্টিফিসিয়াল প্লাঙ্কটন, রোটিফার
৬। আর্টিমিয়া চিস্ট
৭। এগ্রিমিন - ভিটামিন মিনারেলস।
৮। হালামিড - ব্যকটেরিয়া, ফাঞ্জি ও ভাইরাস রোগের জীবানু নাশক।

বেঙ্গল ওভারসীজ লিঃ

২৮/এ নয়া পল্টন (৪র্থ তলা)
ঢাকা - ১০০০। ফোন ঃ ৪০৬৭৯২, ৪১৩১৬৭

Premium Quality

অক্সিজেন মিটার

আর্টিমিয়া

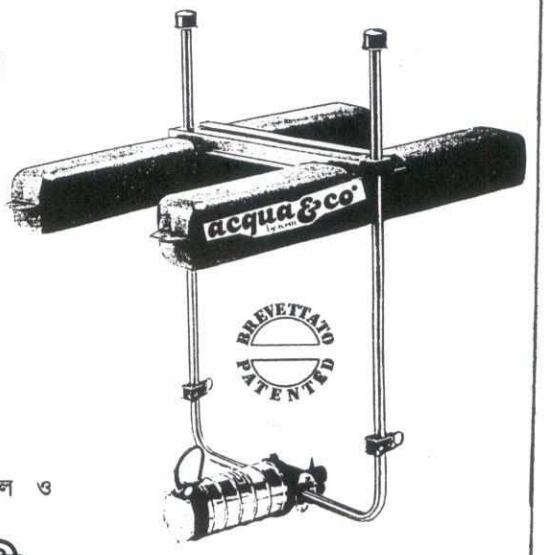

EOLO2এরেটর

আমরা সরবরাহ করি-

☐ এরেটর ☐ এয়ার ব্লোয়ার
☐ P.H. মিটার ☐ স্যালাইনোমিটার
☐ অক্সিজেন মিটার ☐ আর্টিমিয়া
☐ মাছ ও চিংড়ির ভিটামিন ☐ প্লাংকটন গ্রোয়ার ☐ জাল ও
☐ অন্যান্য হ্যাচারী সামগ্রী।

বানশিয়া ট্রেডিং কোম্পানী

৫/১০, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, (কিং খালেদ ইনষ্টিটিউট সংলগ্ন) ঢাকা-১২০৭
ফোনঃ ৯১১১১২৯, ৮১২৫১৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮১২৫১৮

চিংড়ি চাষী, ছোট/বড় হ্যাচারী মালিক ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য এয়ারেটর (পেডল হুইলার), সব ধরণের এসি ও ডিসি এয়ার ব্লোয়ার আমাদের মজুদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। নীচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

রামা করর্পোরেশন
৪২, তোপখানা রোড
প্রিতম ভবন, দোতলা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৫৭১২৯

আহমেদ এন্টারপ্রাইজ
২৭, স্যার ইকবাল রোড
খুলনা
ফোন ঃ ২২৭৭৭

অভিনন্দন
মৎস্য পক্ষ'৯৬

মেসার্স রশিদ ফিস পিটুইটারী ইণ্ডাস্ট্রী কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দীর্ঘ ১১ বৎসর যাবৎ নিরলসভাবে দেশের মৎস্য রেণু উৎপাদনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে।
মৎস্য রেণু উৎপাদনে আমাদের অবদান।
(১) ড্রাই পি. জি. (২) তরলকৃত ওভাক্লিন ও সুমাছ H. C. G ইত্যাদি।
প্রত্যেক প্রকার ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার বিধি অনুসরণ করে সুফল ভোগ করুন।

ফোন ঃ (০৪২১) ৩৯০৫
হেড অফিস ঃ
মেসার্স রশীদ ফিস পিটুইটারী প্রসেসিং ইণ্ডাষ্ট্রি
প্রোঃ- মোঃ আবদুর রশিদ (মেহেদী)
বিসিক অনুমোদিত ঃ রেজিঃ ৩৫৪/৯৪/১৬১
পুলেরহাট, বেনাপোল রোড, পোঃ চাঁচড়া, যশোর।

ফোন ঃ অফিস ঃ ৯৫৬৩০০৮/৯
ঢাকা-বাসাঃ
মোঃ মিরাজ রহমান
সেকশন-১০ ব্লক সি রোড নং- ১৯, বাড়ী-১২
৪র্থ তলা (বামে) মীরপুর, ঢাকা।

মৎস্য পক্ষ "৯৬ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি

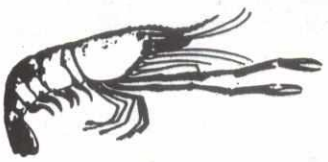

সেমকো

৬/সি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৩৯৩৪, ৯৫৬০৩৭৬
মাছ ও চিংড়ি চাষে ঃ ৯৫৬১৬৪৫, ৯৫৬৭৯০৭
❑ রটেনন ❑ এফ-অরগান ❑ কেল্প মিল ❑ সেকুফন ৮০ এসপি
❑ আর্টিমিয়া ❑ রটিফার ব্যবহার করুন।

থাই পাংগাস পোনা!

আমাদের খামারে উৎপাদিত পুকুরে চাষযোগ্য বিভিন্ন সাইজের পাঁচ লক্ষাধিক উন্নতমানের থাই পাংগাস পোনা (পাংগাসিয়াস সূচী) বিক্রয়ের জন্য মওজুদ আছে।

আগ্রহী পাইকার ও পাংগাস চাষীদেরকে অনতিবিলম্বে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রকমারী মৎস্য খামার

গ্রাম-বগইড়, পোঃ লক্ষীয়ারা, সদর থানাঃ ফেনী।

ফোন ঃ (০৩৩১) ৩২৮৯

মন দিন মাছ ও চিংড়ি চাষে প্রগতি আছে আপনার পাশে

জাতীয় পুরস্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত দেশের শ্রেষ্ঠ মৎস্য সমবায়ী উৎপাদিত

চিংড়ির শুষ্ক ও সুষম খাবার

পিলেট

ব্যবহার করে
উৎপাদন বৃদ্ধি করুন।

প্রস্তুতকারক

প্রগতি ফিস লিমিটেড

মৎস্য অধিদপ্তর ও বিসিক অনুমোদিত চিংড়ি ও মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ কে,ডি, এ, এভিনিউ, খুলনা। ফোন ঃ ০৪১-২৪৫৭৭-২২৩৬৭

মৎস্য পক্ষ '৯৬ সফল হোক

ঝলক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র (হ্যাচারী)

মাস্টার পাড়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ৫৪

কার্প জাতীয় মাছের উন্নত মানের রেণু ও পোনা উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

মৎস্য পক্ষ '৯৬ সফল হোক

ঝলক মিঠাপানি চিংড়ি হ্যাচারী (প্রাঃ) লিঃ
মাস্টারপাড়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ৫৪

এখানে রোগমুক্ত ও দ্রুত বর্ধনশীল গলদা চিংড়ির পোনা **(PL)** ও জুভেনাইল (১" – ২১/২" সাইজ)

সুলভ মূল্যে বিক্রয় ও যত্নের সাথে সরবরাহ করা হবে।

অধিক চিংড়ি উৎপাদনের জন্য

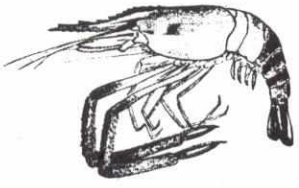

দেশে উৎপাদিত
পিলেট খাদ্য
ব্যবহার করুন

প্রস্তুতকারক ঃ নিরিবিলি ফিশ ফিড মিলস্ লিমিটেড

কক্সবাজার অফিস
শহীদ সরণী, হোটেল নিরিবিলি
কক্সবাজার।
ফোন ঃ ০৩৪১-৪৩২৪

ফ্যাক্টরী
বিসিক শিল্প নগরী
কক্সবাজার।
ফোন ঃ ০৩৪১-৪২৪৫

খুলনা অফিস
৩/১, হাজী মহসীন রোড
খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-২২১৪৬

মৎস্য পক্ষ '৯৬
সফল হউক

কেন সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিঃ উৎপাদিত পণ্য?

- ❑ বিজ্ঞানসম্মত, সুষম, দানাদার ও নির্ভরযোগ্য মানসম্পন্ন।
- ❑ চিংড়ি, মাছ ও মুরগির দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- ❑ প্রত্যাশিত খাদ্য রূপান্তর হার (FCR) যা আর্থিকভাবে লাভজনক।
- ❑ প্রতিযোগিতামূলক দাম হলেও মানে আন্তর্জাতিক।
- ❑ আকর্ষণীয় ঘ্রাণ সমৃদ্ধ।
- ❑ পুষ্টিমান যথার্থ হওয়ায় বাড়তি উপকরণ মিশানোর প্রয়োজন নেই।
- ❑ প্যাকেটজাত থাকে বিধায় অনেকদিন গুণগত মান ঠিক থাকে।

সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিঃ উৎপাদিত পণ্যসমূহ

- ❑ স্রিম্প ফিড
- ❑ স্পেশাল স্রিম্প ফিড
- ❑ গলদা ফিড
- ❑ ফিশ ফিড
- ❑ পাংগাস ফিড
- ❑ পোলট্রি ফিড

"চরম উৎকর্ষতায়
মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে
আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ"

sbff

সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিমিটেড

১ / বি, আউটার সার্কুলার রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৪৫১০, ৪১০১৯৩